প্রবন্ধ সম্ভার

বাংলা সাহিত্য সমিতি ।। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়



প্রবন্ধ-সম্ভার

[চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বি. এ. (পাস) পাঠক্রমের জন্য নির্দিষ্ট]

বাংলা সাহিত্য সমিতি

আহমদ পাবলিশিং হাউস

প্রকাশক
বাংলা সাহিত্য সমিতির পক্ষে
মহিউদ্দীন আহমদ
আহমদ পাবলিশিং হাউস
৭, জিন্দাবাহার প্রথম লেন
ঢাকা—১

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৩৮২ [আগস্ট ১৯৭৫]
চতুর্থ প্রকাশ
চৈত্র ১৩৯৩ [এপ্রিল ১৯৮৭]

প্রচ্ছদশিল্পী
কাইয়ুম চৌধুরী

মুদ্রণ
মেছবাহ উদ্দীন আহমদ
আহমদ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৭, জিন্দাবাহার প্রথম লেন
ঢাকা—১

মূল্য : ছাব্বিশ টাকা মাত্র

সূচীপত্র

আত্মপরিচয়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

(১৮২০—১৮৯১)

শকাব্দঃ ১৭৪২, ১২ই আশ্বিন, মঙ্গলবার, দিবা দ্বিপ্রহরের সময়, বীরসিংহ গ্রামে আমার জন্ম হয়। আমি জনক জননীর প্রথম সন্তান।

বীরসিংহের আধ ক্রোশ অন্তরে, কোমরগঞ্জ নামে এক গ্রাম আছে; ঐ গ্রামে, মঙ্গলবারে ও শনিবারে, মধ্যাহ্নসময়ে, হাট বসিয়া থাকে। আমার জন্ম সময়ে পিতৃদেব বাটীতে ছিলেন না; কোমরগঞ্জে হাট করিতে গিয়াছিলেন। পিতামহদেব তাঁহাকে আমার জন্মসংবাদ দিতে যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলিলেন, "একটি এঁড়ে বাছুর হইয়াছে।" এই সময়ে, আমাদের বাটীতে, একটি গাই গর্ভিণী ছিল; তাহারও, আজ কাল, প্রসব হইবার সম্ভাবনা। এজন্য, পিতামহদেবের কথা শুনিয়া, পিতৃদেব মনে করিলেন, গাইটি প্রসব করিয়াছে। উভয়ে বাটীতে উপস্থিত হইলেন। পিতৃদেব, এঁড়ে বাছুর দেখিবার জন্য, গোয়ালের দিকে চলিলেন। তখন পিতামহদেব হাস্যমুখে বলিলেন, "ও দিকে নয়, এ দিকে এস; আমি তোমায় এঁড়ে বাছুর দেখাইয়া দিতেছি"। এই বলিয়া, সূতিকাগৃহে লইয়া গিয়া, তিনি এঁড়ে বাছুর দেখাইয়া দিলেন।

এই অকিঞ্চিৎকর কথার উল্লেখের তাৎপর্য এই যে, আমি বাল্যকালে, মধ্যে মধ্যে অতিশয় অবাধ্য হইতাম। প্রহার ও তিরস্কার দ্বারা, পিতৃদেব আমার অবাধ্যতা দূর করিতে পারিতেন না। ঐ সময়ে, তিনি সন্নিহিত ব্যক্তিদের নিকট পিতামহদেবের পূর্বোক্ত পরিহাসবাক্যের উল্লেখ করিয়া, বলিতেন, "ইনি সেই এঁড়ে বাছুর; বাবা পরিহাস করিয়াছিলেন, বটে; কিন্তু তিনি সাক্ষাৎ ঋষি ছিলেন; তাহার পরিহাসবাক্যও বিফল হইবার নহে; বাবাজি আমার, ক্রমে, এঁড়ে গরু অপেক্ষাও একগুঁইয়া হইয়া উঠিতেছেন"। জন্ম-সময়ে পিতামহদেব পরিহাস করিয়া আমায় এঁড়ে বাছুর বলিয়াছিলেন; জ্যোতিষ-শাস্ত্রের গণনা অনুসারে বৃষ রাশিতে আমার জন্ম হইয়াছিল; আর, সময়ে সময়ে, কার্য দ্বারাও এঁড়ে গরুর পূর্বোক্ত লক্ষণ, আমার আচরণে, বিলক্ষণ আবির্ভূত হইত।

বীরসিংহগ্রামে আমার জন্ম হইয়াছে; কিন্তু এই গ্রাম আমার পিতৃপক্ষীয় অথবা মাতৃপক্ষীয় পূর্বপুরুষদিগের বাসস্থান নহে। জাহানাবাদের

ঈশান কোণে, তথা হইতে প্রায় তিন ক্রোশ অন্তরে, বনমালিপুর নামে যে গ্রাম আছে উহাই আমার পিতৃপক্ষীয় পূর্বপুরুষদিগের বহুকালের বাসস্থান। যে ঘটনাসূত্রে পূর্বপুরুষদিগের বাসস্থান বিসর্জন দিয়া, বীরসিংহগ্রামে আমাদের বসতি ঘটে, তাহা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

প্রপিতামহদেব ভুবনেশ্বর বিদ্যালংকারের পাঁচ সন্তান; জ্যেষ্ঠ নৃসিংহরাম, মধ্যম গঙ্গাধর, তৃতীয় রামজয়, চতুর্থ পঞ্চানন, পঞ্চম রামচরণ। তৃতীয় রামজয় তর্কভূষণ আমার পিতামহ। বিদ্যালংকার মহাশয়ের দেহাত্যয়ের পর, জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম, সংসারে কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। সামান্য বিষয় উপলক্ষে, তাঁহাদের সহিত কথান্তর উপস্থিত হইয়া, ক্রমে বিলক্ষণ মনান্তর ঘটিয়া উঠিল। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম সহোদরের অবমাননাব্যঞ্জক বাক্যপ্রয়োগে, তদীয় অন্তঃকরণ নিরতিশয় ব্যথিত হইল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া, তিনি কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিলেন; অবশেষে, আর এস্থানে অবস্থিতি করা, কোনও ক্রমে বিধেয় নহে, এই সিদ্ধান্ত করিয়া, কাহাকেও কিছু না বলিয়া এককালে, দেশত্যাগী হইলেন।

বীরসিংহগ্রামে, উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত নামে অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। রামজয় তর্কভূষণ এই উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের তৃতীয়া কন্যা দুর্গাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। দুর্গাদেবীর গর্ভে, তর্কভূষণ মহাশয়ের, দুই পুত্র ও চারি কন্যা জন্মে। জ্যেষ্ঠ ঠাকুরদাস, কনিষ্ঠ কালিদাস; জ্যেষ্ঠা মঙ্গলা, মধ্যমা কমলা, তৃতীয়া গোবিন্দমণি, চতুর্থী অন্নপূর্ণা। জ্যেষ্ঠ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আমার জনক।

রামজয় তর্কভূষণ দেশত্যাগী হইলেন; দুর্গাদেবী, পুত্রকন্যা লইয়া বনমালীপুরের বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই, দুর্গাদেবীর লাঞ্ছনাভোগ ও তদীয়পুত্র-কন্যাদের উপর কর্তৃপক্ষের অযত্ন ও অনাদর, এতদূর পর্যন্ত হইয়া উঠিল যে, দুর্গাদেবীকে, পুত্রদ্বয় ও কন্যা চতুষ্টয় লইয়া, পিত্রালয় যাইতে হইল। তদীয় ভ্রাতৃশ্বশুর প্রমুখের আচরণের পরিচয় পাইয়া, তাঁহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রমুখ অতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং তাঁহার ও তাঁহার পুত্র-কন্যাদের উপর যথোচিত স্নেহপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কতিপয় দিবস অতি সমাদরে অতিবাহিত হইল।

কিছুদিনের মধ্যেই পুত্র-কন্যা লইয়া, পিত্রালয়ে কালযাপন করা দুর্গাদেবীর পক্ষে বিলক্ষণ অসুখের কারণ হইয়া উঠিল। তিনি ত্বরায় বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃভার্যা তাঁহার উপর অতিশয় বিরূপ; অনিয়ত কালের জন্যে, সাতজনের ভরণপোষণের ভার বহনে, তাঁহারা কোনও মতে সম্মত

নহেন। তাঁহারা দুর্গাদেবী ও তদীয় পুত্র-কন্যাদিগকে গলগ্রহ বোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে দুর্গাদেবীকে পুত্র-কন্যা লইয়া, পিত্রালয় হইতে বহির্গত হইতে হইল। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় অতিশয় ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইলেন, এবং স্বীয় বাটীর অনতিদূরে এক কুটীর নির্মান করিয়া দিলেন। দুর্গাদেবী পুত্র-কন্যা লইয়া, সেই কুটীরে অবস্থিতি ও অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে, টেকুয়া ও চরখায় সুত কাটিয়া, সে সুত বেচিয়া অনেক নিঃসহায় নিরুপায় স্ত্রীলোক আপনাদের গুজরান করিতেন। দুর্গাদেবী সেই বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। তিনি একাকিনী হইলে, অবলম্বিত বৃত্তি দ্বারা, অবলীলাক্রমে, দিনপাত করিতে পারিতেন। কিন্তু, তাদৃশ স্বল্প আয় দ্বারা, নিজের, দুই পুত্রের ও চারি কন্যার ভরণপোষণ সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে। তাঁহার পিতা, সময়ে সময়ে, যথাসম্ভব সাহায্য করিতেন; তথাপি তাঁহাদের আহারাদি সর্ববিষয়ে, ক্লেশের পরিসীমা ছিলনা। এই সময়ে, জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাসের বয়ঃক্রম ১৪।১৫ বৎসর। তিনি, মাতৃদেবীর অনুমতি লইয়া, উপার্জনের চেষ্টায় কলিকাতা প্রস্থান করিলেন।

এই সময়ে, মোটামুটি ইংরেজী জানিলে, সওদাগর সাহেবদিগের হৌসে, অনায়াসে কর্ম হইত। এইজন্য সংস্কৃত না পড়িয়া, ইংরেজী পড়াই, তাঁহার পক্ষে, পরামর্শসিদ্ধ স্থির হইল। কিন্তু, সে সময়ে ইংরেজী পড়া সহজ ব্যাপার ছিল না। তখন এখনকার মত, প্রতি পল্লীতে ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল না। তাদৃশ বিদ্যালয় থাকিলেও তাঁহার ন্যায় নিরুপায় দীন বালকের তথায় অধ্যয়নের সুবিধা ঘটিত না। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের পরিচিত এক ব্যক্তি কার্যোপযোগী ইংরেজী জানিতেন। তাঁহার অনুরোধে, ঐ ব্যক্তি ঠাকুরদাসকে ইংরেজী পড়াইতে সম্মত হইলেন। তিনি বিষয়কর্ম করিতেন; সুতরাং, দিবাভাগে, তাঁহার পড়াইবার অবকাশ ছিল না। এজন্য তিনি ঠাকুরদাসকে সন্ধ্যার সময়, তাঁহার নিকটে যাইতে বলিয়া দিলেন। তদনুসারে, ঠাকুরদাস, প্রত্যহ সন্ধ্যার পর তাঁহার নিকটে গিয়া, ইংরেজী পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বাটীতে, সন্ধ্যার পরেই, উপরিলোকের আহারের কান্ড শেষ হইয়া যাইত। ঠাকুরদাস, ইংরেজী পড়ার অনুরোধে, সে সময়ে উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না; যখন আসিতেন, তখন আর আহার পাইবার সম্ভাবনা থাকিত না; সুতরাং তাঁহাকে রাত্রিতে অনাহারে থাকিতে হইত। এইরূপে নক্তন্তন আহারে বঞ্চিত হইয়া, তিনি, দিন দিন শীর্ণ ও দুর্বল হইতে লাগিলেন। একদিন, তাঁহার শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এমন শীর্ণ ও দুর্বল হইতেছ কেন? তিনি, কি কারণে তাঁহার সেরূপ অবস্থা

ঘটিতেছে. অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহার পরিচয় দিলেন। ঐ সময়ে, সেই স্থানে, শিক্ষকের আত্মীয় শূদ্রজাতীয় এক দয়াল্ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, তিনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং ঠাকুরদাসকে বলিলেন, যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে আর তোমার ওরূপ স্থানে থাকা কোনও মতে চলিতেছে না। যদি তুমি রাঁধিয়া খাইতে পার, তাহা হইলে, আমি তোমায় আমার বাসায় রাখিতে পারি। এই সদয় প্রস্তাব শুনিয়া ঠাকুরদাস, যারপরনাই, আহলাদিত হইলেন, এবং পর দিন অবধি, তাঁহার বাসায় গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এই সদাশয় দয়াল্ মহাশয়ের দয়া ও সৌজন্য যেরূপ ছিল, আয় সেরূপ ছিল না। তিনি দালালি করিয়া, সামান্যরূপ উপার্জন করিতেন। যাহা হউক এই ব্যক্তির আশ্রয়ে আসিয়া, ঠাকুরদাসের, নির্বিঘ্নে, দুই বেলা আহার ও ইংরেজী পড়া চলিতে লাগিল। কিছুদিন পরে, ঠাকুরদাসের দুর্ভাগ্যক্রমে, তদীয় আশ্রয়দাতার আয় বিলক্ষণ খর্ব হইয়া গেল; সুতরাং তাঁহার নিজের ও তাঁহার আশ্রিত ঠাকুরদাসের, অতিশয় কষ্ট উপস্থিত হইল। তিনি প্রতিদিন, প্রাতঃকালে, বহির্গত হইতেন, এবং কিছু হস্তগত হইলে, কোনও দিন দেড় প্রহরের, কোনও দিন দুই প্রহরের, কোনও দিন আড়াই প্রহরের সময়, বাসায় আসিতেন: যাহা আনিতেন, তাহা দ্বারা, কোন দিন বা কষ্টে, কোনও দিন স্বচ্ছন্দে, নিজের ও ঠাকুরদাসের আহার সম্পন্ন হইত; কোনও কোনও দিন, তিনি দিবাভাগে বাসায় আসিতেন না। সেই সেই দিন ঠাকুরদাসকে, সমস্ত দিন উপবাসী থাকিতে হইত।

একদিন, মধ্যাহ্ন সময়ে, ক্ষুধায় অস্থির হইয়া, ঠাকুরদাস বাসা হইতে বহির্গত হইলেন, এবং অন্যমনস্ক হইয়া, ক্ষুধার যাতনা ভুলিবার অভিপ্রায়ে, পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণ করিয়া, তিনি অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত ফল পাইলেন। ক্ষুধার যাতনা ভুলিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, বড়বাজার হইতে ঠনঠনিয়া পর্যন্ত গিয়া, ক্লান্ত ও ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় এত অভিভূত হইলেন যে, আর তাঁহার চলিবার ক্ষমতা রহিল না। কিঞ্চিৎ পরেই, তিনি এক দোকানের সম্মুখে উপস্থিত ও দণ্ডায়মান হইলেন; দেখিলেন, এক মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী ঐ দোকানে বসিয়া মুড়ি-মুড়কি বেচিতেছেন। তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর, দাঁড়াইয়া আছ কেন? ঠাকুরদাস, তৃষ্ণার উল্লেখ করিয়া, পানার্থে জল প্রার্থনা করিলেন। তিনি সাদর ও সস্নেহ বাক্যে, ঠাকুরদাসকে বসিতে বলিলেন, এবং ব্রাহ্মণের ছেলেকে শুধু জল দেওয়া অবিধেয়, এই বিবেচনা করিয়া, কিছু মুড়কি ও জল দিলেন। ঠাকুরদাস যেরূপ ব্যগ্র হইয়া মুড়কিগুলি খাইলেন, তাহা এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া

ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন বাপাঠাকুর, আজ বুঝি তোমার খাওয়া হয় নাই। তিনি বলিলেন, না, মা আজ আমি, এখন পর্যন্ত, কিছুই খাই নাই। তখন, সেই স্ত্রীলোক ঠাকুরদাসকে বলিলেন, বাপাঠাকুর, জল খাইও না, একটু অপেক্ষা কর। এই বলিয়া নিকটবর্তী গোয়ালার দোকান হইতে, সত্বর, দই কিনিয়া আনিলেন এবং আরও মুড়কি দিয়া ঠাকুরদাসকে পেট ভরিয়া ফলার করাইলেন; পরে তাঁহার মুখে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, জিদ করিয়া বলিয়া দিলেন, যে দিন তোমার এরূপ ঘটিবেক, এখানে আসিয়া ফলার করিয়া যাইবে।

পিতৃদেবের মুখে এই হৃদয়বিদারণ উপাখ্যান শুনিয়া, আমার অন্তঃকরণে যেমন দুঃসহ দুঃখানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, স্ত্রীজাতির উপর তেমনই প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল। এই দোকানের মালিক, পুরুষ হইলে, ঠাকুরদাসের উপর কখনই এরূপ দয়াপ্রকাশ ও বাৎসল্যপ্রদর্শন করিতেন না। যাহা হউক, যে যে দিন, দিবাভাগে আহারের যোগাড় না হইত, ঠাকুরদাস সেই সেই দিন ঐ দয়াময়ীর আশ্বাসবাক্য অনুসারে, তাঁহার দোকানে গিয়া, পেট ভরিয়া, ফলার করিয়া আসিতেন।

কিছুদিন পরে, ঠাকুরদাস, আশ্রয়দাতার সহায়তায়, মাসিক দুই টাকা বেতনে কোনও স্থানে নিযুক্ত হইলেন। এই কর্ম পাইয়া, তাঁহার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। পূর্ববৎ আশ্রয়দাতার আশ্রয়ে থাকিয়া, আহারের ক্লেশ সহ্য করিয়াও বেতনের দুইটি টাকা, যথানিয়মে, জননীর নিকট পাঠাইতে লাগিলেন। তিনি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান ও যারপরনাই পরিশ্রমী ছিলেন, এবং কখনও কোনও ওজর না করিয়া, সকল কর্মই সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতেন; এজন্য ঠাকুরদাস যখন যাঁহার নিকট কর্ম করিতেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার উপর সাতিশয় সন্তুষ্ট হইতেন।

দুই তিন বৎসরের পরেই, ঠাকুরদাস মাসিক পাঁচ টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার জননীর ও ভাই ভগিনীগুলির, অপেক্ষাকৃত অনেক অংশে, কষ্ট দূর হইল। এই সময়ে, পিতামহদেবও দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি প্রথমতঃ বনমালিপুরে গিয়াছিলেন; তথায় স্ত্রী, পুত্র, কন্যা দেখিতে না পাইয়া, বীরসিংহে আসিয়া পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হইলেন। সাত আট বৎসরের পর, তাঁহার সমাগমলাভে, সকলেই আহলাদসাগরে মগ্ন হইলেন। শ্বশুরালয়ে, বা শ্বশুরালয়ের সন্নিকটে, বাস করা তিনি অবমাননা জ্ঞান করিতেন, এজন্য, কিছুদিন পরেই, পরিবার লইয়া বনমালিপুরে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্গাদেবীর মুখে ভ্রাতাদের আচরণের পরিচয় পাইয়া, সে উদ্যম হইতে বিরত হইলেন, এবং অনিচ্ছাপূর্বক,

বীরসিংহে অবস্থিতি বিষয়ে সম্মতিপ্রদান করিলেন। এইরূপে, বীরসিংহ গ্রামে আমাদের বাস হইয়াছিল।

বীরসিংহে কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিয়া তর্কভূষণ মহাশয়, জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাসকে দেখিবার জন্য, কলিকাতা প্রস্থান করিলেন। ঠাকুরদাসের আশ্রয়দাতার মুখে, তদীয় কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতির প্রভূত পরিচয় পাইয়া তিনি যথেষ্ট আশীর্বাদ ও সবিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। বড়বাজারের দয়েহাটায়, উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ ভাগবতচরণ সিংহ নামে এক সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। এই ব্যক্তির সহিত তর্কভূষণ মহাশয়ের বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। সিংহ মহাশয় অতিশয় দয়াশীল ও সদাশয় মনুষ্য ছিলেন, তর্কভূষণ মহাশয়ের মুখে তদীয় দেশত্যাগ অবধি যাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, প্রস্তাব করিলেন, আপনি অতঃপর ঠাকুরদাসকে আমার বাটীতে রাখুন. আমি তাহার আহার প্রভৃতির ভার লইতেছি সে যখন স্বয়ং পাক করিয়া খাইতে পারে, তখন আর তাহার কোনও অংশে, অসুবিধা ঘটিবেক না।

এই প্রস্তাব শুনিয়া, তর্কভূষণ মহাশয়, সাতিশয় আহলাদিত হইলেন; এবং ঠাকুরদাসকে সিংহ মহাশয়ের আশ্রয়ে রাখিয়া, বীরসিংহে প্রতিগমন করিলেন। এই অবধি ঠাকুরদাসের আহারক্লেশের অবসান হইল। যথাসময়ে, আবশ্যকমত দুই বেলা আহার পাইয়া, তিনি পুনর্জন্ম জ্ঞান করিলেন। এই শুভ ঘটনা দ্বারা, তাঁহার যে কেবল আহারের ক্লেশ দূর হইল, এরূপ নহে; সিংহ মহাশয়ের সহায়তায়, মাসিক আট টাকা বেতনে এক স্থানে নিযুক্ত হইলেন। ঠাকুরদাসের আট টাকা মাহিয়ানা হইয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া তদীয় জননী দুর্গাদেবীর আহলাদের সীমা রহিল না।

এই সময়ে ঠাকুরদাসের বয়ঃক্রম তেইশ চব্বিশ বৎসর হইয়াছিল। অতঃপর তাঁহার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, তর্কভূষণ মহাশয় গোঘাট নিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া কন্যা ভগবতী দেবীর সহিত, তাঁহার বিবাহ দিলেন। এই ভগবতীদেবীর গর্ভে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি।

শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১৮৩৮—১৮৯৪)

১

শকুন্তলা ও মিরন্দা

উভয়েই ঋষিকন্যা; প্রস্পেরো ও বিশ্বামিত্র উভয়েই রাজর্ষি। উভয়েই ঋষিকন্যা বলিয়া, অমানুষিক সাহায্যপ্রাপ্ত। মিরন্দা এরিয়ল-রক্ষিতা, শকুন্তলা অপ্সরোরক্ষিতা।

উভয়েই ঋষি-পালিতা। দুইটিই বনলতা— দুইটিরই সৌন্দর্যে উদ্যানলতা পরাভূতা। শকুন্তলাকে দেখিয়া, রাজবিরোধবাসিনীগণের ম্লানীভূত রূপলাবণ্য দুষ্মন্তের স্মরণ-পথে আসিল;

শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনো যদি জনস্য।
দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ।।

ফর্দিনন্দও মিরন্দাকে দেখিয়া সেইরূপ ভাবিলেন,

Full many a lady
I have eyed with best regard, and many a time
The harmony of their tongues hath into bondage
Brought my too diligent ear: for several virtues
Have I liked several women;
—but you, O you,
So perfect and so peerless, are created
Of every creature's best!

উভয়েই অরণ্যমধ্যে প্রতিপালিতা; সরলতার যে কিছু মোহমন্ত্র আছে, উভয়েই তাহাতে সিদ্ধ। কিন্তু মনুষ্যালয়ে বাস করিয়া সুন্দর, সরল বিশুদ্ধ রমণীপ্রকৃতি, বিকৃতি প্রাপ্ত হয়—কে আমায় ভালবাসিবে, কে আমায় সুন্দর বলিবে, কেমন করিয়া পুরুষ জয় করিব, এই সকল কামনায়, নানা বিলাস বিভ্রমাদিতে, মেঘবিলুপ্ত চন্দ্রমাবৎ, তাহার মাধুর্য কালিমাপ্রাপ্ত হয়। শকুন্তলা এবং মিরন্দায় এই কালিমা নাই; কেননা, তাহারা লোকালয়ে প্রতিপালিতা নহেন। শকুন্তলা বল্কল পরিধান করিয়া ক্ষুদ্র কলসী হস্তে আলবালে জল-সিঞ্চন করিয়া, দিনপাত করিয়াছেন—সিঞ্চিত জলকণা-

বিধৌত নব মল্লিকার মত নিজেও শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক, প্রফুল্ল, দিগন্তসুগন্ধ-বিকীর্ণকারিণী। তাঁহার ভগিনীস্নেহ, নব মল্লিকার উপর; ভ্রাতৃস্নেহ, সহকারের উপর; পুত্রস্নেহ, মাতৃহীন হরিণশিশুর উপর; পতিগৃহ গমনকালে ইহাদিগের কাছে বিদায় লইতে গিয়া শকুন্তলা অশ্রুমুখী, কাতরা, বিবশা। শকুন্তলার কথোপকথন তাহাদিগের সঙ্গে; কোন বৃক্ষের সঙ্গে ব্যঙ্গ, কোন বৃক্ষকে আদর, কোন লতার পরিণয় সম্পাদন করিয়া শকুন্তলা সুখী। কিন্তু শকুন্তলা সরলা হইলেও অশিক্ষিতা নহেন। তাহার শিক্ষার চিহ্ন, তাঁহার লজ্জা। লজ্জা তাঁহার চরিত্রে বড় প্রবল; তিনি কথায় কথায় দুষ্মন্তের সম্মুখে লজ্জাবনতমুখী হইয়া থাকেন—লজ্জার অনুরোধে আপনার হৃদগত প্রণয় সখীদের সম্মুখেও সহজে ব্যক্ত করিতে পারেন না। মিরন্দার সেরূপ নহে। মিরন্দা এত সরলা যে, তাহার লজ্জাও নাই। কোথা হইতে লজ্জা হইবে? তাহার জনক ভিন্ন অন্য পুরুষকে কখনও দেখেন নাই। প্রথম ফর্দিনন্দকে দেখিয়া মিরন্দা বুঝিতেই পারিল না যে, কি এ?

Lord, how it looks about ! Believe me, sir,
It carries a brave form. But 'tis a spirit.

সমাজপ্রদত্ত যে সকল সংস্কার, শকুন্তলার তাহা সকলই আছে, মিরন্দার তাহা কিছুই নাই। পিতার সম্মুখে ফর্দিনন্দের রূপের প্রশংসায় কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই—অন্যে যেমন কোন চিত্রাদির প্রশংসা করে, এ তেমনি প্রশংসা;

I might call him
A thing, divine, for nothing natural
I ever saw so noble.

অথচ স্বভাবদত্ত স্ত্রী চরিত্রের যে পবিত্রতা, যাহা লজ্জার মধ্যে লজ্জা, তাহা মিরন্দায় অভাব নাই, এজন্য শকুন্তলার সরলতা অপেক্ষা মিরন্দার সরলতায় নবীনত্ব এবং মাধুর্য অধিক। যখন পিতাকে ফর্দিনন্দের পীড়নে প্রবৃত্ত দেখিয়া মিরন্দা বলিতেছে,

O dear father,
Make not too rash a trial of him, for
He's gentle and not fearful.

যখন পিতৃমুখে ফর্দিনন্দের রূপের নিন্দা শুনিয়া মিরন্দা বলিল,

My affections
Are then most humble : I have no ambition
To see goodlier man.

তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, মিরন্দা সংস্কারবিহীনা, কিন্তু মিরন্দা পরদুঃখকাতরা, মিরন্দা স্নেহশালিনী; মিরন্দার লজ্জা নাই। কিন্তু লজ্জার সারভাগ যে পবিত্রতা, তাহা আছে।

যখন রাজপুত্রের সঙ্গে মিরন্দার সাক্ষাৎ হইল, তখন তাঁহার হৃদয় প্রণয় সংস্পর্শশূন্য ছিল; কেননা শৈশবের পর পিতা ও কালিবন ভিন্ন আর কোন পুরুষকে তিনি কখনও দেখেন নাই। শকুন্তলাও যখন রাজাকে দেখেন, তখন তিনিও শূন্যহৃদয়, ঋষিগণ ভিন্ন পুরুষ দেখেন নাই। উভয়েই তপোবনমধ্যে —এক স্থানে কণ্বের তপোবন, অপর স্থানে প্রস্পেরোর তপোবন—অনুরূপ নায়ককে দেখিবামাত্র প্রণয়শালিনী হইলেন। কিন্তু কবিদিগের আশ্চর্য কৌশল দেখ; তাঁহারা পরামর্শ করিয়া শকুন্তলা ও মিরন্দা চরিত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন নাই, অথচ একজনে দুইটি চিত্র প্রণীত করিলে যেরূপ হইত, ঠিক সেই-রূপ হইয়াছে। যদি একজনে দুইটি চরিত্র প্রণয়ন করিতেন, তাহা হইলে কবি শকুন্তলার প্রণয়লক্ষণে ও মিরন্দার প্রণয়লক্ষণে কি প্রভেদ রাখিতেন? তিনি বুঝিতেন যে, শকুন্তলা, সমাজপ্রদত্ত, সংস্কারসম্পন্না, লজ্জাশীলা, অতএব তাহার প্রণয় মুখে অব্যক্ত থাকিবে, কেবল লক্ষণেই ব্যক্ত হইবে; কিন্তু মিরন্দা সংস্কারশূন্যা, লৌকিক লজ্জা কি, তাহা জানে না, অতএব তাহার প্রণয়লক্ষণ বাক্যে অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট হইবে। পৃথক পৃথক কবিপ্রণীত চিত্রদ্বয়ে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। দুষ্মন্তকে দেখিয়া শকুন্তলা প্রণয়াসক্তা, কিন্তু দুষ্মন্তের কথা দূরে থাক, সখীদ্বয় যতদিন তাঁহাকে ক্লিষ্টা দেখিয়া, সকল কথা অনুভবে বুঝিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া কথা বাহির করিয়া না লইল, ততদিন তাহাদের সম্মুখেও শকুন্তলা এই নূতন বিকারের একটি কথাও বলেন নাই, কেবল লক্ষণেই সে ভাব ব্যক্ত--

স্নিগ্ধং বীক্ষিতমন্যতোহপি নয়নে যৎ প্রেরয়ন্ত্যা তয়া
যাতং যচ্চ নিতম্বয়োর্গুরুতয়া মন্দং বিলাসাদিন।
মাগা ইতুৎপরুদ্ধয়া যদপি তৎ সাসূয়মুক্তা সখী,
সর্ব্বং তৎ কিল মৎপরায়ণমহো! কামঃ স্বতাং পশ্যতি ॥

শকুন্তলা দুষ্মন্তকে ছাড়িয়া যাইতে গেলে গাছে তাঁহার বল্কল বাধিয়া যায়, পদে কুশাঙ্কুর বিঁধে। কিন্তু মিরন্দার সে সকলের প্রয়োজন নাই—মিরন্দা সে সকল জানে না; প্রথম সন্দর্শনকালে মিরন্দা অসংকুচিত চিত্তে পিতৃসমক্ষে আপন প্রণয় ব্যক্ত করিলেন,

This
Is the third man that e'er I saw, the first
That e'er I sigh'd for :

এবং পিতাকে ফর্দিনন্দের পীড়নে উদ্যত দেখিয়া ফর্দিনন্দকে আপনার প্রিয়জন বলিয়া, পিতার দয়ার উদ্রেকের যত্ন করিলেন। প্রথম অবসরেই ফর্দিনন্দকে আত্মসমর্পণ করিলেন।

দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার প্রথম প্রণয়সম্ভাষণ একপ্রকার লুকোচুরি খেলা। "সখি, রাজাকে ধরিয়া রাখিস কেন ?" "তবে, আমি উঠিয়া যাই"—"আমি এই গাছের আড়ালে লুকাই"—শকুন্তলার এ সকল "বাহানা" আছে; মিরন্দার সে সকল নাই। এ সকল লজ্জাশীলা কুলবালার বিহিত, কিন্তু মিরন্দা লজ্জাশীলা কুলবালা নহে—মিরন্দা বনের পাখী—প্রভাতোরুণোদয়ে গাইয়া উঠিতে তাহার লজ্জা করে না; বৃক্ষের ফুল—সন্ধ্যার বাতাস পাইলে মুখ ফুটাইয়া ফুটিয়া উঠিতে লজ্জা করে না; নায়ককে পাইয়াই, মিরন্দার বলিতে লজ্জা করে না যে—

But my modesty,
The Jewel in my dower, I would not wish,
Any companion in the world but you;
Nor can imagination form a shape,
Besides yourself, to like of.

পুনশ্চ :

Hence, bashful cunning !
And prompt me, plain and holy innocence !
I am your wife, if you will marry me;
If not, I'll die your maid : to be your fellow
You may deny me; But I'll be your servant,
Whether you will or no.

আমাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, মিরন্দা-ফর্দিনন্দের এই প্রথম প্রণয়ালাপ, সমুদয় উদ্ধৃত করি, কিন্তু নিষ্প্রয়োজন। সকলেরই ঘরে সেক্সপীয়র আছে, সকলেই মূল গ্রন্থ খুলিয়া পড়িতে পারিবেন। দেখিবেন, উদ্যানমধ্যে রোমিও জুলিয়েটের যে প্রণয়সম্ভাষণ জগতে বিখ্যাত, এবং পূর্বতন কলেজের ছাত্রসমাজের কণ্ঠস্থ, ইহা কোন অংশে তদপেক্ষা ন্যূনকল্প নহে। যেভাবে জুলিয়েট বলিয়াছিলেন যে, "আমার দান সাগরতুল্য অসীম, আমার ভালবাসা সেই সাগরতুল্য গভীর", মিরন্দাও এই স্থলে সেই মহান চিত্তভাবে পরিপ্লুত।

ইহার অনুরূপ অবস্থায়, লতামণ্ডপতলে, দুষ্মন্ত শকুন্তলায় যে আলাপ,–যে আলাপে শকুন্তলা চিরবদ্ধ হৃদয়কোরক প্রথম অভিমত সূর্যসমীপে ফুটাইয়া হাসিল—সে আলাপে তত গৌরব নাই, মানবচরিত্রের কূলপ্রান্তগর্ষ্ত প্রঘাতী সেরূপ টল টল চঞ্চল বীচিমালা তাহার হৃদয়মধ্যে লক্ষিত হয় না। যাহা বলিয়াছি, তাই–কেবল ছি, ছি, কেবল যাই যাই, কেবল–লুকোচুরি—একটু একটু চাতুরী আছে—যথা "অব্ধপধে সুমরিঅ এদস্স হত্থব্ভংসিণো মিণালবল-অম্ম কদে পড়িণিবুত্তহ্মি।" ইত্যাদি! একটু অগ্রগামিনীত্ব আছে, যথা দুষ্মন্তের মুখে–"ননু কমলস্য মধুকরঃ সন্তুষ্যতি গন্ধমাত্রেণ।" এই কথা শুনিয়া শকুন্তলার জিজ্ঞাসা, "অসন্তোসে উণ কিং করেদি?"–এই সকল ছাড়া আর বড় কিছুই নাই। ইহা কবির দোষ নহে–বরং কবির গুণ। দুষ্মন্তের চরিত্র-গৌরবে ক্ষুদ্রা শকুন্তলা এখানে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। ফর্দিনন্দ বা রোমিও ক্ষুদ্র ব্যক্তি, নায়িকার প্রায় সমবয়স্ক, প্রায় সমযোগ্য অকৃতকীর্ত্তি—অপ্রথিতযশাঃ, কিন্তু সসাগরা পৃথিবীপতি মহেন্দ্রসখ দুষ্মন্তের কাছে শকুন্তলা কে? দুষ্মন্ত মহাবৃক্ষের বৃহচ্ছায়া এখানে শকুন্তলা-কলিকাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—সে ভাল করিয়া মুখ খুলিয়া ফুটিতে পারিতেছে না। এ প্রণয়ভাষণ নহে–রাজক্রীড়া, পৃথিবীপতি কুঞ্জবনে বসিয়া সাধ করিয়া প্রেমকরা রূপ খেলা খেলিতে বসিয়াছেন; মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় শকুন্তলা-নলিনীকোরককে শুন্ডে তুলিয়া বনক্রীড়ার সাধ মিটাইতেছেন, নলিনী তাতে ফুটিবে কি?

যিনি এ কথাগুলি স্মরণ না রাখিবেন, তিনি শকুন্তলা-চরিত্র বুঝিতে পারিবেন না; যে জলনিষেকে মিরন্দা ও জুলিয়েট ফুটিল, সে জলনিষেকে শকুন্তলা ফুটিল না; প্রণয়াসক্তা শকুন্তলায় বালিকার চাঞ্চল্য, বালিকার ভয়, বালিকার লজ্জা দেখিলাম; কিন্তু রমণীর গাম্ভীর্য রমণীর স্নেহ কই? ইহার কারণ কেহ কেহ বলিবেন, লোকাচারের ভিন্নতা; দেশভেদ। বস্তুতঃ তাহা নহে। দেশী কূলবধূ বলিয়া শকুন্তলা লজ্জায় ভাঙ্গিয়া পড়িল–আর মিরন্দা বা জুলিয়েট বেহায়া বিলাতী মেয়ে বলিয়া মনের গ্রন্থি খুলিয়া দিল, এমত নহে। ক্ষুদ্রাশয় সমালোচকেরাই বুঝেন না যে, দেশভেদে বা কালভেদে কেবল বাহ্যভেদ হয় মাত্র; মনুষ্যহৃদয় সকল দেশেই সকল কালেই ভিতরে মনুষ্যহৃদয়ই থাকে। বরং বলিতে গেলে—তিন জনের মধ্যে শকুন্তলাকেই বেহায়া বলিতে হয়—"অসন্তোসে উণ কিং করেদি?" তাহার প্রমাণ। যে শকুন্তলা, ইহার কয়মাস পরে, কৌরবের সভাতলে দাঁড়াইয়া দুষ্মন্তকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিল— "অনার্য! আপন হৃদয়ের অনুমানে সকলকে দেখ?"—সে শকুন্তলা যে লতা মন্ডপে বালিকাই রহিল, তাহার বারণ কুলকন্যাসুলভ লজ্জা নহে। তাহার কারণ—দুষ্মন্তের চরিত্রের বিস্তার। যখন

শকুন্তলা সভাতলে পরিত্যক্তা, তখন শকুন্তলা পত্নী, রাজমহিষী, মাতৃপদে আরোহণোদ্যতা ; সুতরাং তখন শকুন্তলা রমণী ; এখানে তপোবনে—তপস্বি-কন্যা, রাজপ্রাসাদের অনুচিত অভিলাষিণী ;—এখানে শকুন্তলা কে ? করি-শুণ্ডে পদ্মমাত্র। শকুন্তলার কবি যে টেম্পেস্টের কবি হইতে হীনপ্রভ নহেন, ইহাই দেখাইবার জন্য এস্থলে আয়াস স্বীকার করিলাম।

২

শকুন্তলা ও দেস্‌দিমোনা

শকুন্তলার সঙ্গে মিরন্দার তুলনা করা গেল—কিন্তু ইহাও দেখান গিয়াছে যে, শকুন্তলা ঠিক মিরন্দা নহে। কিন্তু মিরন্দার সহিত তুলনা করিলে শকুন্তলা চরিত্রের এক ভাগ বুঝা যায়। শকুন্তলা-চরিত্রের আর এক ভাগ বুঝিতে বাকি আছে। দেস্‌দিমোনার সঙ্গে তুলনা করিয়া সে ভাগ বুঝাইব, ইচ্ছা আছে।

শকুন্তলা এবং দেস্‌দিমোনা দুইজনে পরস্পর তুলনীয়া, এবং অতুলনীয়া। তুলনীয়া—কেন না, উভয়েই গুরুজনের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন। গৌতমী শকুন্তলা সম্বন্ধে দুষ্মন্তকে যাহা বলিয়াছে, ওথেলোকে লক্ষ্য করিয়া দেস্‌দিমোনা সম্বন্ধে তাহা বলা যাইতে পারে।—

ণাবেক্‌খিদো গুরুঅণো ইমি ত্রণ তুএবি পুচ্ছিদো বন্ধু।
এক্কক্কস্মঅ চরিত্র ভণাদু কিং এক্ক এক্কস্মিং।

তুলনীয়া—কেন না, উভয়েই বীরপুরুষ দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছে—উভয়েরই "দুরারোহিণী আশালতা" মহামহীরুহ অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বীরমন্ত্রের সে মোহ, তাহা দেস্‌দিমোনায় যাদৃশ পরিস্ফুট, শকুন্তলায় তাদৃশ নহে। ওথেলো কৃষ্ণকায়, সুতরাং সুপুরুষ বলিয়া ইতালীয় বালার কাছে বিচার্য নহে, কিন্তু রূপের মোহ হইতে বীর্যের মোহ নারীহৃদয়ের উপর বলবত্তর। যে মহাকবি, পঞ্চপতিকা দ্রৌপদীকে অর্জুনে অধিকতর অনুরক্তা করিয়া, তাঁহার সশরীরে স্বর্গারোহণপথ রোধ করিয়াছিলেন, তিনি এ তত্ত্ব জানিতেন, এবং যিনি দেস্‌দিমোনার সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ইহার গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

তুলনীয়া—কেন না, দুই নায়িকারই "দুরারোহিণী আশালতা" পরি-শেষে ভগ্না হইয়াছিল উভয়েই স্বামীকর্তৃক বিসর্জিতা হইয়াছিলেন। সংসার অনাদর, অত্যাচার পরিপূর্ণ কিন্তু ইহাই অনেক সময়ে ঘটে যে, সংসারে যে

আদরের যোগ্য, সেই বিশেষ প্রকারের অনাদর অত্যাচারে প্রপীড়িত হয়; ইহা মনুষ্যের পক্ষে নিতান্ত অশুভ নহে; কেন না, মনুষ্যপ্রকৃতিতে যে সকল উচ্চাশয় মনোবৃত্তি আছে, এই সকল অবস্থাতেই তাহা সম্যক প্রকারে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়। ইহা মনুষ্যলোকে সুশিক্ষার বীজ—কাব্যের প্রধান উপকরণ। দেস্‌দিমোনার অদৃষ্টদোষে বা গুণে সে সকল মনোবৃত্তি স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইবার অবস্থা তাহার ঘটিয়াছিল, শকুন্তলারও তাহাই ঘটিয়াছিল। অতএব দুই চরিত্র যে পরস্পর তুলনীয় হইবে ইহার সকল আয়োজন আছে।

এবং দুইজনে তুলনীয়া—কেন না উভয়েই পরম স্নেহশালিনী—উভয়েই সতী। স্নেহশালিনী এবং সতী ত যে সে। আজকাল রাম, শ্যাম, নিধু, বিধু, যদু, মধু যে সকল নাটক উপন্যাস নবন্যাস প্রেতন্যাস লিখিতেছেন, তাহার নায়িকা-মাত্রেই স্নেহশালিনী সতী। কিন্তু এই সকল সতীদিগের কাছে একটি পোষা বিড়াল আসিলে, তাঁহারা স্বামীকে ভুলিয়া যান, আর পতি-চিন্তামগ্না শকুন্তলা দুর্বাসার ভয়ংকর 'অয়মহম্ভো' শুনিতে পান নাই! সকলেই সতী, কিন্তু জগৎসংসারে অসতী নাই বলিয়া স্ত্রীলোকে অসতী হইতেই পারে না বলিয়া দেস্‌দিমোনার যে দৃঢ় বিশ্বাস, তাহার মর্মের ভিতর কে প্রবেশ করিবে? যদি স্বামীর প্রতি অবিচলিত ভক্তি—প্রহারে, অত্যাচারে, বিসর্জনে, কলঙ্কেও যে ভক্তি অবিচলিত, তাহাই যদি সতীত্ব হয়, তবে শকুন্তলা অপেক্ষা দেস্‌দিমোনা গরীয়সী। স্বামীকর্তৃক পরিত্যক্তা হইলে দলিত-ফণা সর্পের ন্যায় মস্তক উন্নত করিয়া স্বামীকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। যখন রাজা শকুন্তলাকে অশিক্ষা সত্ত্বেও চাতুর্যপটু বলিয়া উপহাস করিলেন, তখন শকুন্তলা ক্রোধে, দম্ভে, পূর্বের বিনীত, লজ্জিত, দুঃখিত ভাব পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "অনার্য আপনার হৃদয়ের ভাবে সকলকে দেখ?" যখন তদুত্তরে রাজা, রাজার মত বলিলেন, 'ভদ্রে! দুষ্মন্তের চরিত্র সবাই জানে', তখন শকুন্তলা ঘোর ব্যঙ্গে বলিলেন,

তুহ্মে ক্কেব পমাণং জানধ ধম্মথিদিঞ্চ লোঅস্ম।
লজ্জাবিণিজ্জিদাও জানন্তি ণ কিম্পি মহিলাও।।

এ রাগ অভিমান, এ ব্যঙ্গ দেস্‌দিমোনায় নাই। যখন ওথেলো দেস্‌দিমোনাকে সর্বসমক্ষে প্রহার করিয়া দূরীভূত করিলেন, তখন দেস্‌দিমোনা কেবল বলিলেন, "আমি দাঁড়াইয়া আপনাকে আর বিরক্ত করিব না।" বলিয়া যাইতেছিলেন, আবার ডাকিতেই "প্রভু!" বলিয়া নিকটে আসিলেন। যখন ওথেলো অকৃতাপরাধে তাঁহাকে কুলটা বলিয়া অপমানের একশেষ করিয়াছিলেন, তখনও দেস্‌দিমোনা "আমি নিরপরাধিনী, ঈশ্বর জানেন," ঈদৃশ উক্তি ভিন্ন আর কিছুই বলেন নাই। তাহার পরেও পতিস্নেহে বঞ্চিত হইয়া, পৃথিবী শূন্য দেখিয়া, ইয়াগোকে ডাকিয়া বলিয়াছেন,

O good Iago,
What shall I do to win my lord again ?
Good friend, go to him ; for, by this light of heaven
I know not how I lost him. Here I kneel :

ইত্যাদি। যখন ওথেলো ভীষণ রাক্ষসের ন্যায় নিশীথশয্যাশায়িনী সুপ্তা সুন্দরীর সম্মুখে "বধ করিব !" বলিয়া দাঁড়াইলেন, তখনও রাগ নাই—অভিমান নাই—অবিনয় বা অস্নেহ নাই—দেস্‌দিমোনা কেবল বলিলেন, "তবে ঈশ্বর আমায় রক্ষা করুন" যখন দেস্‌দিমোনা মরণভয়ে নিতান্ত ভীতা হইয়া, এক দিনের জন্য, এক রাত্রির জন্য, এক মুহূর্তের জন্য জীবনভিক্ষা চাহিলেন, মূঢ় তাহাও শুনিল না, তখনও রাগ নাই, অভিমান নাই, অবিনয় নাই, অস্নেহ নাই। মৃত্যুকালেও যখন ইমিলিয়া আসিয়া তাহাকে মুমূর্ষু দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কার্য যে করিল ?" তখনও দেস্‌দিমোনা বলিলেন, "কেহ না, আমি নিজে। চলিলাম ! আমার প্রভুকে আমার প্রণাম জানাইও। আমি চলিলাম !" তখনও দেস্‌দিমোনা লোকের কাছে প্রকাশ করিল না যে, আমার স্বামী আমাকে বিনাপরাধে বধ করিয়াছে।

তাই বলিতেছিলাম যে, শকুন্তলা দেস্‌দিমোনার সঙ্গে তুলনীয়া এবং তুলনীয়াও নহে। তুলনীয়া নহে—কেননা ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বস্তুতে তুলনা হয় না। সেক্ষপীয়রের এই নাটক সাগরবৎ, কালিদাসের নাটক নন্দনকাননতুল্য। কাননে সাগরে তুলনা হয় না। যাহা সুন্দর, যাহা সুদৃশ্য, যাহা সুগন্ধ, যাহা সুরব, যাহা মনোহর, যাহা সুখকর, তাহাই এই নন্দনকাননে অপর্যাপ্ত, স্তূপীকৃত, রাশি রাশি, অপরিমেয়। আর যাহা গভীর, দুস্তর, চঞ্চল, ভীমনাদী, তাহাই এই সাগরে। সাগরবৎ সেক্ষপীয়রের এই অনুপম নাটক, হৃদয়োত্থিত বিলোল তরঙ্গমালায় সংক্ষুব্ধ ; দুরন্ত রাগ দ্বেষ ঈর্ষাদি বাত্যায় সন্তাড়িত ; ইহার প্রবল বেগ, দুরন্ত কোলাহল, বিলোল উর্মিলীলা,—আবার ইহার মধুর নীলিমা ইহার আলোকচূর্ণপ্রক্ষেপ, ইহার জ্যোতিঃ, ইহার ছায়া, ইহার রত্নরাজি, ইহার মৃদুগীত—সাহিত্যসংসারে দুর্লভ।

তাই বলি, দেস্‌দিমোনা শকুন্তলায় তুলনীয়া নহে। ভিন্ন জাতীয়ে ভিন্ন জাতীয়ে তুলনীয়া নহে। ভিন্ন জাতীয় কেন বলিতেছি, তাহার কারণ আছে।

ভারতবর্ষে যাহাকে নাটক বলে, ইউরোপে ঠিক তাহাকেই নাটক বলে না। উভয় দেশীয় নাটক দৃশ্যকাব্য বটে, কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকেরা নাটকার্থে আর একটু অধিক বুঝেন। তাঁহারা বলেন যে, এমন কাব্য আছে—

যাহা দৃশ্যকাব্যের আকারে প্রণীত, অথচ প্রকৃত নাটক নহে। নাটক নহে বলিয়া যে এ সকলকে নিকৃষ্ট কাব্য বলা যাইবে, এমত নহে। তন্মধ্যে অনেকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য, যথা গেটে-প্রণীত ফস্ট এবং বাইরণ প্রণীত মানফ্রেড—কিন্তু উৎকৃষ্ট হউক, নিকৃষ্ট হউক—ঐ সকল কাব্য, নাটক নহে। সেক্ষপীয়রের টেম্পেষ্ট এবং কালিদাস কৃত শকুন্তলা, সেই শ্রেণীর কাব্য, নাটকাকারে অত্যুৎকৃষ্ট উপাখ্যান কাব্য; কিন্তু নাটক নহে। নাটক নহে বলিলে এতদুভয়ের নিন্দা হইল না; কেননা, এরূপ উপাখ্যান কাব্য পৃথিবীতে অতি বিরল—অতুল্য বলিলেও হয়। আমরা ভারতবর্ষে উভয়কেই নাটক বলিতে পারি; কেন না, ভারতীয় আলঙ্কারিকদিগের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ, তাহা সকলই এই দুই কাব্যে আছে। কিন্তু ইউরোপের সমালোচকদিগের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ, এই দুই নাটকে তাহা নাই। ওথেলো নাটকে তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে। ওথেলো নাটক—শকুন্তলা এ হিসাবে উপাখ্যান কাব্য। ইহার ফল এই ঘটিয়াছে যে, দেস্‌দিমোনা-চরিত্র যত পরিস্ফুট হইয়াছে-মিরন্দা বা শকুন্তলা তেমন হয় নাই। দেস্‌দিমোনা সজীব, শকুন্তলা ও মিরন্দা ধ্যানপ্রাপ্য। দেস্‌দিমোনার বাক্যে তাহার কাতর, বিকৃত কন্ঠস্বর আমরা শুনিতে পাই, চক্ষের জল ফোঁটা ফোঁটা গন্ড বহিয়া বক্ষে পড়িতেছে দেখিতে পাই—ভূলগ্নজানু সুন্দরীর স্পন্দিততার লোচনের ঊর্ধ্বদৃষ্টি আমাদিগের হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করে। শকুন্তলার আলোহিত চক্ষুরাদি আমরা দুষ্মন্তের মুখে না শুনিলে বুঝিতে পারি না—যথা,

> ন তির্য্যগবলোকিতং, ভবতি চক্ষুরালোহিতং,
> বচোহতিপরুষাক্ষরং ন চ পদেষু সংগচ্ছতে।
> হিমার্ত্ত ইব বেপতে সকল এব বিম্বাধরঃ
> প্রকামবিনতে ভ্রুবৌ যুগপদেব ভেদং গতে।।

শকুন্তলার দুঃখের বিস্তার দেখিতে পাই না, গতি দেখিতে পাই না, বেগ দেখিতে পাই না; সে সকল দেস্‌দিমোনায় অত্যন্ত পরিস্ফুট। শকুন্তলা চিত্রকরের চিত্র; দেস্‌দিমোনা ভাস্করের গঠিত সজীবপ্রায় গঠন। দেস্‌দিমোনার হৃদয় আমাদিগের সম্মুখে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং সম্পূর্ণ বিস্তারিত; শকুন্তলার হৃদয় কেবল ইঙ্গিতে ব্যক্ত।

সুতরাং দেস্‌দিমোনার আলেখ্য অধিকতর প্রোজ্জ্বল বলিয়া দেসদিমোনার কাছে শকুন্তলা দাঁড়াইতে পারেন না। নতুবা ভিতরে দুই এক। শকুন্তলা অর্দ্ধেক মিরন্দা, অর্দ্ধেক দেস্‌দিমোনা। পরিণীতা শকুন্তলা দেস্‌দিমোনার অনুরূপিনী, অপরিণীতা শকুন্তলা মিরন্দার অনুরূপিনী।

বাঙ্গালা ভাষা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রায় সকল দেশেই লিখিত ভাষা এবং কথিত ভাষায় অনেক প্রভেদ। যে সকল বাঙ্গালী ইংরেজী সাহিত্যে পারদর্শী, তাঁহারা একজন লন্ডনী কক্‌নী বা একজন কৃষকের কথা সহজে বুঝিতে পারে না, এবং এতদ্দেশে অনেক দিন বাস করিয়া বাঙ্গালীর সহিত কথাবার্তা কহিতে কহিতে যে ইংরেজেরা বাঙ্গালা শিখিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় একখানিও বাঙ্গালাগ্রন্থ বুঝিতে পারেন না। প্রাচীন ভারতেও সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে, আদৌ বোধ হয়, এইরূপ প্রভেদ ছিল, এবং সেই প্রভেদ হইতে আধুনিক ভারতবর্ষীয় ভাষাসকলের উৎপত্তি।

বাঙ্গালার লিখিত এবং কথিত ভাষায় যতটা প্রভেদ দেখা যায়, অন্যত্র তত নহে। বলিতে গেলে, কিছুকাল পূর্বে দুইটি পৃথক ভাষা বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। একটির নাম সাধু ভাষা; অপরটির নাম অপর ভাষা। একটি লিখিবার ভাষা, দ্বিতীয়টি কহিবার ভাষা। পুস্তকে প্রথম ভাষাটি ভিন্ন, দ্বিতীয়টির কোন চিহ্ন পাওয়া যাইত না। সাধুভাষার অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ-সকল বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের আদিম রূপের সঙ্গে সংযুক্ত হইত। যে শব্দ আভাঙ্গা সংস্কৃত নহে, সাধুভাষায় প্রবেশ করিবার তাহার কোন অধিকার ছিল না। লোকে বুঝুক বা না বুঝুক, আভাঙ্গা সংস্কৃত চাহি। অপরভাষা সেদিকে না গিয়া, যাহা সকলের বোধগম্য, তাহাই ব্যবহার করে।

গদ্য গ্রন্থাদিতে সাধুভাষা ভিন্ন আর কিছু ব্যবহার হইত না। তখন পুস্তকপ্রণয়ন সংস্কৃত ব্যবসায়ীদিগের হাতে ছিল। অন্যের বোধ ছিল যে, যে সংস্কৃত না জানে, বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়নে তাহার কোন অধিকার নাই, সে বাঙ্গালা লিখিতে পারেই না। যাঁহারা ইংরেজিতে পণ্ডিত, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে না জানা গৌরবের মধ্যে গণ্য করিতেন। সুতরাং বাঙ্গালার রচনা ফোঁটা-কাটা অনুস্বারবাদীদিগের একচেটিয়া মহল ছিল। সংস্কৃতেই তাঁহাদিগের গৌরব। তাঁহারা ভাবিতেন, সংস্কৃতেই তবে বুঝি বাঙ্গালা ভাষার গৌরব; যেমন গ্রাম্য বাঙ্গালী স্ত্রীলোকে মনে করে যে, শোভা বাড়ুক না বাড়ুক, ওজনে ভারি সোনা অঙ্গে পরিলেই অলঙ্কার পরার গৌরব হইল, এই গ্রন্থকর্তারা তেমনি জানিতেন, ভাষা সুন্দর হউক বা না হউক, দুর্বোধ্য সংস্কৃতবাহুল্য থাকিলেই রচনার গৌরব হইল।

এইরূপ সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতা হেতু বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্বল; এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়া

রহিল। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি ইংরেজিতে সুশিক্ষিত। ইংরেজিতে প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গদ্যগ্রন্থ রচিত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় "আলালের ঘরের দুলাল" প্রণয়ন করিলেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেইদিন হইতে শুষ্ক তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।

সেই দিন হইতে সাধুভাষা, এবং অপরভাষা, দুই প্রকার ভাষাতেই বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন হইতে লাগিল, ইহা দেখিয়া সংস্কৃতব্যবসায়ীরা জ্বালাতন হইয়া উঠিলেন; অপর ভাষা তাঁহাদিগের বড় ঘৃণ্য। মদ্য, মুরগী এবং টেকচাঁদী বাঙ্গালা এককালে প্রচলিত হইয়া ভট্টাচার্যগোষ্ঠীকে আকুল করিয়া তুলিল। এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষার সমালোচকেরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন। একদল খাঁটি সংস্কৃতবাদী—যে গ্রন্থে সংস্কৃতমূলক শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দ ব্যবহার হয়, তাহা তাঁহাদের বিবেচনায় ঘৃণার যোগ্য। অপর সম্প্রদায় বলেন, তোমাদের ও কচকচি বাঙ্গালা নহে। উহা আমরা কোন গ্রন্থে ব্যবহার করিতে দিব না। যে ভাষা বাঙ্গালা সমাজে প্রচলিত, যাহাতে বাঙ্গালার নিত্য কার্য সকল সম্পাদিত হয়, যাহা সকল বাঙ্গালীতে বুঝে, তাহাই বাঙ্গালা ভাষা—তাহাই গ্রন্থাদির ব্যবহারের যোগ্য। অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তি এক্ষণে এই সম্প্রদায়ভুক্ত। আমরা উভয় সম্প্রদায়ের এক এক মুখপাত্রের উক্তি এই প্রবন্ধে সমালোচিত করিয়া স্থূল বিষয়ের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব।

সংস্কৃতবাদী সম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ আমরা রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে গ্রহণ করিতেছি। বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত থাকিতে আমরা ন্যায়রত্ন মহাশয়কে এই সম্প্রদায়ের মুখপাত্র স্বরূপ গ্রহণ করিলাম, ইহাতে সংস্কৃতবাদীদিগের প্রতি কিছু অবিচার হয়, ইহা আমরা স্বীকার করি। ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃতে সুশিক্ষিত, কিন্তু ইংরেজি জানেন না—পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য তাঁহার নিকট পরিচিত নহে। তাঁহার প্রণীত বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে ইংরেজি বিদ্যার একটু পরিচয় দিতে গিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় কিছু লোক হাসাইয়াছেন। আমরা সেই গ্রন্থ হইতে সিদ্ধ করিতেছি যে, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের অনুশীলনে যে সুফল জন্মে, ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহাতে বঞ্চিত। তিনি এই সুফলে বঞ্চিত, বিচার্য বিষয়ে তাঁহার মত তাঁহার নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই যে অধিক গৌরব প্রাপ্ত হইবে, এমত বোধ

হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যে সকল সংস্কৃতবাদী পণ্ডিতদিগের মত অধিকতর আদরণীয়, তাঁহারা কেহই সেই মত, স্বপ্রণীত কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের কাহারও নাম উল্লেখ করিতে আমরা সক্ষম হইলাম না। ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বপ্রণীত উক্ত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে আপনার মতগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এই জন্যই তাঁহাকে এই সম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ ধরিতে হইল। তিনি "আলালের ঘরের দুলাল" হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে, "এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সর্ববিধ গ্রন্থরচনায় এইরূপ ভাষা আদর্শস্বরূপ হইতে পারে কি না? আমাদের বিবেচনায় কখনই না। আলালের ঘরের দুলাল বল, হুতোমপেঁচা বল, মৃণালিনী বল-পত্নী বা পাঁচজন বয়স্যের সহিত পাঠ করিয়া আমোদ করিতে পারি—কিন্তু পিতাপুত্রে একত্রে বসিয়া অসঙ্কুচিতমুখে কখনই ও সকল পরিতে পারি না। বর্ণনীয় বিষয়ের লজ্জাজনকতা উহা পড়িতে না পারিবার কারণ নহে, ঐ ভাষারই কেমন একরূপ ভঙ্গী আছে, যাহা গুরুজনসমক্ষে উচ্চারণ করিতে লজ্জা বোধ হয়। পাঠকগণ! যদি আপনাদের উপর বিদ্যালয়ের পুস্তক-নির্বাচনের ভার হয়, আপনারা আলালী ভাষায় লিখিত কোন পুস্তককে পাঠ্যরূপে নির্দেশ করিতে পারিবেন কি?—বোধ হয়, পারিবেন না। কেন পারিবেন না?—ইহার উত্তরে অবশ্য এই কথা বলিবেন যে, ওরূপ ভাষা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ নয় এবং উহা সর্বসমক্ষে পাঠ করিতে লজ্জা বোধ হয়। অতএব বলিতে হইবে যে আলালী ভাষা সম্প্রদায় বিশেষের বিশেষ মনোরঞ্জিকা হইলেও, উহা সর্ববিধ পাঠকের পক্ষে উপযুক্ত নহে। যদি তাহা না হইল, তবে আবার জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, ঐরূপ ভাষায় গ্রন্থরচনা করা উচিত কি না?—আমাদের বোধে অবশ্য উচিত। যেমন ফলারে বসিয়া অনবরত মিঠাই মণ্ডা খাইলে জিহ্বা একরূপ বিকৃত হইয়া যায়—মধ্যে মধ্যে আদার কুচি ও কুমড়ার খাট্টা মুখে না দিলে সে বিকৃতির নিবারণ হয় না, সেইরূপ কেবল বিদ্যাসাগরী রচনা শ্রবণে কর্ণের যে একরূপ ভাব জন্মে তাহার পরিবর্তন করণার্থ মধ্যে মধ্যে অপরবিধ রচনা শ্রবণ করা পাঠকদিগের আবশ্যক।"

আমরা ইহাতে বুঝিতেছি যে প্রচলিত ভাষা ব্যবহারের পক্ষে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রধান আপত্তি যে, পিতা-পুত্রে একত্রে বসিয়া এরূপ ভাষা ব্যবহার করিতে পারে না। বুঝিলাম যে, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিবেচনায় পিতা-পুত্রে বড় বড় সংস্কৃত শব্দে কথোপকথন করা কর্তব্য: প্রচলিত ভাষায় কথাবার্তা হইতে পারে না। এই আইন চলিলে বোধ হয়, ইহার পর শুনিব যে, শিশু মাতার কাছে খাবার চাহিবার সময় বলিবে, "হে মাতঃ খাদ্যং দেহি মে"

এবং ছেলে বাপের কাছে জুতোর আবদার করিবার সময় বলিবে, "ছিন্নেয়ং পাদুকা মদীয়া।" ন্যায়রত্ন মহাশয় সকলের সম্মুখে সরল ভাষা ব্যবহার করিতে লজ্জা বোধ করেন, এবং সেই ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ বিবেচনা করেন না, ইহা শুনিয়া তাহার ছাত্রদিগের জন্য আমরা বড় দুঃখিত হইলাম। বোধ হয়, তিনি স্বীয়-ছাত্রগণকে উপদেশ দিবার সময়ে লজ্জাবশতঃ দেড়গজী সমাস পরম্পরা বিন্যাসে তাহাদিগের মাথা ঘুরাইয়া দেন। তাহারা যে এবং-বিধ শিক্ষায় অধিক বিদ্যা উপার্জন করে, এমত বোধ হয় না। কেন না, আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে ইহাই উপলব্ধি হয় যে, যাহা বুঝিতে না পারা যায়, তাহা হইতে কিছু শিক্ষালাভ হয় না। আমাদের এইরূপ বোধ আছে যে, সরল ভাষাই শিক্ষাপ্রদ। ন্যায়রত্ন মহাশয় কেন সরল ভাষাকে শিক্ষা-প্রদ নহে বিবেচনা করিয়াছেন, তাহা আমরা অনেক ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। বোধ হয়, বাল্যসংস্কার ভিন্ন আর কিছু সরল ভাষার প্রতি তাঁহার বীতরাগের কারণ নহে। আমরা আরও বিস্মিত হইয়া দেখিলাম যে, তিনি স্বয়ং যে ভাষায় বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তাহাও সরল প্রচলিত ভাষা। টেকচাঁদী ভাষার সংগে এবং তাঁহার ভাষার সংগে কোন প্রভেদ নাই, প্রভেদ কেবল এই যে, টেকচাঁদে রঙ্গরস আছে, ন্যায়রত্নে কোন রঙ্গরস নাই। তিনি যে বলিয়াছেন, যে পিতা-পুত্রে একত্রে বসিয়া অসংকুচিত মুখে টেকচাঁদী ভাষা পড়িতে পারা যায় না, তাহার প্রকৃত কারণ টেকচাঁদে রঙ্গরস আছে। বাঙ্গালাদেশে পিতা-পুত্রে একত্র বসিয়া রঙ্গরস পড়িতে পারে না। সরলচিত্ত অধ্যাপক এতটুকু বুঝিতে না পারিয়াই বিদ্যা-সাগরী ভাষার মহিমা কীর্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভাষা হইতে রঙ্গরস উঠাইয়া দেওয়া যদি ভট্টাচার্য মহাশয়দিগের মত হয়, তবে তাঁহারা সেই বিষয়ে যত্নবান হউন। কিন্তু তাহা বলিয়া অপ্রচলিত ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা করিতে চেষ্টা করিবেন না।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মত সমালোচনায় আর অধিক কাল হরণ করিবার আমাদিগের ইচ্ছা নাই। আমরা এক্ষণে সুশিক্ষিত অথবা নব্য সম্প্রদায়ের মত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। এই সম্প্রদায়ের সকলের মত একরূপ নহে। ইহার মধ্যে একদল এমন আছেন যে, তাঁহারা কিছু বাড়াবাড়ি করিতে প্রস্তুত। তন্মধ্যে বাবু শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় গত বৎসর কলিকাতা রিভি-উতে বাঙ্গালা ভাষার বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি উৎকৃষ্ট তাঁহার মতগুলি অনেক স্থলে সুসংগত এবং আদরণীয়। অনেক স্থলে তিনি কিছু বেশী গিয়াছেন। বহুবচন জ্ঞাপনে গণশব্দ ব্যবহার করার প্রতি তাঁহার কোপদৃষ্টি। বাঙ্গালায় লিঙ্গভেদ তিনি মানেন না। পৃথিবী যে

স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ, ইহা তাঁহার অসহ্য। বাঙ্গালায় সন্ধি তাঁহার চক্ষুঃশূল। বাঙ্গালায় তিনি 'জনৈক' লিখিতে দিবেন না। ত্ব প্রত্যয়ান্ত এবং য প্রত্যয়ান্ত শব্দ ব্যবহার করিতে দিবেন না। সংস্কৃত সংখ্যাবাচক শব্দ, যথা—একাদশ বা চত্বারিংশৎ বা দ্বিশত ইত্যাদি বাঙ্গালায় ব্যবহার করিতে দিবেন না। ভ্রাতা কল্য, কর্ণ, স্বর্ণ, তাম্র, পত্র, মস্তক, অশ্ব ইত্যাদি শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহার করিতে দিবেন না। ভাই, কাল, কান, সোনা, কেবল এই সকল শব্দ ব্যবহার হইবে। এইরূপ তিনি বাঙ্গালাভাষার উপর অনেক দৌরাত্ম্য করিয়াছেন। তথাপি তিনি এই প্রবন্ধে বাঙ্গালাভাষা সম্বন্ধে অনেকগুলিন সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। বাঙ্গালা লেখকেরা তাহা স্মরণ রাখেন, ইহা আমাদের ইচ্ছা।

শ্যামাচরনবাবু বলিয়াছেন এবং সকলেই জানেন যে, বাঙ্গালা শব্দ ত্রিবিধ। প্রথম, সংস্কৃতমূলক শব্দ, যাহার বাঙ্গালায় রূপান্তর হইয়াছে, যথা—গৃহ হইতে ঘর, ভ্রাতা হইতে ভাই। দ্বিতীয়, সংস্কৃতমূলক শব্দ, যাহার রূপান্তর হয় নাই। যথা—জল, মেঘ, সূর্য। তৃতীয়, যে সকল শব্দের সংস্কৃতের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই।

প্রথম শ্রেণীর শব্দ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, রূপান্তরিত প্রচলিত সংস্কৃত-মূলক শব্দের পরিবর্তে কোন স্থানেই অরূপান্তরিত মূল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা কর্তব্য নহে, যথা—মাথার পরিবর্তে মস্তক, বামনের পরিবর্তে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ব্যবহার করা কর্তব্য নহে। আমরা বলি যে, এক্ষণে বামনও যেমন প্রচলিত, ব্রাহ্মণ সেইরূপ প্রচলিত। পাতাও যেরূপ প্রচলিত, পত্র ততদূর না হউক, প্রায় সেইরূপ প্রচলিত। ভাই যেরূপ প্রচলিত, ভ্রাতা ততদূর না হউক, প্রায় সেইরূপ প্রচলিত। যাহা প্রচলিত হইয়াছে তাহার উচ্ছেদে কোন ফল নাই এবং উচ্ছেদ সম্ভবও নহে। কেহ যত্ন করিয়া মাতা, পিতা, ভ্রাতা, গৃহ, তাম্র বা মস্তক ইত্যাদি শব্দকে বাঙ্গালা ভাষা হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারিবেন না। আর বহিষ্কৃত করিয়াই বা ফল কি? এ বাঙ্গালা দেশে কোন্ চাষা আছে যে, ধান্য, পুষ্করিণী, গৃহ বা মস্তক ইত্যাদি শব্দের অর্থ বুঝে না। যদি সকলে বুঝে, তবে কি দোষে এই শ্রেণীর শব্দগুলি বধার্হ? বরং ইহাদের পরিত্যাগে ভাষা কিয়দংশে ধনশূন্য হইবে মাত্র। নিষ্কারণ ভাষাকে ধনশূন্য করা কোন ক্রমে বাঞ্ছনীয় নহে। আর কতকগুলি এমত শব্দ আছে যে তাহাদের রূপান্তর ঘটিয়াছে আপাতত বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক রূপান্তর ঘটে নাই, কেবল সাধারণের উচ্চারণের বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। সকলেই উচ্চারণ করে "খেউরি", কিন্তু ক্ষৌরী লিখিলে সকলে বুঝে যে, এই সেই "খেউরি" শব্দ। এ স্থলে ক্ষৌরীকে পরিত্যাগ করিয়া খেউরি প্রচলিত করায় কোন লাভ নাই। বরং এমত স্থলে আদিম সংস্কৃত রূপটি বজায় রাখিলে ভাষায় স্থায়িত্ব জন্মে। কিন্তু এমন অনেকগুলি শব্দ আছে যে, তাহার আদিম রূপ সাধারণের

প্রচলিত বা সাধারণের বোধগম্য নহে—তাহার অপভ্রংশই প্রচলিত এবং সকলের বোধগম্য। এমত স্থলেই আদিম রূপ কদাচ ব্যবহার্য নহে।

যদিও আমরা এমন বলি না যে, "ঘর" প্রচলিত আছে বলিয়া গৃহ শব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে, অথবা মাথা শব্দ প্রচলিত আছে বলিয়া মস্তক শব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে; কিন্তু আমরা এমত বলি যে, অকারণে ঘর শব্দের পরিবর্তে গৃহ, অকারণে মাথার পরিবর্তে মস্তক, অকারণে পাতার পরিবর্তে পত্র এবং তামার পরিবর্তে তাম্র ব্যবহার উচিত নহে। কেননা, ঘর, মাথা, পাতা, তামা, বাঙ্গালা; আর গৃহ, মস্তক, পত্র, তাম্র সংস্কৃত। বাঙ্গালা লিখিতে গিয়া অকারণে বাঙ্গালা ছাড়িয়া সংস্কৃত কেন লিখিব? আর দেখা যায় যে, সংস্কৃত ছাড়িয়া বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার করিলে রচনা অধিকতর মধুর সুস্পষ্ট ও তেজস্বী হয়! "হে ভ্রাতঃ" বলিয়া যে ডাকে, বোধ হয় যেন সে যাত্রা করিতেছে; "ভাই রে" বলিয়া যে ডাকে, তাহার ডাকে মন উছলিয়ে ওঠে। অতএব আমরা ভ্রাতা শব্দ উঠাইয়া দিতে চাই না বটে, কিন্তু সচরাচর আমরা ভাই শব্দটি ব্যবহার করিতে চাই। ভ্রাতা শব্দ রাখিতে চাই, তাহার কারণ এই যে, সময়ে সময়ে তদ্ব্যবহারে বড় উপকার হয়। "ভ্রাতৃভাব" এবং "ভাই-ভাব", "ভ্রাতৃত্ব" এবং "ভাইগিরি" এতদুভয়ের তুলনায় বুঝা যাইবে যে, কেন ভ্রাতৃ শব্দ বাঙ্গালায় বজায় রাখা উচিত। এই স্থলে বলিতে হয় যে, আজিও অকারণে প্রচলিত বাঙ্গালা ছাড়িয়া সংস্কৃত ব্যবহারে, ভাই ছাড়িয়া অকারণে ভ্রাতৃ শব্দেরব্যবহারে অনেক লেখকের বিশেষ অনুরক্তি আছে। অনেক বাঙ্গালা রচনা যে নীরস, নিস্তেজ এবং অস্পষ্ট, ইহাই তাহার কারণ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দ, অর্থাৎ যে সকল সংস্কৃত শব্দ রূপান্তরিত না হইয়াই বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ যে সকল শব্দ সংস্কৃতের সহিত সম্বন্ধশূন্য, তৎসম্বন্ধে শ্যামাচরণবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত সারগর্ভ এবং আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। সংস্কৃতপ্রিয় লেখকদিগের অভ্যাস যে, এই শ্রেণীর শব্দ সকল তাঁহারা রচনা হইতে একেবারে বাহির করিয়া দেন। অন্যের রচনায় সে সকল শব্দের ব্যবহার শেলের ন্যায় তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করে। ইহার পর মূর্খতা আমরা আর দেখি না, যদি কোন ধনবান্ ইংরেজের অর্থভান্ডারে হালি এবং বাদশাহী দুইপ্রকার মোহর থাকে, এবং সেই ইংরেজ যদি জাত্যাভিমানের বশ হইয়া বিবির মাথাওয়ালা মোহর রাখিয়া, ফার্সি লেখা মোহরগুলি ফেলিয়া দেয়, তবে সকলেই সেই ইংরেজকে ঘোরতর মূর্খ বলিবে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, এই পন্ডিতেরা সেই মত মূর্খ।

তাহার পরে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দকে বাঙ্গালা ভাষায় নূতন সন্নিবেশিত করার ঔচিত্য বিচার্য। দেখা যায়, লেখকেরা ভূরি ভূরি অপ্রচলিত নূতন

সংস্কৃত শব্দ প্রয়োজনে বা নিষ্প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা আজিও অসম্পূর্ণ ভাষা, তাহার অভাব পূরণের জন্য অন্য ভাষা হইতে সময়ে সময়ে শব্দ কর্জ করিতে হইবে। কর্জ করিতে হইলে, চিরকেলে মহাজন সংস্কৃতের কাছেই ধার করা কর্তব্য। প্রথমতঃ, সংস্কৃত মহাজনই পরম ধনী: ইহার রত্নময় শব্দভান্ডার হইতে যাহা চাও, তাহাই পাওয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃত হইতে শব্দ লইলে, বাঙ্গালার সঙ্গে ভাল মিশে। বাঙ্গালার অস্থি, মজ্জা, শোণিত, মাংস সংস্কৃতেই গঠিত। তৃতীয়তঃ, সংস্কৃত হইতে নূতন শব্দ লইলে, অনেকে বুঝিতে পারে; ইংরেজী বা আরবী হইতে লইলে কে বুঝিবে? "মাধ্যাকর্ষণ" বলিলে কতক অর্থ অনেক অনভিজ্ঞ লোকেও বুঝে। "গ্রাবিটেশ্যন্" বলিলে ইংরেজী যাহারা না বুঝে, তাহারা কেহই বুঝিবে না। অতএব যেখানে বাঙ্গালা শব্দ নাই, সেখানে অবশ্য সংস্কৃত হইতে অপ্রচলিত শব্দ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু নিষ্প্রয়োজনে অর্থাৎ বাঙ্গালা শব্দ থাকিতে তদ্বাচক অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার যাঁহারা করেন, তাঁহাদের কিরূপ রুচি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

স্থূল কথা, সাহিত্য কি জন্য? গ্রন্থ কি জন্য? যে পড়িবে তাহার বুঝিবার জন্য। না বুঝিয়া, বহিবদ্ধ করিয়া, পাঠক ত্রাহিত্রাহি করিয়া ডাকিবে, বোধ হয় এ উদ্দেশ্যে কেহ গ্রন্থ লিখে না। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে যে ভাষা সকলের বোধগম্য—অথবা যদি সকলের বোধগম্য কোন ভাষা না থাকে, তবে যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য—তাহাতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত। যদি কোন লেখকের এমন উদ্দেশ্য থাকে যে, আমার গ্রন্থ দুই-চারিজন শব্দ-পন্ডিতে বুঝুক, আর কাহারও বুঝিবার প্রয়োজন নাই, তবে তিনি গিয়া দুরূহ ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হউন। যে তাঁহার যশ করে করুক, আমরা কখনও যশ করিব না। তিনি দুই একজনের উপকার করিলে করিতে পারেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে পরোপকারকাতর খল-স্বভাব পাষন্ড বলিব। তিনি জ্ঞানবিতরণে প্রবৃত্ত হইয়া, চেষ্টা করিয়া অধিকাংশ পাঠককে আপনার জ্ঞান ভান্ড়ার হইতে দূরে রাখেন। যিনি যথার্থ গ্রন্থকার, তিনি জানেন যে, পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থপ্রণয়নের উদ্দেশ্য নাই; জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিত্তোন্নতি ভিন্ন রচনার অন্য উদ্দেশ্য নাই; অতএব যত অধিক ব্যক্তি গ্রন্থের মর্ম গ্রহণ করিতে পারে, ততই অধিক ব্যক্তি উপকৃত—ততই গ্রন্থের সফলতা। জ্ঞানে মনুষ্যমাত্রেরই তুল্যাধিকার। যদি সে সর্বজনের প্রাপ্য ধনকে, তুমি এমত দুরূহ ভাষায় নিবদ্ধ রাখ যে, কেবল যে কয়জন পরিশ্রম করিয়া সেই ভাষা শিখিয়াছে, তাহারা ভিন্ন আর কেহ তাহা পাইতে পারিবে না, তবে তুমি অধিকাংশ মনুষ্যকে তাহাদিগের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিলে। তুমি সেখানে বঞ্চক মাত্র।

তাই বলিয়া আমরা এমত বলিতেছি না যে, বাঙ্গালার লিখন পঠন হুতোমি ভাষায় হওয়া উচিত। তাহা কখনও হইতে পারে না। যিনি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে। কারণ, কথনের এবং লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন, কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্তসঞ্চালন। এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোমি ভাষায় কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই, হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই: হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতাশূন্য। হুতোমি ভাষায় কখনও গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্তব্য নহে। যিনি হুতোমপেঁচা লিখিয়াছিলেন তাঁহার রুচি বা বিবেচনার প্রশংসা করি না।

টেকচাঁদী ভাষা, হুতোমি ভাষার এক পৈঠা উপর। হাস্য ও করুণরসের ইহা বিশেষ উপযোগী। স্কচ, কবি বর্ণস্, হাস্য ও করুণরসাত্মিকা কবিতায় স্কচ্ ভাষা ব্যবহার করিতেন, গম্ভীর এবং উন্নত বিষয়ে ইংরেজী ব্যবহার করিতেন। গম্ভীর এবং উন্নত বা চিন্তাময় বিষয় টেকচাঁদী ভাষায় কুলায় না। কেননা, এ ভাষাও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, দুর্বল এবং অপরিমার্জিত।

অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে যে, বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন, সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে, এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য, সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য, মিশাইতে হইবে। অনেকের রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য—সে স্থলে সৌন্দর্যের অনুরোধ শব্দের একটু অসাধারণতা সহ্য করিতে হয়। প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত কথাবার্তার ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চভাষার আশ্রয় লইবে? যদি সে পক্ষে টেকচাঁদী বা হুতোমী ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভুদেববাবু-প্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্যসিদ্ধ না হয়, আরও উপরে উঠিবে; প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই—নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি। বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে—যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে—তজ্জন্য ইংরেজি, ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল

ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না। তারপর সেই রচনাকে সৌন্দর্যবিশিষ্ট করিবে —কেননা যাহা অসুন্দর, মনুষ্যচিত্তের উপর তাহার শক্তি অল্প। এই উদ্দেশ্যগুলি যাহাতে সরল প্রচলিত ভাষায় সিদ্ধ হয়, সেই চেষ্টা দেখিবে —লেখক যদি লিখিতে জানেন, তবে সে চেষ্টা প্রায় সফল হইবে। আমরা দেখিয়াছি, সরল প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃতবহুল ভাষার অপেক্ষা শক্তিমতী। কিন্তু যদি সে সরল প্রচলিত ভাষায় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তবে কাজে কাজেই সংস্কৃতবহুল ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে নিঃসঙ্কোচে সে আশ্রয় লইবে।

ইহাই আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি। নব্য ও প্রাচীন উভয় সম্প্রদায়ের পরামর্শ ত্যাগ করিয়া, এই রীতি অবলম্বন করিলে, আমাদের বিবেচনায় ভাষা শক্তিশালিনী, শব্দৈশ্বর্যে পুষ্টা এবং সাহিত্যালঙ্কারে বিভূষিতা হইবে।

গর্দভ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হে গর্দভ! আমার প্রদত্ত, এই নবীন তৃণ সকল ভোজন করুন।

আমি বহুযত্নে, গোবৎসাদির অগম্য প্রান্তরসকল হইতে, নবজলকণানিষেক-সুরভি তৃণাগ্রভাগসকল আহরণ করিয়া আনিয়াছি, আপনি সুন্দর বদনমণ্ডলে গ্রহণ করিয়া, মুক্তানিন্দিত দন্তে ছেদনপূর্বক আমার প্রতি কৃপাবান হউন।

হে মহাভাগ! আপনার পূজা করিব ইচ্ছা হইয়াছে; কেননা, আপনাকেই সর্বত্র দেখিতে পাই। অতএব হে বিশ্বব্যাপিন্! আমার পূজা গ্রহণ করুন।

আমি পূজ্য ব্যক্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া নানা দেশে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া দেখিলাম, আপনি সর্বত্রই বসিয়া আছেন, সকলেই আপনার পূজা করিতেছে। অতএব হে দীর্ঘকর্ণ! আমারও পূজা গ্রহণ করুন।

হে গর্দভ! কে বলে তোমার পদগুলি ক্ষুদ্র? যেখানে সেখানে তোমারই বড় পদ দেখিয়া থাকি। তুমি উচ্চাসনে বসিয়া স্তাবকগণে পরিবৃত হইয়া, মোটা মোটা ঘাসের আঁটি খাইয়া থাক। লোকে তোমার শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রশংসা করে।

তুমিই বিচারাসনে উপবেশন করিয়া, মহাকর্ণদ্বয় ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতেছ। তাহার অগাধ গহ্বর দেখিতে পাইয়া, উকীল নামক কবিগণ নানাবিধ কাব্যরস তন্মধ্যে ঢালিয়া দিতেছে। তখন তুমি শ্রবণতৃপ্তিসুখে অভিভূত হইয়া নিদ্রা গিয়া থাক।

হে বৃহন্মুন্ড! তখন সেই কাব্যরসে আদ্রীভূত হইয়া তুমি দয়াময় হইয়া, অসীম দয়ার প্রভাবে রামের সর্বস্ব শ্যামকে দাও, শ্যামের সর্বস্ব কানাইকে দাও; তোমার দয়ার পার নাই।

হে রজকগৃহভূষণ! কখনও দেখিয়াছি, তুমি লাঙ্গুল সঙ্গোপনপূর্বক কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া, সরস্বতীমন্ডপমধ্যে বঙ্গীয় বালকগণকে গর্দভলোক প্রাপ্তির উপায় বলিয়া দিতেছ। বালকেরা গর্দভলোকে প্রবেশ করিলে, "প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হইল" বলিয়া, মহা গর্জন করিয়া থাক। শুনিয়া আমরা ভয় পাই।

হে প্রকান্ডোদর! তুমিই চতুষ্পাঠীমধ্যে কুশাসনে উপবেশন করিয়া তৈলনিষিক্ত ললাটপ্রান্তরে চন্দনে নদী অঙ্কিত করিয়া, তুলটহস্তে শোভ

পাও। তোমার কৃত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া আমরা ধন্য ধন্য করিতেছি; অতএব হে মহাপশো! আমার প্রদত্ত কোমল তৃণাঙ্কুর ভোজন কর।

তোমারই প্রতি লক্ষ্মীর কৃপা—তুমি নহিলে আর কাহারও প্রতি কমলার দয়া হয় না। তিনি তোমাকে কখনও ত্যাগ করেন না, কিন্তু তুমি তাঁহাকে বুদ্ধির গুণে সর্বদাই ত্যাগ করিয়া থাক। এই জন্যই লক্ষ্মীর চাঞ্চল্য কলঙ্ক। অতএব হে সুপুচ্ছ! তৃণ ভোজন কর।

তুমিই গায়ক! ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার প্রভৃতি সপ্ত সুরই তোমার কণ্ঠে; অন্যে বহুকাল তোমার অনুকরন করিয়া, দীর্ঘশ্মশ্রু রাখিয়া, অনেক প্রকার কাশি অভ্যাস করিয়া, তোমার মত স্বর পাইয়া থাকে। হে ভৈরবকণ্ঠ! ঘাস খাও।

তুমি বহুকাল হইতে পৃথিবীতলে বিচরণ করিতেছ। তুমিই রামায়ণে রাজা দশরথ, নহিলে রাম বনে যাইবে কেন? তুমি মহাভারতে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির, নহিলে পাণ্ডব পাশায় স্ত্রী হারিবে কেন? তুমি কলিযুগে বঙ্গদেশে বৃদ্ধ সেনরাজা ছিলে,- নহিলে বঙ্গদেশে মুসলমান কেন?

তুমি নানারূপে, নানা দেশ আলো করিয়া যুগে যুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ। এক্ষণে তপস্যাবলে, ব্রহ্মার বরে, তুমি বঙ্গদেশে সমালোচক হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছ। হে লোমশাবতার! আমার সমাহৃত কোমল নবীন তৃণাঙ্কুর সকল ভক্ষণ কর, আমি আহলাদিত হইব।

হে মহাপৃষ্ঠ! তুমি কখন রাজ্যের ভার বহ, কখন পুস্তকের ভার বহ, কখন ধোপার গাঁটরি বহ। হে লোমশ! কোন্‌টি গুরুভার, আমায় বলিয়া দাও।

তুমি কখন ঘাস খাও, কখন ঠেঙ্গা খাও, কখন গ্রন্থকারের মাথা খাও; হে লোমশ! কোন্‌টি সুভক্ষ্য, অর্বাচীনকে বলিয়া দাও।

হে সুন্দর! তোমার রূপ দেখিয়া আমি মোহিত হইয়াছি। তুমি যখন গাছতলায় দাঁড়াইয়া, নববর্ষাসারসিক্ত হইতে থাক, দুই মহাকর্ণ উর্ধোত্থিত করিয়া, মুখচন্দ্র বিনত করিয়া, চক্ষু দুটি ক্ষণে মুদ্রিত, ক্ষণে উন্মেষিত করিতে করিতে ভিজিতে থাক,—তোমার পৃষ্ঠে, মুণ্ডে এবং স্কন্ধে বসুধারা বহিতে থাকে—তখন তোমাকে আমি বড় সুন্দর দেখি। হে লোকমনোমোহন! কিছু ঘাস খাও।

বিধাতা তোমায় তেজ দেন নাই, এ জন্য তুমি শান্ত; বেগ দেন নাই, এ জন্য সুধীর; বুদ্ধি দেন নাই, এ জন্য তুমি বিদ্বান; এবং মোট না বহিলে খাইতে পাও না, এ জন্য তুমি পরোপকারী। আমি তোমার যশোগান করিতেছি: ঘাস খাইয়া সুখী কর।

লোক-রঞ্জন

কালী প্রসন্ন ঘোষ

(১৮৪৩—১৯১১)

মনুষ্য সমাজে সাধারণতঃ মনুষ্যের প্রশংশা কিসে ?—না মনুষ্যের চিত্ত-রঞ্জনে। যিনি লোক-রঞ্জনে পটু, তিনিই পুরুষের মধ্যে পুরুষ,—প্রীতিপদ, প্রীতিভাজন, প্রশংসনীয়। আর যিনি লোক-রঞ্জনে অপটু, তিনি যার-পর-নাই প্রীতিমান ও পরার্থপরায়ণ ও যার-পর-নাই উদার-প্রকৃতি, অমায়িক-চরিত্র ও লোক-হিতৈষী মহানুভব হইলেও সাধারণের অপ্রিয় ও অপ্রশংসনীয়। সকল লোকেই, সম্পর্কিত প্রিয় ব্যক্তিদিগকে উপদেশ দিবার সময়ে, এইরূপ বলিয়া থাকেন যে,—তুমি যদি মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া মনুষ্যেরই মনস্তুষ্টি জন্মাইতে না পারিলে,—দশজনে যাহা ভালবাসে তাহা সম্পাদন করিয়া, দশজনের মধ্যে গণনীয় ও দশজনের আদরের পাত্র হইতে সমর্থ না হইলে, তাহা হইলে, এ জীবনে তোমার আর প্রয়োজন কি ? পুত্রের প্রতি পিতার এই উপদেশ, ভ্রাতার প্রতি ভ্রাতার এই উপদেশ, ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের এই উপদেশ, এবং যাহাকে যে উপদেশ দিতে পারে, তাহার প্রতিই তাহার এই উপদেশ।

উল্লিখিত রূপ উপদেশে জগতের কার্যক্ষেত্রে সর্বত্র কিরূপ ফল ফলিতেছে, তাহা অনায়াসেই উপলব্ধ হইতে পারে। কারণ, যাঁহার চক্ষু আছে, তিনিই ইহা দেখিতে পাইবেন যে, মনুষ্য যত প্রকারের কার্যে সংলিপ্ত রহিয়াছে এই লোক-রঞ্জন প্রবৃত্তিই তত্তাবতের মূলে সর্বপ্রধান প্রবর্তনা। লোকের ধর্ম, কর্ম, দান, ধ্যান, শিক্ষা ও সাধনা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, উৎসাহ ও উৎসব, ক্লেশ-ভোগ কষ্টপ্রয়াস, সমস্তই যেন লোক-রঞ্জনের জন্য। সাধারণতঃ বহু লোকের যাহাতে অনুরাগ, তাহাতেই, লোকের অনুরাগ এবং বহু লোকের যাহাতে বিরাগ, তাহাতেই, লোকের বিরাগ। অপিচ, যে কার্যে লোকচক্ষু আকৃষ্ট হইল এবং আকৃষ্ট হইয়া প্রীত হইল, তাহাই কার্য ; এবং যে কার্যে লোকচক্ষু আকৃষ্ট হইল না এবং আকৃষ্ট হইয়াও প্রীতি প্রকাশ করিল না, তাহা লোক-সমাজের উপকার কল্পে যত বড় উচ্চ শ্রেণীর কার্য হউক না কেন, আপাততঃ তাহা অকার্য।

তুমি ভক্ত,—তুমি সাধক। তুমি কিসের জন্য ভক্তি-সাধনার এই কঠোর-ব্রত অবলম্বন করিয়াছ ? লোকের নিকট প্রদর্শনের জন্য, না তোমার আত্মার পরিতৃপ্তির জন্য ? যদি আত্মার পরিতৃপ্তির জন্যই তোমার এই ব্রত-ধর্ম, এই

দুশ্চর তপস্যা, তবে তোমার পরিচ্ছেদে ঐরূপ লোকরোচক বৈচিত্র্য কেন? তোমার উত্থানে উপবেশনে,—তোমার নয়নচালনে কথোপকথনে এবং তোমার প্রত্যেক পদক্রমেই পার্থক্যের ঐরূপ অপূর্ব ভাব কিংবা অভিনব ভঙ্গী কেন? ইহা কি সকলই লোকচক্ষু আকর্ষণের জন্য নহে? তুমি নির্জনে আপনাতে আপনি নিমগ্ন হইয়া আত্মার অভ্যন্তরে ক্ষণকালের তরেও প্রবেশ করিতে ভালবাস না, এবং একমাত্র যাহাতে আত্মার চিরদিনের বিশ্রাম, তুমি তাহার অমৃতময় আবেশ উপভোগ করিতে কখনও অভিলাষী হও না;—অথচ যেই তোমার লোকচক্ষু নিপতিত হয়, অমনি তুমি ধ্যান বিরতি হইয়া নেত্র নিমীলন কর, এবং যিনি বাক্যের অগম্য,—অচিন্ত্যনীয়, তাহাকে তুমি শ্রুতি সুখাবহ বহুবাক্য প্রত্যক্ষবৎ বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হও—তোমার এই ধ্যান, এই স্তোত্র পাঠ এবং জিহ্বার এই ব্যায়াম কাহার প্রীত্যর্থে?

তুমি দাতা, দীন-পালক, পর-দুঃখকাতর পরোপকারী সাধু, তুমি বা কি উদ্দেশ্যে বর্ষাকালীন বারিধারার ন্যায় অবিরাম ধারায় এই দান করিতেছ? ইহা কি লোকমুখে যশোধ্বনির জন্য—না দুঃখীর দুঃখ মোচনের জন্য? যদি দুঃখীর দুঃখ মোচনই তোমার অন্তরের অকৃত্রিম আকাঙ্ক্ষা তবে তোমার দানপরম্পরার অগ্র ও পশ্চাৎ উভয় এই ঢক্কানাদ পটহবাদ্য কেন? যখন কেহ দেখে না ও কেহ শুনে না, তখন তোমার হৃদয় পাষাণ হতেও কঠিন; তখন তুমি অকুন্ঠিতপ্রাণে অশ্রুধারাকুল অসহায় প্রতিবেশীর সর্বস্ব আত্মসাৎ কর, পিতৃহীন বালকের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লও, অস্থিমাত্র সার ক্ষুধিত দুঃখীকে দূর দূর বলিয়া স্বয়ং পঞ্চদশ ব্যঞ্জনে পরিতৃপ্ত হইতে উপবিষ্ট হও, এবং শীত রাতে কম্পিত অতি দীন ভিখারীকে দ্বারদেশ হইতে বাহির করিয়া দিয়া সুগন্ধিবাসিত সুকোমল শয্যায় সুখ-সুপ্তি সম্ভোগ কর। অথচ, যখন সহস্র চক্ষু তোমার দিকে তাকাইয়া থাকে, সহস্র রসনা তোমার গুণানুকীর্তনে ব্যাপৃত হয়, এবং সহস্র বাহু তোমার আশীর্বাদে নাচিয়া উঠে, তখন তুমি ধ্বজপতাকা উড়াইয়া এবং লোক-কোলাহলে দশদিক নিনাদিত করাইয়া দান কর, আর পরদুঃখে পরিতাপ কর এবং পরদুঃখে পরিতাপ কর আর দান কর।

আর, তুমি সাহিত্যিক,—সুখময়ী কল্পনার প্রিয়সেবক, সরস্বতী শক্তির চিরউপাসক, বল দেখি, তুমিই বা কাহার প্রীতিতে সর্বত্র এইরূপ আকুলতা প্রদর্শন করিতেছ? কাহার পদারবিন্দে চিত্ত সমর্পণ করিয়া সুখে-দুঃখে সর্বদা এইরূপ মধুর গীত গাহিতেছ? তুমিও কি যোগী এবং তাপস, দাতা এবং পরোপকারীর ন্যায় লৌকিক যশেরই কাঙ্গাল নহ? যদি কল্পনার লীলাভূমিরূপিনী কবিচিত্তবিনোদিনী প্রকৃতির বিভ্রম-বিলাস ও জগ-

মোহিনী বাণীর জ্যোতির্ময় রূপের বিকাশেই তোমার হৃদয় ডুবিয়া থাকিত, তবে তুমি কখনও আত্মভ্রষ্ট হইয়া এবং আপনার উচ্চব্রত পরিত্যাগ করিয়া, ইতর লোকের দ্বারে দ্বারে নানাবিধ কুৎসিত নট হইয়া নৃত্য করিতে অথবা অজ্ঞান-তিমিরাবৃত অশিক্ষিত লোকের চিত্ত বিনোদনের জন্য ভাষার নিরাবিল পবিত্র দেহে কুরুচির কালিমা তুলিয়া দিতে সাহস পাইতে ? যখন প্রকৃতি সৌদামিনীর ক্ষণিক উন্মেষে হাসিয়া হাসিয়া, এবং নিবিড় কৃষ্ণ-নীরদমালার উন্মাদ-চাঞ্চল্যে অঞ্চল দোলাইয়া, সেই ভীমা ভুবনমোহিনী মূর্তিতে প্রকাশিত হন, হে প্রেমিক সাধক ! তোমার চক্ষু তখন পার্থিব ক্ষতি-লাভগণনার অংকপাতেই নিবিষ্ট থাকে; আবার যখন প্রকৃতি নিশার গভীর অন্ধকারে অঙ্গ ঢাকিয়া মানব জাতির দুঃখ দুষ্কৃতির জন্য নৈশ সমীরের সুগভীর শ্বাস-প্রশ্বাসে শোকাতুরার মত হাহাকার করেন, তোমার কর্ণ তখনও তৎপ্রতি বধির রহিয়া নিকৃষ্টজন ভোগ্য নিকৃষ্ট সুখের আহবানই শ্রবণ করিতে রহে। অথচ, যেই তুমি লোকবহুল সভাস্থলে যাইয়া উপবিষ্ট হও, অমনি তোমার চক্ষু প্রকৃতির প্রেমে দরদরিত ধারায় বাষ্পবারি বিমোচন করে, তোমার হৃদয় কল্পনার প্রমোদস্পর্শে উছলিয়া উঠে ইহা কি প্রকৃতই বিচিত্র নহে ?

বস্তুতঃ এই প্রকারে দৃষ্ট হইবে যে, লোকজগতের অধিকাংশ ক্রিয়াই লোকমোহনের প্রক্রিয়ামাত্র অথবা প্রাণশূন্য ক্রিয়ার প্রাণপ্রীতিকর সাড়ম্বর প্রদর্শন! কারণ, প্রকৃত ক্রিয়ায় তোমার যে আনন্দ নাই, ক্রিয়ার প্রদর্শনে তাহার শতগুণ আনন্দ এবং অন্ধকারে তোমার যে উৎসাহ নাই, লোক দৃষ্টির আলোকে তাহার শতগুণ উৎসাহ। লোকে যখন চালায়, তখন তুমি চল, এবং লোকে যখন না চালায়, তখন তুমি নির্জীবের মত পড়িয়া রহ। শুধু ইহাই নহে, লোকে অনেক সময় না বুঝিয়া যাহা ভালবাসে, অতি অপ্রিয় বস্তু হইলেও তাহাই তুমি ভালবাসিতে চেষ্টা কর, এবং লোকে শক্তির অল্পতা অথবা অন্য কোন কারণে যাহা ভালবাসিতে পারে না, অতি প্রিয় বস্তু হইলেও তাহাতে তুমি ঘৃণা প্রকাশ করিতে যত্নশীল হও। যেন লোকের চিত্ত তর্পণেই তোমার জীবনের পরীক্ষা, এবং লৌকিক প্রতিষ্ঠা লাভের বিবিধ পদ্ধতিতে পদচারণাই তোমার প্রধান শিক্ষা।

ইহার পর সহজেই এই জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় যে পৃথিবীতে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, বহুদর্শী ও অদূরদর্শী সকলেই যদি লোক-রঞ্জনের অনুকূল ক্রিয়াকলাপ লইয়া এইরূপ ব্যাপৃত, তবে কি লোক-রঞ্জনই মানব-জীবনের একমাত্র কর্তব্য ও একমাত্র ব্রত ?

এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমতঃ ইহাই আমাদিগের বক্তব্য যে, মনুষ্য যতই

কেন চেষ্টা না করুক, যতই কেন আকুল না হউক, সর্বতঃসিদ্ধ ও সর্বসম্মত লোক-রঞ্জন আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক পদার্থ; উহা স্বভাবতঃ অসাধ্য ও অসম্ভব।

মনুষ্যের মধ্যে এমন কেহ নাই, যাহার মতিগতি সর্বাংশে অন্যান্য মনুষ্যের মতিগতির সহিত একভাবাপন্ন। সুতরাং যে কার্যে একজনের মনে পরম তৃপ্তি, সেই কার্যেই আর একজনের মনে যৎপরোনাস্তি অতৃপ্তি; এবং যে কার্যেই একজনের মুখে যশ, সেই কার্যেই আবার এক জনের মুখে অযশ।

তুমি যাহাকে প্রেমিক বলিয়া আদর কর, আমি তাহাকে স্ত্রৈণ বলিয়া উপহাস করি; এবং আমি যাহাকে প্রিয়ংবদ বলিয়া প্রশংসা করি, তৃতীয় এক ব্যক্তি তাহাকে অমিত-ভাষী বলিয়া ঘৃণা করেন। যিনি আমার বিবেচনায় সমাজ সংস্কারক সাধু পুরুষ তোমার বিবেচনায় তিনি সমাজদ্রোহী পাষন্ড; এবং যিনি তোমার বিবেচনায় পরম ভক্ত পূজ্য ব্যক্তি, আমার বিবেচনায় তিনি একটি ক্রীড়াপটু নট।

ঐ যে যুবা, বহুবিধ বিচিত্র আভরণে অলংকৃত এবং সুতাতন্তু সদৃশ সূক্ষ্ম অম্বরে অর্ধ-আবৃত হইয়া, কেবলই হাসিতেছে আর বিলাসভঙ্গী প্রদর্শন করিতেছে এবং যিনি যে কোন প্রসঙ্গে যে কোন চিন্তাগর্ভ কথার উল্লেখ করিতেছেন, তাহাই গোলড্‌স্মিথের থরন্‌হিলের ন্যায় অসাময়িক হাস্যে উড়াইয়া দিয়া, আপনার আমোদশীলতা ও ইঙ্গিত-নৈপুণ্যের পরিচয় দিতেছে, ইহাকেই কি তোমরা অলিভিয়া প্রভৃতি অবোধ অবলাদিগের ন্যায় সুরসিক বলিয়া আদর কর? রসগ্রাহী বিজ্ঞ সমাজে ইনি একটি অন্তঃসারশূন্য অকাল-কূষ্মন্ড, কিংবা তাহা হইতেও অপকৃষ্ট বস্তু। আর ঐ যে বহু প্রতিষ্ঠান্বিত, পদানত, বিনীত পুরুষ, সকলের নিকটেই বিনয়ে নুইয়া পড়িয়া, সকলের সকল কথাই অবনত মস্তকে অনুমোদন করিতেছেন, সত্যের অপলাপ কিংবা অসত্যের প্রশ্রয় ইত্যাদি কিছুরই প্রতি দৃকপাত না করিয়া, কিংবা চিত্তের অবস্থাজনক অধীরতায় দৃকপাত করিবার অবসর না পাইয়া, যে যাহা বলিতেছে তাহাই মুখ-ভঙ্গি দ্বারা মানিয়া লইতেছেন এবং পরিশেষে পরস্পর মতদ্বৈধদর্শনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ইহার ও উহার মুখপানে অতি কাতর নয়নে চাহিতেছেন, ইহাকেই কি তোমরা সুবিনীত সামাজিক বলিয়া সংবর্ধনা কর? প্রকৃত সামাজিকদিগের চক্ষে ইনি একটি মস্তিষ্কশূন্য মাংসপিন্ড অথবা পিন্ডীভূত ভন্ডতা।

বল এখন লোক-রঞ্জন কি? বল কিরূপে একই কার্যের অনুষ্ঠানে কিংবা নীতির একই পথ অবলম্বনে মনুষ্য যুগপৎ সকল শ্রেণীস্থ লোকের মনোরঞ্জন করিবে? যে গ্রীকজাতি আজ সক্রেতিসের চিরস্মরণীয় নামে

জগতে এত সম্মানিত, সেই গ্রীক জাতিই দ্বিধাবিভক্ত হইয়া সক্রেতিসকে এক হস্তে দেবতার অবতার জ্ঞানে পূজা করিয়াছে, এবং তাহাকে অসুর ও অপদেবতা হইতেও অধম বিবেচনায় আর এক হস্তে বিষ প্রয়োগে তাহার প্রাণ সংহার করিয়াছে। যখন নেজারথের সেই লোকবৎসল অলৌকিক যোগী চোর ও দস্যুর ন্যায় ক্রুসকাষ্ঠে বিলম্বিত হন তখন এক দিকে লোকে, শিরে করাঘাত করিয়া, হাহাকার করিয়া কাঁদিয়াছে, আর এক দিকে বিদ্রূপের বিকট হাস্য হাহারবশব্দে সমুত্থিত হইয়াছে। স্টুয়ার্ট আর ক্রমওয়েলকে লইয়া ঐতিহাসিকেরা তিনশত বৎসর বিবাদ করিয়া আসিয়াছেন, এবং বোধ হয়, আরও তিনশত বৎসর বিবাদ করিবেন। যাঁহারা ক্রমওয়েলকে ভন্ডামির স্বয়মন্ধ দাস, অথবা কপটকুশল, ক্রূরচিত্ত কর্মবীর বলেন স্টুয়ার্ট তাহাদিগের চক্ষে প্রীতিজনিত কমনীয়তার প্রফুল্ল প্রতিকৃতি; এবং যাঁহারা স্টুয়ার্টকে প্রজাপীড়ক পাপাত্মা বলিয়া নির্দেশ করেন, ক্রমওয়েল তাঁহাদিগের চক্ষে ধর্মনিয়ন্তা, ধর্মের অবতার, অথবা স্বার্থশূন্য ধর্মবীর। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া এবং পৃথিবীর প্রতি যুগের ইতিহাস অথবা সমাজের সর্বত্র পরিলক্ষিত প্রতিদিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাপুঞ্জ পর্যালোচনা করিয়া, কে আর লোকরঞ্জনে কৃতার্থ হইবার আশা করিতে পারে? এবং আশা করিবার কারণ থাকিলেও লোক-রঞ্জনকে মনুষ্য কোন সাহসে আর পুরুষ্কার সম্পন্ন মনস্বীজনের উচিত বর্ত্ম বলিয়া নির্দেশ করে?

মনুষ্যাত্মার স্বাতন্ত্র্য যে কেমন এক মহামূল্য সম্পদ, দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেকে তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। মনুষ্য শিক্ষার গৌরব করে, সভ্যতার গৌরব করে, এবং সামাজিক সমৃদ্ধিরও গৌরব করে; কিন্তু তাহার অধ্যাত্ম স্বাধীনতা অথবা আত্মার স্বাতন্ত্র্য যে, শিক্ষা, সভ্যতা ও সামাজিক সমৃদ্ধি অপেক্ষাও তাহার নিকট শতগুণ অধিক মূল্যবান বৈভব, তাহা সাধারণতঃ তাহার বুদ্ধিতে লয় না। সে এই বহিঃস্থ জড় প্রকৃতির অনন্ত বৈভব দর্শনেই মোহিত ও বিস্ময়ে অভিভূত রহে অথচ তাহার আপনারই অভ্যন্তরে অন্তরের পূর্ণ আভা কিরূপ আশ্চর্যভাবে নিহিত রহিয়াছে তৎপ্রণিধানে ক্ষণকালের জন্যও তাহার চিত্তনিবেশ হইয়া উঠে না। সেই মেঘমন্ডিত গিরিশৃঙ্গের উচ্চতা, সমুদ্রের অসীম বিস্তার, নদীর আবর্ত, সূর্য চন্দ্রের উদয় ও লয়, এবং সৌর জগতের অনির্বচনীয় মাহাত্ম্য চিন্তা করিয়াই আপনার কল্পিত ক্ষুদ্রতায় আপনি সংকুচিত রহে; অথচ তাহার অন্তরস্থা আশা যে অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গের বহু ঊর্ধ্বে উড্ডীন হয়, তাহার হৃদয়ের বিস্তার যে সমুদ্র বিস্তারকেও লজ্জা দেয়, তাহার তৃষ্ণার আবর্ত যে নদীর ভয়াবহ আবর্তনকেও উপহাস করে, এবং তাহার মন যে অনন্ত কোটি সূর্য এবং অনন্ত কোটি

সৌরজগৎকেও অবহেলায় গ্রাহ্য করতে পারে, বহির্ব্যাপারমুগ্ধ মনুষ্য তাহা ধ্যানপর হইয়া ভাবিয়া দেখে না। ফলতঃ এই সৃষ্ট জগতে মনুষ্যের আত্মা হইতে কিছুই উচ্চতর নহে, এবং কিছুই প্রকৃত মহিমায় অধিকতর মহিমান্বিত নহে। মনুষ্য সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ অথবা সৃষ্ট জগতের মুকুটমণি। তাহার নিকট সিংহাসন ও তৃণ-শয্যা উভয়ই সমান; অথচ সে মানে কিংবা অপমানে, আলোকে কিংবা অন্ধকারে, প্রাসাদে কিংবা পর্ণ কুটিরে যেভাবে অথবা সেখানেই অবস্থান করুক, তাহার নাম মনুষ্য এবং মনুষ্য বলিয়াই সে তাহার আত্মার অপ্রতিম গৌরবে চির-গৌরবান্বিত। অখিল ব্রহ্মান্ডও যদি তাহার প্রতি নির্দয় ও তাহার বিরুদ্ধচারী হয়, সে তাহার আত্মার অনন্তোন্মুখী ভক্তিতে সেই এক দিকে 'দীন-হীন' অকিঞ্চনের ন্যায় অন্তরের সহিত অবনত রহিয়া, এই নিখিল ব্রহ্মান্ডেরই বিরুদ্ধে আপনাকে আপনি 'অহং,' অর্থাৎ 'কোমি' বলিয়া অক্ষুব্ধভাবে নির্দেশ করিতে পারে; এবং ধর্ম যদি তাহার অনুকূলে অথবা লোকের মঙ্গল তাহার অভীপ্সিত অবলম্বন হয়, তাহা হইলে সে ব্রহ্মান্ডের সমস্ত লোকের সমবেত ইচ্ছার প্রতিকূলে একমাত্র আপনার মত ও আপনার ইচ্ছাকেই একটি শক্তিরূপে প্রয়োগ করিয়া সংসারের এক কোণে একাকী দন্ডায়মান রহিতে সর্বোতোভাবে স্বত্ব রাখে। এমন যে অলৌকিক অধিকার-স্বাতন্ত্র্যের এমন যে দেবদুর্লভ বৈভব, মনুষ্য লোক-রঞ্জনের অতি সামান্য নটনৈপুণ্য রক্ষার জন্য ইহাকেও বিসর্জন করিতে বাধ্য হয়। "আমি আমিই বটে, আর একজন নহি" এইরূপ আত্ম-প্রত্যয়সিদ্ধ স্বাভাবিক সংস্কারের অন্তর্মূলে যদি প্রকৃতই কিছু ঐশ্বর্য থাকে, অনেকে লোক-রঞ্জনের প্রথম অনুষ্ঠানেই স্বহস্তে তাহা বলিদান করে। এই হেতুই বুদ্ধি লোক-রঞ্জনের জন্য বিপথগামিনী, শক্তি লোক-রঞ্জনের জন্য অসত্যভাষিণী, প্রবৃত্তি লোক-রঞ্জনের জন্য নীচত্বের অভিসারিণী, এবং চিন্তার নিরাশ্রয় স্রোতও লোক-রঞ্জনের জন্য নিম্নবাহিনী। কাহারও স্বাভাবিক তেজস্বিতা প্রদীপ্ত পাবক-শিখার ন্যায় ধগ্‌ধগ্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল, লোক-রঞ্জন লালসা তাহা নিবাইয়া ফেলিয়াছে; কাহার রুচি ও চিত্ত হিমাদ্রির নির্ঝরবারির ন্যায় নির্মল ছিল, লোক-রঞ্জন লালসায় তাহা ক্রমে ক্রমে পয়ঃ-প্রণালীর অস্পৃশ্য পংক হইতেও অপবিত্র হইয়াছে। পন্ডিত লোক-রঞ্জনের জন্য মূর্খের ছন্দানুবর্তন করিতেছে, বক্তা উদ্দীপনার আনন্দময় স্বর্গ হইতে ভূতলে নামিয়া বিদূষক সাজিতেছে, এবং যে একদিন মহানুভবগণের অগ্রগণ্য ছিল, সে আজি লোক-রঞ্জনের জন্য নিজ পুরুষকার পরিহার করিয়া মর্কট সাজিয়া বসিয়া আছে।

সংসারে কপট বিনয়, কপট প্রণয় এবং কাপট্যের আরও শত সহস্র প্রকারের অভিনয় কেন? এ সকল কি লোক-রঞ্জনেরই অনুরোধে নহে? অনেকে

আত্মার স্বাভাবিক সম্পদে স্বর্গবাসেরও উপযুক্ত হইয়া স্বর্গভ্রষ্ট অপদেবতার ন্যায় অতিধিক্কৃত জীবন যাপন করিতেছেন; অনেকে আবার আপনার দেহ, প্রাণ, প্রতিভা ও মনস্বিতা লোকের বিকৃত প্রবৃত্তির সাময়িক প্রবাহে ভাসাইয়া দিয়া, ইচ্ছাশূন্য তৃণের ন্যায়, কোথায় কোন দিকে জানেন না, ভাসিয়া যাইতেছেন। অনুসন্ধান করিলে, তাঁহাদিগের এই অধঃপাতেও লোক-রঞ্জনকামনাই কি কারণ রূপে প্রতীয়মান হইবে না ?

তবে কি লোক-রঞ্জন পাপ ? এই প্রশ্নের আমূল চিন্তা ও মীমাংসার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

লোক-রঞ্জন প্রবৃত্তির পাঁচটি প্রধান কারণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যথা, লোক-ভয়, লোক-লজ্জা, লৌকিক যশঃ স্পৃহা, লোকের প্রতি দয়া অথবা প্রীতি এবং লোকপরায়ণা ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা।

আমরা এইজন্য রঞ্জনকে পাপ অথবা পাপ হইতেও অবজ্ঞাজনক জ্ঞান করি, এবং যিনি বিঘ্ন বিপত্তির আপাত-শংকায় অথবা কোনরূপ স্বার্থ নাশ, সাংসারিক অনিষ্ট, কিংবা সমৃদ্ধ ও সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের ক্রোধ-সম্ভাবনায় কর্তব্যের সরল পথ হইতে ভয়ের ভাবে পরিভ্রষ্ট হইয়া, লোকচক্ষুর দৃষ্টির পথে অতি জড়সড়ভাবে অবস্থান করেন, আমরা তাদৃশ ক্ষীণ প্রাণ, নিস্তেজ মানুষকে, মনুষ্যের গণনায়, স্বতঃপ্রবৃত্ত পাপীরও বহু নিম্নে রাখি। ইচ্ছাকৃত পাপ অতি বড় গর্হিত, অতি বড় জঘন্য, অথবা অতি বড় ভয়াবহ হইলেও তাহা মনুষ্যের স্বকৃত কার্য, এবং সুতরাং তাহার অনুষ্ঠানে মনের নিরংকুশ গীত ও আত্মার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রহে। তুমি যদি ইচ্ছা করিয়া আপনার গলায় ছুরি দাও, কিংবা ইচ্ছা করিয়া আগুনে ঝাঁপ দিয়া পুড়িয়া মর তাহা হইলে তোমার তাদৃশ্য কার্যকে যতই না কেন নিন্দা করি, তথাপি ইহা স্বীকার করিব যে, উহা তোমার ইচ্ছাকৃত কার্য। মনুষ্য ব্যতীত অন্য কোন জাতীয় জীবই ইচ্ছার এইরূপ অসামান্য স্বাতন্ত্র্য, এই আংশিক বিধাতৃশক্তি এবং এই প্রকার ভয়ংকর উচ্ছৃংখলতার অধিকারী নহে। পশু-পক্ষীর জন্য যে রেখা নির্দিষ্ট রহিয়াছে তাহারা সেই রেখাতে সতত বিচরণ করিতেছে, এবং সেই রেখাতেই নিজ নিজ জীবনকাল বিচরণ করিবে। তাহাদিগের সহিত পাপপুণ্যের কোন সম্পর্ক নাই এবং প্রকৃতির বিদ্রোহাচরণেও পশু-জীবনে কোনরূপ অধিকার ও ক্ষমতা নাই। এই সম্পর্ক মনুষ্যের এবং এই রোমহর্ষণ অধিকার ও ক্ষমতা একমাত্র মনুষ্যের সম্পদ। সুতরাং মনুষ্যের পাপও মনুষ্যাত্মার উচ্চতার পরিচয় দেয়। অনিচ্ছাকৃত পাপাচরণ অথবা ভয় প্রণোদিত লোকানুগত্য স্বভাবতঃই সেই উচ্চ অধিকার ও উচ্চ সম্পদের মূলে কুঠারের মত আঘাত করে, এবং মনুষ্যজীবনকে সর্বতোভাবে পশুজীবনে পরিণত করিয়া উহার নৈসর্গিক বিকাশের সম্পূর্ণ আশাই নির্মূল করিয়া ফেলে ? মনুষ্যের পক্ষে ইহা অপেক্ষা দুঃখ ও অবমাননা আর কি হইতে পারে, বল।

ফলতঃ, যাহারা আপনার ইচ্ছায় কিংবা আপনারই প্রয়োজনে, কোন নীচ বৃত্তি অবলম্বন করে, তাহারা এক শ্রেণীর লোক; এবং যাহারা পরের ইচ্ছায় কিংবা পরের প্রয়োজনে, অথবা পর-চিত্ত-রঞ্জনের কামনায় নীচতা কিংবা নিকৃষ্ট পথের আশ্রয় লয়, তাহারা আর এক শ্রেণীর লোক। আমাদের চক্ষে এই ভ্রকুটিভঙ্গিভীত শেষোক্ত শ্রেণীর মনুষ্যেরাই অধিকতর নিন্দার্হ।

একথা সত্য যে, ইহাদিগের দ্বারা জগতের বিশেষ কিছু অনিষ্ট, কিংবা লোক-সমাজেও বিশেষ কোন অকল্যাণ হয় না; এবং ইহাও সত্য যে, দুষ্ক্রিয়ায় মতি থাকিলেও ইহারা শাসন-ভয়ে তাহাতে প্রায়শঃ প্রকাশ্য হস্তক্ষেপ করে না বরং ইহারা অনেক সময়ে সাধুর সান্নিধ্যে সাধু, এবং শিষ্টের সান্নিধ্যে শিষ্টবেশ পরিগ্রহ করিয়া সৎকার্যেরও আনুকূল্য করে। কিন্তু তথাপি যখনই মনে হয় যে, ইহাদিগের সুমতি ও কুমতি, উন্নতি ও অবনতি, সমস্তেরই মূল হেতু ভয় চিত্ত তখনই ঘৃণায় বিবৃত্ত হইয়া ফিরিয়া আসে

কুসুম কিংবা কুসুম-কোমল বস্ত্রপুটে যেমন কীট, তেমনই মনুষ্য হৃদয়ে ভয়। মনুষ্যের হৃদয়ে যাহাকিছু উৎকৃষ্ট ও উপাদেয়, যাহা কিছু সুদৃশ্য ও সুসৌরভযুক্ত ভয় তৎসমুদয়ই চর্বণের পর চর্বণ করিয়া শেষে সেই হৃদয়-শক্তিকে একেবারে অসার, অকর্মণ্য এবং অবস্তু করিয়া ফেলে এবং যৌবনের নবীন উচ্ছ্বাসে জরা ও বসন্তের প্রমোদ উদ্যানে শীতের সৃষ্টি করিয়া প্রকৃতিকেই একেবারে বিকৃত করিয়া তুলে। লোকের অপকার অথবা আত্মার অবমাননা এই দুইভাবে ভিন্ন মনে ভয়ের ভাবকে আর কোনওভাবে পোষণ করাই মনুষ্যের হিত-জনক নহে। ঈশ্বরকে ভয় কর, একথাও কুশিক্ষা কিংবা কুসংস্কারেরই উপদিষ্ট কথা। ইহা কখনও সমুন্নত ভক্তি ধর্মে ঈশ্বরের অনন্ত ঐশ্বর্যকেও বিস্মৃত হইয়া তাঁহার ভুবন মোহন মাধুর্য লইয়াই ব্যাপৃত রহে—তাঁহাকে প্রাণের জন প্রাণাধিক বন্ধু অথবা প্রাণারাধ্য প্রিয়তম জ্ঞানে ভালবাসে। যাঁহারা বজ্র কিংবা বিদ্যুতের বিচ্ছুরণে বিধাতার মঙ্গলহস্ত দেখিতে পায় নাই, মেঘে তাঁহার মোহন লীলা অনুভব করেন নাই এবং ঝটিকার ভৈরবনাদে তদীয় সুমধুর মুরলী নিঃস্বরন শ্রবণ করিয়া প্রাণের টানে আকুল হন নাই, তাঁহারাই উল্লিখিত ভয়ের ধর্ম প্রচার করিয়া ধর্মজগতের আলোর উপর আঁধারের এক আবরণ দিয়াছেন। প্রকৃত পরমার্থ বিদ্যা বিশ্বের সেই প্রাণশক্তিকে ভয় করিতে বলে না। যে পারে সে কাহাকে ভক্তি করে। যদি ঈশ্বর সম্বন্ধে ভয়ের ভাব পোষণ করা মনুষ্যাত্মার বিকাশের পথে অন্তরায় হয়, তবে কি মনুষ্য মনুষ্যকে ভয় করিবে এবং মনুষ্যের ভয়ে অধির, উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠ রহিয়া লোক-রঞ্জনের জন্যে একে আর হইতে যাইবে? যাহারা মানুষ দেহ লাভ করিয়াও প্রবৃত্তির প্রবল বেগে ব্যাঘ্র, ভল্লুক অথবা বিষ সর্প প্রভৃতি জীবের ন্যায় ভয়াবহ—যাহাদিগের চক্ষের দৃষ্টি, জিহ্বার কথা এবং জীবনের

প্রত্যেক অনুষ্ঠানই জগতে কাহারও হৃদয়ে সর্পের বিষ দংশনের ন্যায় জ্বালাময় বলিয়া অনুভূত হয়, তাহাদিগের সম্বন্ধে ভয়ের ভাব এক পৃথক বিষয়। সে ভয়ের প্রকৃত নাম সাবধানতা।

লোকলজ্জা ঠিক ভয় নহে, অথচ উহাতে যেন ভয়ের ঈষৎ একটুকু ছায়া আছে। উহা মানব-হৃদয়ের এক বিচিত্র অনুভূতি। মনুষ্য গৃহ-প্রাঙ্গণ-স্থিত ভুজঙ্গের ভয়ে প্রাণ রক্ষার জন্য অস্থির অথচ ভুজঙ্গদর্শনে তাহার লজ্জা হয় না। পক্ষান্তরে সে তাহার পরিচারক ও পরিচারিকাকে গৃহ-পিঞ্জর-রুদ্ধ কপোত ও কপোতীর ন্যায়, সর্বতোভাবে তদীয় আশ্রিত, অনুগত এবং শরণাপন্ন জানিয়াও তাহাদিগকে ভয় না করিয়া লজ্জা করে; লজ্জায় অনেক সময়, তাহাদিগের কাছে জড়সড় রহে। তাই বলিয়াছি, লোক-লজ্জায় ভয়ের তেমন সম্পর্ক নাই, অথচ উহা ভয়ের মত মনুষ্যের স্ফূর্তিনাশক, চিত্তসঙ্কোচক স্বাধীন-গতির সুখ-দৃশ্য কন্টক। উহা বিনা ভয়ে ভয়। উহা কখনও মর্মদাহিনী অসহ্য বেদনা, কখনও অব্যক্ত মধুর আনন্দময় যন্ত্রণা। এইরূপ সহজ যন্ত্রণাকে প্রাচীন কবিরা হ্রী-যন্ত্রণা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে প্রায় সকল সময়েই অনুতাপের একটুকু আভাস পাওয়া যায়, অথচ সে অনুতাপে বিবেকের অংকুশতাড়না পরিলক্ষিত হয় না। সে তাপ আহত অভিমানেরই জ্বালার ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে। এই জন্যই, যে যত বেশী অভিমানী, তাহার ততবেশী লজ্জা, এবং এইজন্যই লোক-লজ্জার প্রভাব পৃথিবীতে লোক-রঞ্জন প্রবৃত্তির একটা প্রধান কারণ। উচ্চাভিমানী উন্নত পুরুষদিগের এইরূপ লজ্জার ভাব কুত্রচিত কোন সময়ে দয়ার ন্যায়ও প্রতিভাত হইয়া থকে। তাঁহারা অতি নীচাশয় এবং নিগৃহীত শত্রুর নিকটেও আপনাদিগকে ক্ষমতা প্রদর্শনে লজ্জিত হইয়া যেন লজ্জার শাসনেই তাহাদিগকে চিত্তবিনোদনে যত্নপর হইয়া থাকেন।

আমরা এখানে লোক-লজ্জার একটি মাত্র দিক প্রদর্শন করিয়াই নিবৃত্ত রহিলাম। ইহার আরও অনেক দিক আছে। লজ্জা, জীবনের অনেক কার্যেই ছায়াময়ী জীবন-সঙ্গিনীর ন্যায়, সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া, হৃদয়ের উপর প্রভুত্ব করে,—মনুষ্যকে নানা প্রকার প্রীতির শৃঙ্খলে জড়াইয়া লইয়া পরের অধীন করিয়া রাখে, এবং যাহারা সর্বতোভাবে নির্ভীকচিত্ত, উহা তাহাদিগেরও হৃদয়ের উপরে অতি কোমল স্পর্শে কার্য করিয়া,—তাঁহাদিগের কর্ণে কর্ণে অর্ধস্ফুট মৃদু মুগ্ধ স্বরে কি যেন কহিয়া পরমুখাপেক্ষিতার বিবিধ কথা শিক্ষা দিয়া থাকে।

এইরূপ লজ্জাধীন লোক-রঞ্জন সাধারণতঃ দূষ্য নহে। কারণ, লোকের সুখ শান্তি ইহার পরিণাম। ফলে, ইহার সহিত বিবেকের প্রায়শঃ কোথাও বিরোধ ঘটে না। লজ্জা তাদৃশ নির্বিরোধ স্থলে মনুষ্যত্বের অতি দুর্লভ

আভরণ,—দূষ্য হওয়া দূরে থাকুক, দেবতারও স্পৃহনীয়। উহার মনোমোহিনী কান্তি মনুষ্যের মুখচ্ছবিতে সৌন্দর্যের আভা ফলায়,—নিষ্ঠুরের নীরস দৃষ্টি লজ্জার অঞ্জন-স্পর্শে স্নিগ্ধ রহে,—নীরস জিহ্বা লজ্জায় সংসিক্ত হইয়াই মধু-সিক্ত লৌহশলাকার ন্যায় মুহূর্তকাল মধুবর্ষিণী হয়; এবং যে স্বভাব দোষে দুর্বিনীত লজ্জা তাহার চরিত্রেও বিনয় নম্রতার মত একটা ভাব সংঘটিত করায়। কৃপণ, কোন কোন স্থলে, লজ্জার শাসনে দাতা; স্বার্থপর লজ্জার শাসনে উদার, এবং পরদ্রোহী পাপিষ্ঠ লোক-সমাজের কিরূপ মঙ্গলজনক তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু যখন লজ্জা, বিবেকের পায়ে বেড়ীর মত হইয়া মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক গতিতে বিঘ্ন জন্মায়,—মনুষ্যের দয়া ধর্ম ও পরার্থপ্রিয়তার স্বাভাবিক স্ফূর্তি বিনাশ করিয়া ফেলে, এবং মনুষ্যকে মহত্ত্ব মাধুর্যের পবিত্র তীর্থ হইতে টানিয়া নামাইয়া প্রতারণার পঙ্কিল জীবনে অনুরক্ত রহিতে বাধ্য করে তখন যে উহাকে মহাপাপ বলিয়া নির্দেশ করিব সে বিষয়ে আবার বিচার বিতর্ক কি?

লোক-ভয়ের সহিত তুলনায় লোক-লজ্জা যত উচ্চ, লোক-লজ্জার সহিত তুলনায় লোক সমাজে যশস্বী হইবার কামনা ততোধিক উচ্চ। কিন্তু যশো-স্পৃহার ক্রিয়া দুই প্রকার, যাঁহারা যশের জন্য লোক-রঞ্জনে রত, তাঁহারাও এই হেতু দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

যশের পরিণাম ফল দুই;–যশোধ্বনির ক্ষণিক সুখ এবং যশোজনিত শক্তির চিরস্থায়ী শুভ-সম্পদ। যাঁহারা লোকের মুখে শুধু নিজ যশের নিত্য-নূতন মধুর কথা শুনিবার জন্যই লালায়িত রহেন, তাঁহারা নিম্নশ্রেণীর লোক। তাঁহাদিগের কথা লইয়া এখানে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহারা যে সকল যশস্কর কার্য করেন, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য আত্মসুখ। আত্মসুখের অন্বেষণ বিষয়ে পশু-পক্ষী এবং কীট-পতঙ্গও আপনা হইতেই সুশিক্ষিত। কিন্তু সংসারে যাহারা যশস্বী বলিয়া সম্মানিত তাঁহারা আর এক শ্রেণীর লোক। তাঁহাদিগের যশঃস্পৃহার প্রকৃত উদ্দেশ্য জনসাধারণের সুখসমুন্নতি,- জাতীয় সম্মানবৃদ্ধি অথবা পরের সুখ। যশ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের কাছে কিছুই নহে। কিন্তু, তাঁহারা যে সকল মহা সংকল্প লইয়া জীবন যাপন করেন, যশোজনিত শক্তি সে সকল সংকল্প সাধনে সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়। কেননা, যশ পৃথিবীর সর্বত্রই জগন্মঙ্গল্য পতিপত্তি ও ক্ষমতার প্রধান ভিত্তি।

যশস্বী গ্লাডস্টোন রাজা না হইয়াও আজি ইংলন্ডের রাজা। ইংলন্ড তাহার কথায় উত্থিত হয়; তাঁহারই ইঙ্গিতে উপবিষ্ট রহে। তিনি এই হেতু,—তাঁহার এই যশোজনিত শক্তি সামর্থ্যে ইংলন্ডের অদ্বিতীয় উপকারক। ইংলন্ডীয় দীন দুস্থ সাধারণ লোকের স্বাধিকার বৃদ্ধির জন্য একা গ্লাডস্টোন

যাহা করিতে পারিয়াছেন, ইংরেজ রাজাদিগের মধ্যে স্বপ্নেও কেহ তাহা চিন্তা করেন নাই। যশস্বী—গ্যারিবল্ডী ইটালীর কোন এক লুক্কায়িত প্রদেশে কৃষি পরিদর্শন প্রভৃতি অতি সামান্য কার্যে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত লুক্কায়িত রহিতেন, অথচ সমগ্র ইটালী, প্রাতঃসময়ে তাঁহার নাম লইয়া, উদ্দেশ্য তাঁহাকে অভিবাদন করিত এবং যেখানে সে সময়ে জনসাধারণের সুখ সম্মানের পাতাকা উড্ডীন হইল, তাঁহার প্রতাপ ও প্রভাব সেখানে সেই সময়ে, প্রাতঃসূর্যের কিরণরাশির ন্যায় ছাইয়া পড়িত। যশস্বিগণের অগ্রগণ্য বাল্মীকি ও ব্যাস, বহুযুগ হইল, জীবন-লীলা সংবরণ করিয়াছেন। কিন্তু, তাঁহাদিগের যশঃপ্রদীপ্ত অবিনশ্বর জীবন অদ্যাপি শত সহস্র কোটি মানবজীবনে প্রতিবিম্বিত ও প্রবাহিত হইতেছে এবং তাঁহাদিগের পর-প্রীণন-রত প্রমুদিত হৃদয়, অদ্যাপি প্রতিদিন ও প্রতি মুহূর্তে জগতের অসংখ্য হৃদয়ে অমৃতের ন্যায় অনুভূত হইয়া কার্য করিতেছে। যশঃস্পৃহার যে ভাব মনুষ্যকে শক্তির এইরূপ উচ্চ সম্পদ দেখাইয়া লোকানুরঞ্জনে অনুরক্ত করে, এবং কালের তরঙ্গনিঃস্বন ভেদ করিয়া কীর্তির কল-নিঃস্বন শুনাইবার আশা দেয়, যেভাবে এক যুগের জীবনকে সুদূরবর্তী যুগান্তরে ও জীব-জগতের উপকার কল্পে উচ্চক্ষমতার প্রতিশ্রুতিদানে উন্মাদিত রাখে তাহাও কি পাপ? মানব জাতির অতীত ইতিহাস এবং মনুষ্যের হৃদয় ধীরে ধীরে মৃদু মোহন স্বরে, অতি সশংক কন্ঠে উত্তর করিতেছে—না।

বস্তুতঃ, যে যশঃস্পৃহা প্রতপ্ত দিবার ন্যায় দীন-সত্ত্ব দুর্বল মনুষ্যকেও অন্ততঃ মুহূর্তকালের জন্য, অতিমানুষ বল প্রদান করে, যাহার বংশীনাদ বিনিন্দিত মনোমদ আহ্বানে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ভীরু বীরের প্রভাবে গর্জিয়া উঠে, যোদ্ধা স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণ সাধনে মৃত্যুর করাল সান্নিধ্যেও অবিচলিত পদে অগ্রসর হয়, যে যশস্পৃহা জ্ঞানের অনুসন্ধানে, এবং জাতিবিশেষের মধ্যে সেই জ্ঞান বিস্তারের জন্য, ভাষার উৎকর্ষ সাধনে উগ্র উদ্দীপনা, —পুরুষকারের প্রমত্ত লীলারঙ্গের চির প্রবর্তনা; যাহার জয়-বৈজয়ন্তী সাগর-বক্ষে ও অদ্রিশৃঙ্গে সমান দোদুল্যমান, এবং শুধু লোকের হিত সম্পাদনেই যাহার অসামান্য উত্তেজনা; সেই যশঃস্পৃহাকে ঘৃণা করা মনুষ্যের পক্ষে নিতান্তই কঠিন। কিন্তু কঠিন কথা হইলেও বলিতে হইবে যে, যশঃস্পৃহা ন্যায়পরতার ন্যায়, নির্মল নহে, নিঃস্বার্থ অনুরাগের ন্যায় সুদৃশ্য নহে, অভিমান-সম্ভবা আসক্তির ন্যায় পুরুষের প্রীতিপদ নহে, এবং মনুষ্যের ধর্ম-পথেও সকল সময়েই সম্বল নহে।

দয়া আর প্রীতিতে যে লোক-রঞ্জন, তাহা আর এক পদার্থ। তাহা মেঘাবৃত সূর্য কিংবা পুষ্পপল্লব বনপাদপের সেই এক মাধুর্যের ন্যায় অনেক সময়েই মনোহর, অনেক সময়েই প্রশংসনীয়, এবং যখন মনোহর ও প্রশংসনীয়

নহে, তখনও প্রায়শঃই সহনীয় ও ক্ষমাযোগ্য। বশিষ্ঠ কিংবা বিশ্বামিত্রের ন্যায় বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানী, সুকুমারমতি শিশুর নিকট, শিশু সাজিয়া ক্রীড়া করিতেছেন;--বনবাসী পান্ডু, তপোবনবাসী ঋষি কুমারদিগের মনোরঞ্জনের জন্য কৌমার-কোমলতায় রমণীয় হইয়া নানারূপ আমোদ করিতেছেন ঃ মেরেঙ্গো ও জীনার বিজেতা যোজিফিন ও তাহার নর্ম সহচরীদিগের নিকট মৃদু মৃদু হাসিয়া নৃত্য শিক্ষা করিতেছেন, এবং ফেনিলন কিংবা নিউটন প্রমোদ পরিহাসে পাঁচজনকে প্রফুল্ল করিবার জন্য কর ধৃত অক্ষমালা কিংবা করের লেখনী পরিত্যাগ করিতেছেন; এ সকল চিত্র সৌন্দর্যে অতুল: গৌরবেও অপ্রতিম। তোমার হৃদয় শোকদুঃখে আচ্ছন, তোমার প্রতিবেশীর গৃহে শুভকার্যের সুখ-উৎসব। তুমি যদি দয়ায় কিংবা প্রীতিতে আপনার শোকদুঃখ কিছুকাল বিস্মৃত রহিয়া তাহার সেই উৎসবে আনন্দধারা ঢালিতে পার, তাহাও সুন্দর ও মনুষ্যত্বের গৌরব বর্ধক। পিউরিটান সম্প্রদায়ের প্রবর্তকেরা যে নীতিই কেন প্রচারণা করুন,যাহার পবিত্র নাম তাহাদিগের সম্প্রদায়ের সার-সর্বস্ব, সেই তপঃ সাগরমগ্ন ধীর স্বয়ং অন্যরূপ ছিলেন। তিনি যে হাসে, তাহার সহিত হাসিতে জানিতেন, যে কাঁদে, তাহার সহিত কাঁদিতে ভালবাসিতেন; এবং পৃথিবীর পাপ, তাপ ও দুঃখ মোচনের চিন্তায় দিবারাত্রি যোগমগ্ন রহিয়াও পার্শ্বস্থ প্রিয় ব্যক্তিদিগের সামান্য হর্ষ-বিষাদের ভাবনা ভাবিতে অবসর পাইতেন। দয়ার এমনই রীতি এবং প্রীতিরও এমনই গতি।

আমেরিকার অমর গুরু প্রসিদ্ধনামা পারকার পন্ডিতের মধ্যে পন্ডিত, বীরের মধ্যে বীর, এবং পরমার্থনিষ্ঠ ভক্ত সমাজে ভক্তির অকৃত্রিম সাধক বলিয়া শ্রদ্ধা পাইতেন। তাঁহার জ্ঞান-তৃষ্ণা প্রাচীন জ্ঞানীদিগের তত্ত্ব সঞ্চয়কে বহু সংখ্যক ভাষা মুখে শোষণ করিয়াও অতৃপ্ত রহিত। ইতিহাসে ও দর্শনে এবং সুললিত সাহিত্যশাস্ত্রে তৎকালের অতি অল্প লোকই তাঁহার সমকক্ষ ছিল। তিনি কর্তব্যপরায়ণতায় পাষাণের ন্যায় কঠিন এবং পর্বতের ন্যায় অটল ছিলেন। গ্রন্থাদি লইয়া পরিশ্রমে তাঁহার এমন অভ্যাস ছিল যে, তিনি অধ্যয়নে প্রতিদিন নিয়ত অষ্টাদশ ঘটিকা নিবিষ্ট রহিলে ক্ষণমাত্র কাতরতা অনুভব করিতেন না। ইহার উপর আবার তিনি এমনই বাগ্মী, এমনই সুলেখক ছিলেন যে, তিনি যে কোন বিষয় স্পর্শ করিতেন, তাহাই তাঁহার অলৌকিক প্রতিভায় সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বলকান্তি ধারণ করিত। কিন্তু আপনাতে আপনি অবস্থান করিবার এ সকল সুখ সামগ্রী সত্ত্বেও তাঁহার দয়া আর তাঁহার প্রীতি-লোকানুরঞ্জনে ও পর-চিত্ত বিনোদনে নিরভ্র, নিদাঘের প্রভাত হাস্য ও সান্ধ্য সমীরণবৎ অনুভূত হইত; এবং যে একবারে তাঁহার সংস্পর্শে আসিত, সেই তাঁহার মধুর দৃষ্টি, মধুর ব্যবহার, মধুমাখা কথোপকথন এবং মধু হইতেও মিষ্টতর সরস-সম্ভাষণে মোহিত হইয়া, প্রথম দর্শন অবধিই আপনাকে

তাঁহার নিজ জন-জ্ঞানে, তাঁহার ছায়ায় পড়িয়া থাকিত। নগরির বালকবৃন্দ আপনাদিগের বালজন-সুলভ সুখকাহিনী তাঁহার নিকট কহিতে পারিলেই প্রীতি রহিত; সরলমতি যুবক-যুবতী মনের মর্ম-বেদনা অথবা নবোদ্গত প্রীতির নূতন আনন্দ প্রকাশ করিবার জন্য, যে যেন আর কোন স্থান না পাইয়া তাঁহার নিকটে আসিতে, এবং চিন্তার কর-রেখা-চিহ্নিত চির-জীবন-দগ্ধ বৃদ্ধও তাঁহার সন্নিহিত হইতে পারিলেই শান্তির সুখ-শীতল অমৃত-স্পর্শে ভাবনার সকল কথা ভুলিয়া যাইত। লোক-রঞ্জনের এইরূপ ক্ষমতা সামান্য বস্তু অথবা জীবনের সামান্য সৌভাগ্য নহে। আর যিনি ন্যায়ের লৌহবর্ত্ম এবং আত্মার স্বাতন্ত্র্যরূপ মহাব্রত হইতে মুহূর্তের তরেও স্খলিত না হইয়া, প্রীতি ও দয়ার মোহন প্রণোদনে এইরূপ লোক-রঞ্জন করিতে পারেন, তিনিও সামান্য ব্যক্তি নহেন; কিন্তু এই জগতে কয়জনে এইরূপ দুই কূল রক্ষায় কৃত-কার্য হয়।

লোকের প্রতি অথবা লোক-সমষ্টি স্বরূপ বিজ্ঞানারাধ্য বিরাট বিগ্রহের প্রতি হৃদগত ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার শাসনে যে লোক-রঞ্জন, তাহা পাপ কিংবা পাপের সহিত কোনরূপে সংসৃষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাহাই পুণ্যের প্রাণ। তাদৃশ লোক-পরায়ণতাকে লোক সেবাব্রত বলিলেই বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত হয়; ভক্তিতে উহাই আরম্ভ– প্রীতিপূর্ণ কৃতজ্ঞতার পরিমিশ্রণে উহার পুষ্টি এবং আরাধনার আনন্দময় গাম্ভীর্যে উহার পর্যবসান। উহাতে পূর্ণ মাত্রায় আত্মোৎসর্গ হয়, অথচ আত্মার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা অণুমাত্র বিনষ্ট কিংবা স্পৃষ্ট হয় না; এবং লোক-রঞ্জনের জন্য হিতকর ও প্রীতিকর উভয়বিধ কার্য-ই উহাতে সর্বপ্রযত্নে অনুষ্ঠিত হয়, অথচ লোক ভয় লোকলজ্জা অথবা লৌকিক যশঃস্পৃহা কিছুই অন্তঃকরণে স্থান পায় না। সার্থক তাহাদিগের জন্ম,—সার্থক তাহাদিগের জীবন, যাঁহারা লোক-রঞ্জন ব্রতে এই প্রকার উচ্চভাবে ও উচ্চ সঙ্কল্পে ব্রতী হইয়া একটা জীবনকে শত সহস্র জীবনের সুখ শান্তির জন্য আপনার ইচ্ছায় উৎসর্গ করেন। সার্থক তাঁহাদিগের শক্তি সম্পদ, যাঁহারা প্রভু হইয়াও মনুষ্যের পদতলে পড়িয়া রহিতে পারেন, এবং পদতলে পড়িয়া রহিয়াও আপনাদিগের মনুষ্যত্বকে এই প্রকারে অক্ষত রাখিতে সমর্থ হন। তাঁহারা একদিকে যেমন আত্মনির্ভরের ভাবে অত্যন্ত উচ্ছ্রিত; আর এক দিকে, প্রীতি ও ভক্তির আকর্ষণে তেমনিই অবনত। তাঁহারা এক দিকে যেমন বজ্রের ন্যায় কঠোর, আর এক দিকে তেমনিই বাসন্তী জ্যোৎস্নার ন্যায় শীতল এবং বসন্তবিলাসী বন-কুসুমের ন্যায় কোমল ও কমনীয়। তাঁহারা মনুষ্যসমাজের স্বাভাবিক প্রভু, অথচ তাঁহারাই পৃথিবীতে মনুষ্যের সুখের সামগ্রী।

তৈল

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

(১৮৫৩—১৯৩১)

তৈল যে কি পদার্থ, তাহা সংস্কৃত কবিরা কতক বুঝিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে তৈলের অপর নাম স্নেহ। বাস্তবিক স্নেহ ও তৈল একই পদার্থ। আমি তোমায় স্নেহ করি, তুমি আমায় স্নেহ কর অর্থাৎ আমরা পরস্পরকে তৈল দিয়া থাকি। স্নেহ কি? যাহা স্নিগ্ধ বা ঠাণ্ডা করে, তাহার নাম স্নেহ। তৈলের ন্যায় ঠাণ্ডা করিতে আর কিসে পারে?

সংস্কৃত কবিরা ঠিক বুঝিয়াছিলেন। যেহেতু তাঁহারা সকল মনুষ্যকেই সমানরূপে স্নেহ করিতে বা তৈল প্রদান করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

বাস্তবিকই তৈল সর্বশক্তিমান; যাহা বলের অসাধ্য, যাহা বিদ্যার অসাধ্য, যাহা ধনের অসাধ্য, যাহা কৌশলের অসাধ্য, তাহা কেবল একমাত্র তৈল দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে।

যে সর্বশক্তিময় তৈল ব্যবহার করিতে জানে, সে সর্বশক্তিমান। তাহার কাছে জগতের সকল কাজই সোজা। তাহার চাকরির জন্য ভাবিতে হয় না—উকিলীতে পসার করিবার জন্য সময় নষ্ট করিতে হয় না—বিনা কাজে বসিয়া থাকিতে হয় না, কোনো কাজেই শিক্ষানবিশ থাকিতে হয় না।

যে তৈল দিতে পারিবে, তাহার বিদ্যা না থাকিলে সে প্রফেসার হইতে পারে, আহাম্মক হইলেও ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে পারে, সাহস না থাকিলেও সেনাপতি হইতে পারে এবং দুর্লভরাম হইয়াও উড়িষ্যার গবর্ণর হইতে পারে।

তৈলের মহিমা অতি অপরূপ। তৈল নহিলে জগতে কোন কার্য সিদ্ধ হয় না। তৈল নহিলে কল চলে না, প্রদীপ জ্বলে না, ব্যঞ্জন সুস্বাদু হয় না, চেহারা খোলে না, হাজার গুণ থাকুক তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। তৈল থাকিলে তাহার কিছুই অভাব থাকে না।

সর্বশক্তিময় তৈল নানারূপে সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তৈলের যে মূর্তিতে আমরা গুরুজনকে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম ভক্তি; যাহাতে গৃহিণীকে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম প্রণয়; যাহাতে প্রতিবেশীকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম মৈত্রী; যাহা দ্বারা সমস্ত জগৎকে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম শিষ্টাচার ও সৌজন্য "ফিলনথ্রপি"। যাহা দ্বারা সাহেবকে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম লয়েলটি; যাহা দ্বারা বড়লোককে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম নম্রতা বা মডেষ্টি।

চাকর বাকর প্রভৃতিকেও আমরা তৈল দিয়া থাকি, তাহার পরিবর্তে ভক্তি বা যত্ন পাই। অনেকের নিকট তৈল দিয়া তৈল বাহির করি।

পরস্পর ঘর্ষিত হইলে সকল বস্তুতেই অগ্ন্যুদ্গম হয়। সেই অগ্ন্যুদ্গম নিবারণের একমাত্র উপায় তৈল। এই জন্যই রেলের চাকায় তৈলের অনুকল্প চর্বি দিয়া থাকে। এইজন্যই যখন দুইজনে ঘোরতর বিবাদে লংকাকান্ড উপস্থিত হয়, তখন রফা নামক তৈল আসিয়া উভয়কে ঠাণ্ডা করিয়া দেয়। তৈলের যদি অগ্নিনিবারণী শক্তি না থাকিত, তবে গৃহে গৃহে গ্রামে গ্রামে পিতা-পুত্রে, স্বামী স্ত্রীতে, রাজায়-প্রজায় বিবাদ বিসম্বাদে নিরন্তর অগ্নি-স্ফুলিংগ নির্গত হইত।

পূর্বেই বলা গিয়াছে, যে তৈল দিতে পারে, সে সর্বশক্তিমান্। কিন্তু তৈল দিলেই হয় না। দিবার পাত্র আছে, সময় আছে, কৌশল আছে।

তৈল দ্বারা অগ্নি পর্যন্ত বশতাপন্ন হয়। অগ্নিতে অল্প তৈল দিয়া সমস্ত রাত্রি ঘরে আবদ্ধ রাখা যায়। কিন্তু সে তৈল মূর্তিমান্।

কে যে তৈল দিবার পাত্র নয়, তাহা বলা যায় না। পুঁটে তেলি হইতে লাটসাহেব পর্যন্ত তৈল দিবার পাত্র। তৈল এমন জিনিস নয় যে, নষ্ট হয়। একবার দিয়া রাখিলে নিশ্চয়ই কোন না কোন ফল ফলিবে। কিন্তু তথাপি যাহার নিকট উপস্থিত কাজ আদায় করিতে হইবে, সেই তৈলনিষেকের প্রধান পাত্র।

সময়—যে সময়েই হউক, তৈল দিয়া রাখিলেই কাজ হইবে। কিন্তু উপযুক্ত সময়ে অল্প তৈলে অধিক কাজ হয়।

কৌশল—পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, যেরূপেই হউক, তৈল দিলে কিছু না কিছু উপকার হইবে, যেহেতু তৈল নষ্ট হয় না। তথাপি দিবার কৌশল আছে। তাহার প্রমাণ ভট্টাচার্যেরা সমস্ত দিন বকিয়াও যাহার নিকট পাঁচ সিকা বৈ আদায় করিতে পারিল না, একজন ইংরাজীওয়ালা তাহার নিকট অনায়াসে ৫০ টাকা বাহির করিয়া লইয়া গেল। কৌশল করিয়া এক বিন্দু দিলে যত কাজ হয়, বিনা কৌশলে কলস ঢালিলেও তত হয় না।

ব্যক্তিবিশেষে তৈলের গুণতারতম্য অনেক আছে। নিষ্কৃত্রিম তৈল পাওয়া অতিদুর্লভ। কিন্তু তৈলের এমন একটি আশ্চর্য সম্মিলনীশক্তি আছে যে, তাহাতে উহা অন্য সকল পদার্থের গুণই আত্মসাৎ করিতে পারে। যাহার বিদ্যা আছে, তাহার তৈল আমার হইতে মূল্যবান। বিদ্যার উপর যাহার বুদ্ধি আছে, তাহার আরও মূল্যবান। তাহার উপর যদি ধন থাকে, তবে তাহার প্রতি বিন্দুর মূল্য লক্ষ টাকা। কিন্তু তৈল না থাকিলে তাহার বুদ্ধি থাকুক, হাজার বিদ্যা থাকুক, হাজার ধন থাকুক, কেহই টের পায় না।

তৈল দিবার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। এ প্রবৃত্তি সকলেরই আছে এবং সুবিধামত আপন গৃহে ও আপন দলে সকলেই ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকে। কিন্তু অনেকে এত অধিক স্বার্থপর, বাহিরের লোককে তৈল দিতে পারে না। তৈল দান প্রবৃত্তি স্বাভাবিক হইলেও উহাতে কৃতকার্য হওয়া অদৃষ্ট সাপেক্ষ।

আজকাল বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি শিখাইবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা চলিতেছে। যাহাতে বঙ্গের লোক প্রাক্‌টিকাল অর্থাৎ কাজের লোক হইতে পারে, তজ্জন্য সকলেই সচেষ্ট, কিন্তু কাজের লোক হইতে হইলে তৈলদান সকলের আগে দরকার। অতএব তৈলদানের একটি স্কুলের নিতান্ত প্রয়োজন। অতএব আমরা প্রস্তাব করি, বাছিয়া বাছিয়া কোন রায়বাহাদুর অথবা খাঁ বাহাদুরকে প্রিন্সিপাল করিয়া শীঘ্র একটি স্নেহনিষেকের কালেজ খোলা হয়। অন্ততঃ উকিলি শিক্ষার নিমিত্ত ল কালেজে একজন তৈল অধ্যাপক নিযুক্ত করা আবশ্যক। কালেজ খুলিতে পারিলে ভালোই হয়।

কিন্তু এরূপ কালেজ খুলিতে হইলে প্রথমতই গোলযোগ উপস্থিত হয়। তৈল সবাই দিয়া থাকেন—কিন্তু কেহই স্বীকার করেন না যে, আমি দিই। সুতরাং এ বিদ্যার অধ্যাপক জোটা ভার। এ বিদ্যা শিখিতে হইলে দেখিয়া শুনিয়া শিখিতে হয়, রীতিমত লেকচার পাওয়া যায় না। যদিও কোন রীতিমত কালেজ নাই, তথাপি যাঁহার নিকট চাকরীর বা প্রমোশনের সুপারিশ মিলে, তাদৃশ লোকের বাড়ী সদাসর্বদা গেলে উত্তমরূপে শিক্ষা লাভ করা যাইতে পারে। বাঙ্গালীর বল নাই, বিক্রম নাই, বিদ্যাও নাই, বুদ্ধিও নাই। সুতরাং বাঙ্গালীর একমাত্র ভরসা তৈল—বাংলায় যে কেহ কিছু করিয়াছেন, সকলই তৈলের জোরে। বাঙ্গালীদিগের তৈলের মূল্য অধিক নয়; এবং কি কৌশলে সেই তৈল বিধাতৃপুরুষদিগের সুখসেব্য হয়, তাহাও অতি অল্প লোক জানে। যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া আছেন।

তৈল বিধাতৃপুরুষদিগের সুখসেব্য হইবে, ইচ্ছা করিলে সে শিক্ষা এদেশে হওয়া কঠিন। তজ্জন্য বিলাত যাওয়া আবশ্যক। তত্রত্য রমণীরা এ বিষয়ে প্রধান অধ্যাপক, তাহাদের থু, হইলে তৈল শীঘ্র কাজে আইসে।

শেষে মনে রাখা উচিত, এক তৈলে চাকাও ঘোরে আর—তৈলে মন ফেরে।

আহত উদ্ভিদ

জগদীশচন্দ্র বসু

(১৮৫৮-১৯৩৭)

পশ্চিমে কয় বৎসর যাবৎ আকাশ ধূমে আচ্ছন্ন ছিল। সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া দৃষ্টি পেঁৗছিত না। অপরিস্ফুটিত আর্তনাদ কামানের গর্জনে পরাহত। কিন্তু যে দিন হইতে শিখ ও পাঠান, গুরখা ও বাঙ্গালী সেই মহারণে জীবন আহুতি দিতে গিয়াছে, সেদিন হইতে আমাদের দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি হঠাৎ বাড়িয়া গিয়াছে।

শুভ্র তুষার-প্রান্তর যাহাদের জীবন ধারায় রক্তিম হইয়াছে তাহাদের অন্তিম বেদনা আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিতেছে। কী এই আকর্ষণ যাহা সকল ব্যবধান ঘুচাইয়া দেয়, যাহা নিকটকেও নিকটতর করে, যাহাতে পর ও আপন ভুলিয়া যায়। সমবেদনাই সেই আকর্ষণ, কেবল সহানুভূতি-শক্তিতেই আমাদের জীবনের প্রকৃত সত্য প্রতিভাত হয়। চিরসহিষ্ণু এই উদ্ভিদরাজ্য নিশ্চলভাবে আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান। উত্তাপ ও শৈত্য, আলো অন্ধকার মৃদু সমীরণ ও ঝটিকা, জীবন ও মৃত্যু ইহাদিগকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। বিবিধ শক্তি দ্বারা ইহারা আহত হইতেছে, কিন্তু আহতের কোনো ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইতেছে না। অতি সংযত মৌন ও আনন্দিত জীবনেরও যে এক মর্মভেদী ইতিহাস আছে তাহা বর্ণনা করিব।

মানুষকে আঘাত করিলে সে চীৎকার করে। তাহা হইতে মনে করি, সে বেদনা পাইয়াছে। বোবা চীৎকার করে না, কী করিয়া জানিবে সে বেদনা পাইয়াছে; ছট্‌ছট্‌ করে, তাহার হস্তপদ আকুঞ্চিত হয়; দেখিয়া মনে হয়, সেও বেদনা পাইয়াছে। সমবেদনা দ্বারা তাহার কষ্ট অনুভব করি। ব্যাঙকে আঘাত করিলে সে চীৎকার করে না, কিন্তু ছট্‌ফট্‌ করে; তবে মানুষ ও ব্যাঙে যে অনেক প্রভেদ! ব্যাঙ বেদনা পাইল কি না, একথা কেবল অন্তর্যামীই জানেন। সমবেদনা সতত ঊর্ধ্বমুখী কখনো কখনো সমতলগামী ক্বচিৎ নিম্নগামী। ইতর লোকে যে আমাদের মতো সুখ-দুঃখ-মান-অপমান বোধ করে, এ-কথা কেহ কেহ সন্দেহ করিয়া থাকেন।

ইতর জীবের তো কথাই নাই। তবে ব্যাঙ আঘাত পাইয়া যে কিছু অনুভব করে এবং সাড়া দেয়, একথা মানিয়া লইতে হইবে। অনুভব করে —এই কথা টের পায় এই অর্থে ব্যবহার করিব। মানুষ বেদনা পায়, ইতর

জীব সাড়া দেয় এই কথাতে কেহ কোনো আপত্তি করিবেন না। ব্যাঙের ছটফটানি দেখিয়া হয়ত অভ্যাস দোষে কখনো বলিয়া ফেলিতে পারি যে, সে বেদনা পাইয়াছে। এই কথাটা রূপক অর্থে লইবেন। কথা ব্যবহার সম্বন্ধে সাবধান হওয়া আবশ্যক। কারণ বিলাতে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত বলেন যে, খোলা ছাড়াইয়া জীবিত ঝিনুক অথবা অয়ষ্টারকে যখন গলাধঃকরণ করা হয় তখন ঝিনুক কোনো কষ্টই অনুভব করে না, বরঞ্চ পাকগহ্বরের উষ্ণতা অনুভব করিয়া উল্লসিত হয়। ব্যাঘ্র কবলিত হইয়া কেহ ফিরিয়া আসে নাই, সুতরাং পাকস্থলীর অন্তর্গত হইবার সুখ চিরকাল অনির্বচনীয়ই থাকিবে।

জীবনের মাপকাঠি

এখন দেখা যাউক, জীবন্ত অবস্থার কোনো মাপকাঠি আছে কি না। জীবিত ও মৃতের কি প্রভেদ? যে জীবিত তাহাকে নাড়া দিলে সাড়া দেয়। কেবল তাহাই নহে, যে অধিক জীবিত সে একই নাড়ায় অতি বৃহৎ সাড়া দেয়। যে মৃতপ্রায় সে নাড়ার উত্তরে ক্ষুদ্র সাড়া দেয়। যে মরিয়াছে সে একেবারেই সাড়া দেয় না।

সুতরাং আঘাত দিয়া জীবন্ত-ভাবের পরিমাপ করিতে পারি। যে তেজস্বী সে অল্প আঘাতেই পূর্ণ সাড়া দিবে। আর যে দুর্বল সে অনেক তাড়না পাইয়াও নিরুত্তর থাকিবে। মনে করুন, কোনো প্রকারে আমার অঙ্গুলির উপর বার বার আঘাত পড়িতেছে। আঘাত পাইয়া অঙ্গুলি আকুঞ্চিত হইতেছে এবং তজ্জন্য নড়িতেছে। অল্প আঘাতে অল্প নড়ে এবং প্রচণ্ড আঘাতে বেশী নড়ে। শুধু চক্ষে তাহার পরিমাণ প্রকৃতরূপে লক্ষিত হয় না। আকুঞ্চন মাত্রা ধরিবার কোনো প্রকার লিখিবার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। সম্মুখে যে পরীক্ষা দেখান হইয়াছে তাহা হইতে কলমের আভাস পাওয়া যাইবে। স্বল্প আঘাতের পরে স্বল্প আকুঞ্চন; কলমটা উপরের দিকে অল্প দূর উঠিয়া যায়, আকুঞ্চন রেখাও স্বল্প-আয়তনের হয়। বৃহৎ আঘাতে রেখাটা বড়ো হয়।

কেবল তাহাই নহে। আঘাতের চকিত অবস্থা হইতে আমরা পুনরায় প্রকৃতিস্থ হই, সংকুচিত অঙ্গুলি পুনরায় স্বাভাবিকরূপে প্রসারিত হয়। আঘাত দিলে সংকুচিত অঙ্গুলির টানে লিখিত লেখা হঠাৎ উপর দিকে চলিয়া যায়। প্রকৃতিস্থ হইতে কিছু সময় লাগে, উর্ধ্বোখিত রেখা ক্রমশঃ নামিয়া পূর্ব স্থানে আসে। আঘাতের বেদনা অল্প সময়েই পূর্ণ মাত্রা হইয়া থাকে; কিন্তু সেই বেদনা অন্তর্হিত হইতে সময় লাগে। সেইরূপ আকুঞ্চনের সাড়া

অল্প সময়েই হইয়া থাকে; তাহা হইতে প্রকৃতিস্থ হইবার প্রসারনরেখা অধিক সময় লয়। গুরুতর আঘাতে বৃহত্তর সাড়া পাওয়া যায়; প্রকৃতিস্থ হইতে দীর্ঘতর সময় লাগে। বেদনাও অনেক কাল স্থায়ী হয়। যদি জীবিত পেশী একই অবস্থায় থাকে এবং একইবিধ আঘাত তাহার উপর বার বার পতিত হয়, তাহা হইলে সাড়াগুলি একই রকম হয়। কিন্তু জীবিত পেশী সর্বসময়ে একই অবস্থায় থাকে না। কারণ বাহ্য জগৎ এবং বিগত ইতিহাস আমাদিগকে মুহূর্তে মুহূর্তে নূতন রূপে গড়িতেছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রকৃতি মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তিত হইতেছে। কখনো বা উৎফুল্ল, কখনো বা বিমর্ষ, কখনো বা মুমূর্ষু। এই সকল ভিতরের পরিবর্তন অনেক সময় বাহির হইতে বুঝা যায় না। যিনি দেখিতে ভালো মানুষটি তিনি হয়ত কোপনস্বভাব, অল্পতেই সপ্তমে চড়িয়া বসেন; অন্যকে কিছুতেই চেতান যায় না। ব্যক্তিগত পার্থক্য, অবস্থাগত পরিবর্তন, তদ্‌ভিন্ন জীবনের অনেক ইতিহাস ও স্মৃতি আছে যাহার ছাপ অদৃশ্য রূপেই থাকিয়া যায়। সে সকল লুপ্ত কাহিনী কি কোনোদিন ব্যক্ত হইবে? প্রথমে মনে হয়, এই চেষ্টা একেবারেই অসম্ভব। দেখা যাউক, অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে কি না। কী করিয়া লোকের স্বভাব পরখ করিবে? সাচ্চা ও ঝুটার প্রভেদ কি? টাকা পরখ করিতে হইলে বাজাইয়া লইতে হয়; আঘাতের সাড়া শব্দরূপে শুনিতে পাই। সাচ্চা ও ঝুটার সাড়া একেবারেই বিভিন্ন; একটাতে সুর আছে, অন্যটা বেসুর। মানুষের প্রকৃতিও বাজাইয়া পরখ করা যায়। অদৃষ্ট দারুণ আঘাত দিয়া মানুষকে পরীক্ষা করে; সাচ্চা ও ঝুটার পরীক্ষা কেবল তখনই হয়।

হয়ত এইরূপে জীবের প্রকৃতি ও তাহার ইতিহাস বাহির করা যাইতে পারে—আঘাত করিয়া এবং তাহার সাড়া লিপিবদ্ধ করিয়া। সাড়ালিপিত রেখা মাত্র, কোনোটা একটু বড়, কোনটা একটু ছোটো। দুইটি রেখার সামান্য বিভেদ হইতে এমন অব্যক্ত, এমন অন্তরঙ্গ, এমন রহস্যময় ইতিহাস কী রূপে ব্যক্ত হইবে? কথাটা যত অসম্ভব মনে হয়, বাস্তবিক তত নয়। গ্রহবৈগুণ্যে হয়ত আমাদিগকে কোনোদিন আসামি রূপে আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে। সেখানে আসামির বাগাড়ম্বর করিবার অধিকার নাই। কৌসুলির জেরাতে কেবল 'হাঁ' কি 'না' এইমাত্র উত্তর দিতে হইবে। অর্থাৎ কেবলমাত্র দুইপ্রকার সাড়া দিতে পারিব—শিরের ঊর্ধ্বাধ অথবা দক্ষিণ বামে আন্দোলনের দ্বারা। যদি আসামির নাকের উপর কালি মাখাইয়া সম্মুখে একখানি অতি শুভ্র ষ্ট্যাম্প-কাগজ ধরা যায় তাহা হইলে কাগজে দুই রকম সাড়া লিখিত হইবে। ইহার প্রকৃত নাকে খৎ এবং এই দুইটি রেখাময়ী সাড়া দ্বারা

স্বয়ং ধর্মাবতার বিচারপতি আমাদের সমস্ত জীবন পরীক্ষা করিবেন। সেই বিচারের ফলেই আমাদের ভবিষ্যৎ বাসস্থান নিরূপিত হইবে—কলিকাতা কিংবা আন্দামানে, ইহলোকে কিংবা পরলোকে।

এতক্ষণ মানুষের কথা বলিলাম। গাছের কথা ও তাহার গূঢ় ইতিহাসের কথা এখন বলিব। গাছের পরীক্ষা করিতে হইলে গাছকে কোন বিশেষরূপে আঘাত দ্বারা উত্তেজিত করিতে হইবে এবং তাহার উত্তরে সে যে সংকেত করিবে তাহা তাহাকে দিয়াই লিপিবদ্ধ করাইতে হইবে। সেই লিখনভঙ্গি দিয়াই তাহার বর্তমান ও অতীত ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইবে। সুতরাং এই দুরূহ প্রযত্ন সফল করিতে হইলে দেখিতে হইবে—

১. গাছ কী কী আঘাতে উত্তেজিত হয় এবং কী রূপে সে আঘাতের মাত্রা নিরূপিত হইতে পারে ?
২. আঘাত পাইয়া গাছ উত্তরে কী রূপ সংকেত করে ?
৩. কী প্রকারে সংকেত লিপিরূপে অংকিত হইতে পারে ?
৪. সেই লেখা ভঙ্গি হইতে কী করিয়া গাছের ইতিহাস উদ্ধার হইতে পারে ?
৫. গাছের হাত, অর্থাৎ ডাল কাটিলে গাছ কী ভাবে তাহা অনুভব করে ?

গাছের উত্তেজনার কথা

পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের কোনো অঙ্গে আঘাত করিলে সেখানে একটা বিকারের ভাব উৎপন্ন হয়। তদ্‌ভিন্ন আহত স্থান হইতে সেই বিকারজনিত একটা ধাক্কা স্নায়ুসূত্র দিয়া মস্তিষ্কে আঘাত করে, তাহা আমরা আঘাতের মাত্রা ও প্রকৃতিভেদে সুখ কিংবা দুঃখ বলিয়া মনে করি। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাঁধিলে যদিও নড়িবার শক্তি বন্ধ হয়, তথাপি সেই স্নায়ু সূত্র বাহিয়া যে-সংবাদ যায় তাহা বন্ধ হয় না। বৃক্ষকে তার দিয়া বৈদ্যুতিক কলের সঙ্গে সংযোগ করিলে দেখা যায় যে, গাছকে আঘাত করিবামাত্র সে একটা বৈদ্যুতিক সাড়া দিতেছে। গাছের মৃত্যুর পর আর কোন সাড়া পাওয়া যায় না। এইরূপ সকল প্রকার গাছ এবং তাহার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আঘাত অনুভব করিয়া সে সাড়া দেয় তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

কোনো কোনো গাছ আছে যাহারা নড়িয়া সাড়া দেয়, যেমন লজ্জাবতী লতা। প্রতি পত্র-মূলের নীচের দিকে উদ্ভিদ অপেক্ষাকৃত স্থূল। আমাদের উদ্ভিদ পেশীও আহত হইলে সেইরূপ সংকুচিত হয়। তাহার ফলে পাতাটা

পড়িয়া যায়। আঘাতজনিত আকস্মিক সংকোচের পরে গাছ প্রকৃতিস্থ হয় এবং পাতাটা আবার পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া উত্থিত হয়। মানুষ যেরূপ হাত নাড়িয়া সাড়া দেয়, লজ্জাবতী সেইরূপ পাতা নাড়িয়া সাড়া দেয়।

মানুষকে যে রূপে উত্তেজিত করা যায়, লজ্জাবতীকেও ঠিক সেই প্রকারে—যেমন লাঠির আঘাত দিয়া, চিমটি কাটিয়া, উত্তপ্ত লোহার ছ্যাঁকা দিয়া, অ্যাসিডে পোড়াইয়া উত্তেজিত করা যাইতে পারে। এই সকল নাড়া পাইয়া পাতা সাড়া দেয়। তবে এই সকল ভীষণ তাড়না পাতা অধিক কাল সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণ ত্যাগ করে। সুতরাং দীর্ঘকাল পরীক্ষার জন্য এমন কোনো মৃদু তাড়নার ব্যবস্থা আবশ্যক যাহাতে পাতার প্রাণনাশ না হয় এবং নাড়ার মাত্রাটা যেন ঠিক এক পরিমাণে থাকে। গাছটিকে কোনো সহজ উপায়ে নিদ্রিত অথবা নিশ্চল অবস্থা হইতে জাগাইতে হইবে। রাজকন্যা মায়াবেশে নিদ্রিত ছিলেন, সোনার কাঠি ও রূপার কাঠির স্পর্শে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সম্মুখের পরীক্ষা হইতে জানা যাইতেছে যে, সোনার কাঠি ও রূপার কাঠি স্পর্শ করা মাত্র লজ্জাবতী লতা ও নিশ্চল ব্যাঙ, পাতাও গা নাড়িয়া সাড়া দিল। ইহার কারণ এই যে, দুই বিভিন্ন ধাতুর স্পর্শ হইলেই বিদ্যুৎ-স্রোত বহিতে থাকে। এবং সেই বিদ্যুৎবলে সর্বপ্রকার উদ্ভিদ একরূপে উত্তেজিত হয়। বিদ্যুৎশক্তি দ্বারা উত্তেজিত করিবার সুবিধা এই যে, কল দ্বারা উহার শক্তি হ্রাস বৃদ্ধি করা যায়, অথবা একই প্রকার রাখা যাইতে পারে। ইচ্ছাক্রমে বিদ্যুতের আঘাত বজ্রানুরূপ ভীষণ করিয়া মুহূর্তে জীবন ধ্বংস করা যায়। এইরূপ মৃদু আঘাতে বৃক্ষের কোন অনিষ্ট হয় না।

গাছের লিপিযন্ত্র

গাছের সাড়া দিবার কথা বলিয়াছি। এখন কঠিন সমস্যা এই যে, কী করিয়া গাছের সাড়া লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে। জন্তুর সাড়া সাধারণতঃ কলম সংযোগে লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে। কিন্তু চড়ুই পাখীর লেজে কুলা বাঁধিলে তাহার উড়িবার যেরূপ সাহায্য হয়, গাছের পাতার সহিত কলম বাঁধিলে তাহার লিখিবার সাহায্যও সেইরূপ হইয়া থাকে। এমন কি বনচাড়ালের ক্ষুদ্র পত্র সুতার ভার সহ্য করিতে পারে না; সুতরাং সে যে কলম ঠেলিয়া সাড়া লিখিবে এরূপ কোন সম্ভাবনা ছিল না। এজন্য আমি অন্য উপায় গ্রহণ করিয়াছিলাম। আলো-রেখার সাহায্যে আমি বৃক্ষপত্রের বিবিধ লিপিভঙ্গি স্বহস্তে লিখিয়া লইয়াছিলাম। ইহা সম্পাদনা করিতেও বহু বৎসর লাগিয়াছিল। যখন এই সকল নূতন কথা জীবতত্ত্ববিদ্‌দিগের নিকট উপস্থিত করিলাম তখন তাঁহারা যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। পরিশেষে আমাকে জানাইলেন যে, এই সকল তত্ত্ব এরূপ অভাবনীয় যে যদি কোনদিন

বৃক্ষ স্বহস্তে লিখিয়া সাক্ষ্য দেয়, কেবল তাহা হইলেই তাঁহারা এরূপ নূতন কথা মানিয়া লইবেন।

যেদিন এই সংবাদ আসিল সেদিন সকল আলো যেন আমার চক্ষে নিবিয়া গেল। কিন্তু পূর্ব হইতেই জানিতাম—সফলতা, বিফলতারই উল্টা পিঠ। এ-কথাটা আবার নূতন করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলাম। বারো বৎসর পর শাপই বর হইল। সেই বারো বৎসরের কথা সংক্ষেপে বলিব। কলটি সম্পূর্ণ নূতন করিয়া গড়িলাম। অতি সূক্ষ্ম তার দিয়া একান্ত লঘু ওজনের কলম প্রস্তুত করিলাম। সে কলমটিও মরকত-নির্মিত জুয়েলের উপর স্থাপিত হইল, যেন পাতার একটু টানেই লেখনী সহজে ঘুরিতে পারে। এতদিন পর বৃক্ষপত্রের স্পন্দনের সহিত লেখনী স্পন্দিত হইতে লাগিল। তাহার পর লিখিবার কাগজের ঘর্ষণের বিরুদ্ধে কলম আর উঠিতে পারিল না। কাগজ ছিঁড়িয়া মসৃণ কাচের উপর প্রদীপের কৃষ্ণ কাজল লেপিলাম। কৃষ্ণ লিপিপটে শুভ্র লেখা হইল। ইহাতে ঘর্ষণের বাধাও অনেকটা কমিয়া গেল কিন্তু তাহা সত্ত্বেও গাছেরা সেই সামান্য ঘর্ষণের বাধা ঠেলিয়া কলম চালাইতে পারিলনা। ইহার পর অসম্ভবকে সম্ভব করিতে আরও ৫।৬ বৎসর লাগিল। তাহা আমার সমতাল যন্ত্রের উদ্ভাবন দ্বারা সম্ভাবিত হইয়াছে। এই সকল গঠন প্রণালী বর্ণনা করিয়া আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি করিব না। তবে ইহা বলা আবশ্যক যে, এই সকল কলের দ্বারা বৃক্ষের বহুবিধ সাড়া লিখিত হয়। বৃক্ষের বৃদ্ধি মুহূর্তে নির্ণীত হয় এবং এইরূপে পাতার স্বতঃস্পন্দন লিপিবদ্ধ হয় এবং জীবন ও মৃত্যু-রেখা তাহার আয়ু পরিমাপ করে।

গাছের লেখা হইতে তাহার ভিতরকার ইতিহাস

গাছের লিখনভঙ্গি ব্যাখ্যা অনেক সময়-সাপেক্ষ। তবে উত্তেজিত অবস্থায় সাড়া বড়ো হয়, বিমর্ষ অবস্থায় সাড়া লুপ্তপ্রায় হয়। এই যে সাড়ালিপি সম্মুখে দেখিতেছেন তাহা লিখবার সময় আকাশ ভরিয়া পূর্ণ আলো এবং বৃক্ষ উৎফুল্ল অবস্থায় ছিল। সেইজন্য সাড়াগুলির পরিমাণ কেমন বৃহৎ! দেখিতে দেখিতে সাড়ার মাত্রা কোন অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ ছোট হইয়া গেল। ইতিমধ্যে যদি কোন পরিবর্তন হইয়া থাকে তাহা আমার অনুভূতিরও অগোচরে ছিল। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, সূর্যের সম্মুখে একখানা ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড বাতাসে উড়িয়া যাইতেছে। তাহার জন্য সূর্যালোকের যে যৎকিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছিল তাহা ঘরের ভিতর হইতে কোনোরূপে বুঝিতে পারি নাই; কিন্তু গাছ টের পাইয়াছিল, সে ছোট্ট সাড়া দিয়া তাহার বিমর্ষতা জ্ঞাপন করিল। আর যেই মেঘখণ্ড চলিয়া গেল অমনি তাহা পূর্বের ন্যায়

উৎফুল্লতার সাড়া প্রদান করিল। পূর্বে বলিয়াছি যে, আমি বৈদ্যুতিক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলাম যে, সকল গাছেরই অনুভব শক্তি আছে। এই কথা পশ্চিমের বৈজ্ঞানিকেরা অনেক দিন পর্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কিয়দ্দিন হইল ফরিদপুরের খেজুর বৃক্ষ আমার কথা প্রমাণ করিয়াছে। এই গাছটি প্রত্যূষে মস্তক উত্তোলন করিত, আর সন্ধ্যার সময় মস্তক অবনত করিয়া মৃত্তিকা স্পর্শ করিত। ইহা যে গাছের বাহিরে পরিবর্তনের অনুভূতিজনিত তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। যে সকল উদাহরণ দেওয়া গেল তাহা হইতে বুঝিতে পারিবেন যে বৃক্ষ-লিখিত সাড়া দ্বারা তাহার জীবনের গুপ্ত বহু নূতন তথ্য আবিস্কার সম্ভবপর হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক সত্য ব্যতীত অনেক দার্শনিক প্রশ্নেরও মীমাংসা হইবে বলিয়া মনে হয়।

পাত্রাধার তৈল

শুনিতে পাই, কুকুরের লাংগুল আন্দোলন লইয়া দুই মতের এ পর্যন্ত মীমাংসা হয় নাই; কেহ কেহ বলিয়া থাকেন কুকুর লেজ নাড়ে; অন্য পক্ষ বলিয়া থাকেন, লেজ কুকুরকে নাড়িয়া থাকে। এইরূপ পাতা নড়ে, কি গাছ নড়ে, তৈলাধার পাত্র, কি পাত্রাধার তৈল? কে নাড়ায় আর কে সাড়া দেয়? বিলাতে আমাদের সমাজ লইয়া অনেক সমালোচনা হইয়া থাকে। এদেশে নাকি নারীজাতি নিজের ইচ্ছায় কিছু করিতে পারে না। কেবল পুরুষের ইঙ্গিতে পুতুলের ন্যায় তাঁহারা চলাফেরা করিয়া থাকেন। কে কাহার ইঙ্গিতে চলে! রাশ কাহার হাতে! কে নাড়ায়, কুকুর কিংবা তাহার লেজ? ভুক্তভোগীরা যাহা বলেন তাহা অনুরূপ। বাহিরে যতই প্রতাপ, যতই আস্ফালন, এ সকল পুতুলের নাচ মাত্র, চালাইবার সূত্র নাকি অন্তঃপুরে। এমন সময়ও আসে যখন রমণী সেই বন্ধন-রজ্জু স্বীয় হস্তেই ছেদন করেন। অঞ্চল দিয়া যাহাকে যতদিন রক্ষা করিয়াছিলেন তাহাকে আদেশ করেন—যাও তুমি দূরে, কেবল আশীর্বাদ লইয়া! তোমাকে মৃত্যুর হস্তেই বরণ করিলাম।

আঘাত করিলে লজ্জাবতীর পাতা পড়িয়া যায়। পাতা নড়ে কিংবা গাছ নড়ে, তাহা পরীক্ষা করিয়া নির্ণয় করা যাইতে পারে। প্রথম, গাছ ধরিয়া রাখিলে গাছ নড়িতে পারে না, পাতাই নড়ে। কিন্তু যদি পাতা ধরিয়া মাটি হইতে মূল উঠাইয়া লওয়া যায় তাহা হইলে দেখা যায়—আঘাতে গাছই নড়িয়া উঠে, পাতা স্থির থাকে। অঙ্গে আঘাত পাইলে সেই আঘাতের বেদনা সমস্ত শিরায় শিরায় বৃক্ষের সর্ব অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে ধাবিত হয় এবং একের আপদ অন্যে নিজের বলিয়া লয়। কারণ যদিও বৃক্ষটি শত সহস্র শাখা-প্রশাখা লইয়া গঠিত তাহা সত্ত্বেও কোনো এক গ্রন্থি ইহাদিগকে এক করিয়া বাঁধিয়াছে। কেবল

সেই একতার বন্ধনের জন্যই বাহিরের ঝটিকা ও আঘাত তুচ্ছ করিয়া বৃক্ষ তাহার শির উন্নত করিয়া রহিয়াছে।

আহতের সাড়া

এক্ষণে দেখা যাক, কী কী বিভিন্নরূপে আহত বৃক্ষ তাহার ক্লিষ্টতা বাহিরে জ্ঞাপন করে। আমি এ-সম্বন্ধে বৃক্ষের দুই প্রকার সাড়া বিবৃত করিব। প্রথমতঃ বর্ধনশীল গাছে ছুরি বসাইলে বৃদ্ধির মাত্রা বাড়ে কি কমে, সে বিষয় জ্ঞাপন করিব। দ্বিতীয়তঃ গাছের পাতা কাটিয়া ফেলিলে সেই অস্ত্রাঘাতে গাছ এবং বৃক্ষচ্যুত পাতা কিরূপ অনুভব করিবে তাহা দেখাইব।

গাছ স্বভাবতঃ কতখানি করিয়া বাড়ে তাহা জানিতে হইলে অনেক সময় লাগে। শম্বুকের গতি হইতে গাছের বৃদ্ধিগতি ছয় সহস্র গুণ ক্ষীণ; এ জন্য আমাকে এক নতুন কল আবিষ্কার করিতে হইয়াছে; তাহার নাম ক্রেস্কোগ্রাফ। তাহা দ্বারা বৃদ্ধিমাত্রা কোটি গুণ বাড়াইয়া লিপিবদ্ধ হয়। যেখানে অণুবীক্ষণ পরাস্ত, তাহার পরও ক্রেস্কো গ্রাফের কৃতিত্ব লক্ষগুণ বেশি। কোটিগুণ বৃদ্ধি আপনারা মনে ধারণা করিতে পারিবেন না; এজন্য গল্পচ্ছলে উদাহরণ দিতেছি। একবার বাঙলা—নাগপুর এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের গাড়ির দৌড় হইয়াছিল—কে আগে যাইতে পারে? এমন সময় এক শম্বুক তাহা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। অমনি সে ক্রেস্কোগ্রাফের উপর আরোহণ করিল। খানিক পরে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে পাইল, গাড়ি বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে।

ইচ্ছা ছিল, কলের নাম ক্রেস্কোগ্রাফ না রাখিয়া 'বৃদ্ধিমান' রাখি। কিন্তু হইয়া উঠিল না। আমি প্রথম প্রথম আমার নূতন কলগুলির সংস্কৃত নাম দিয়াছিলাম; যেমন কুঞ্চনমান এবং শোষণ মান। স্বদেশী প্রচার করিতে যাইয়া অতিশয় বিপন্ন হইতে হইয়াছে। প্রথমতঃ এই সকল নাম কিম্ভূতকিমাকার হইয়াছে বলিয়া বিলাতি কাগজ উপহাস করিলেন। কেবল বোষ্টনের প্রধান পত্রিকা অনেকদিন আমার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। সম্পাদক লেখেন "যে আবিস্কার করে, তাহারই নামকরণের প্রথম অধিকার। তাহার পর নূতন কলের নাম পুরাতন ভাষা ল্যাটিন ও গ্রীক হইতেই হইয়া থাকে। তাহা যদি হয় তবে অতি পুরাতন অথচ জীবন্ত সংস্কৃত হইতে কেন হইবে না?" বলপূর্বক যেন নাম চালাইলাম, কিন্তু ফল হইল অন্যরূপ। গতবারে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতার সময় তথাকার বিখ্যাত অধ্যাপক আমার কল 'কাঞ্চনম্যান' সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, শেষে বুঝিলাম 'কুঞ্চনমান' 'কাঞ্চনম্যানে' রূপান্তরিত হইয়াছে। হাণ্টার সাহেবের প্রণালী মতে কুঞ্চন বানান করিয়াছিলাম; হইয়া উঠিল কাঞ্চন।

রোমক অক্ষরমালার বিশেষ গুণ এই যে, ইহার কোন একটা স্বরকে অ হইতে ঔ পর্যন্ত যথেচ্ছরূপে উচ্চারণ করা যাইতে পারে; কেবল হয় না ঋ ও ঌ। তাহাও উপরে কিংবা নীচে দুই একটা ফোঁটা দিলে হইতে পারে।

সে যাহা হউক, বুঝিতে পারিলাম--হিরণ্যকশিপুকে দিয়া বরং হরিনাম উচ্চারণ করান যাইতে পারে, কিন্তু ইংরেজকে বাংলা কিংবা সংস্কৃত বলান একেবারেই অসম্ভব। এজন্যই আমাদের হরিকে হ্যারী হইতে হয়। এই সকল দেখিয়া কলের বৃদ্ধিমান নামকরণের ইচ্ছা একেবারে চলিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধিমান —তাহা হইতে বাবুডোয়ান হইত। তার চেয়ে আহেলা ক্রেস্কোগ্রাফই ভালো।

বাড়ন্ত গাছ প্রতি সেকেণ্ডে কতটুকু বৃদ্ধি পায় তাহা পর্যন্ত এই কল লিখিয়া দেয়। ইহাতে জানা যায় যে, এই গাছটি মিনিটে এক ইঞ্চির লক্ষ ভাগের ৪২ ভাগ করিয়া বাড়িতেছিল। গাছটিকে তখন একখানা বেত দিয়া সামান্য রকমে আঘাত করিলাম। অমনি গাছের বৃদ্ধি একেবারে কমিয়া গেল। সে আঘাত ভুলিতে গাছের আধঘন্টার অধিক সময় লাগিয়াছিল। তাহার পর অতি সন্তর্পণে সে পুনরায় বাড়িতে আরম্ভ করিল। হে বেত্রপাণি স্কুলমাস্টার, তোমার কানমলা খাইয়া কেহ কেহ যে হাইকোর্টের জজ পর্যন্ত হইয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ছেলেরা তোমার হাতে বেত খাইয়া যে হঠাৎ লম্বায় বাড়িয়া উঠিবে এ সম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহ আছে। সর্বপ্রকার আঘাতেই বৃদ্ধি কমিয়া যায়। সূচ দিয়া বিঁধিয়াছিলাম, তাহাতে গাছের বৃদ্ধি কমিয়া এক চতুর্থ হইয়া গেল। এক ঘন্টা পরেও সে-আঘাত সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই, তখনও তাহার বৃদ্ধির গতি অর্ধেকেরও অধিক লইতে পারে নাই। ছুরি দিয়া লম্বা ভাবে চিরিলে আঘাত আরও গুরুতর হয়। তাহাতে বৃদ্ধি অনেক সময় পর্যন্ত থামিয়া যায়। কিন্তু লম্বা চেরার চেয়ে এপাশ-ওপাশ করিয়া কাটা আরও নিদারুণ। কই মাছ কাটিবার সময় এই কথাটি যেন গৃহ-লক্ষ্মীরা মনে রাখেন।

আঘাতে অনুভূতি-শক্তির বিলোপ

ইহার পর লজ্জাবতী লতার পাতা কাটিলাম। তাহাতে কাটা পাতা এবং গাছের যে সকল পাতা ছিল সমস্তগুলি মুচড়াইয়া পড়িয়া গেল। ইহার পর দেখিতে হইবে, কাটা পাতা ও আহত বৃক্ষের অবস্থা কী রূপ হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, ৩।৪ ঘন্টা পর্যন্ত উভয়েই অচেতন। তাহার পরের ইতিহাস বড়োই অদ্ভুত। কাটা পাতাটিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য সুখাদ্য রস পান করিতে দিয়াছিলাম। ইহাতে পাতাটা চারি ঘন্টার পর মাথা তুলিয়া উঠিল ও বড়ো রকমের সাড়া দিল। ভাবটা এই—কী হইয়াছে·

ভালোই হইয়াছে; গাছটার সঙ্গে এতদিন বাঁধা ছিলাম, এখন শরীরটা কেমন লঘু লাগে এইরূপে পাতাটা জেদের সহিত বারংবার সাড়া দিতে লাগিল। এই ভাবটা সমস্ত দিন ছিল। তাহার পরদিন কী যে হইল জানি না; সাড়া একেবারেই কমিয়া গেল। তার পরই মৃত্যু!

যাহার পাতা কাটা হইয়াছিল সেই গাছটার ইতিহাস অন্যরূপ। সে ধীরে ধীরে সারিয়া উঠিল; 'কুছপরোয়া নাই' ভাবটা তাহার একেবারেই ছিল না। যাহা আছে তাহা লইয়াই তাহাকে থাকিতে হইবে। ধীরে ধীরে আহত বৃক্ষ তাহার বেদনা সামলাইয়া লইল। যে সাময়িক দুর্বলতা আসিয়াছিল তাহা ঝাড়িয়া ফেলিল এবং পূর্বের ন্যায় সাড়া দিতে সক্ষম হইল।

জন্মভূমি

কেন তবে এই বিভিন্নতা? কী কারণে ছিন্নশাখ-বৃক্ষ আহত ও মুমূর্ষু হইয়াও কিয়দ্দিন পর বাঁচিয়া উঠে, আর বিচ্যুতপত্র নানা ভোগে লালিত হইয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হয়? ইহার কারণ এই যে, বৃক্ষের মূল একটা নির্দিষ্ট ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত, যে-স্থানের রস দ্বারা তাহার জীবন সংগঠিত হইতেছে সেই ভূমিই তাহার স্বদেশ ও তাহার পরিপোষক।

বৃক্ষের ভিতরেও আর একটি শক্তি নিহিত আছে যাহা দ্বারা যুগে যুগে সে আপনাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিয়াছে। বাহিরে কত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু অদৃষ্ট বৈগুণ্যে সে পরাহত হয় নাই। বাহিরের আঘাতের উত্তরে পূর্ণ জীবন দ্বারা সে বাহিরের পরিবর্তনের সহিত যুঝিয়াছে। যে পরিবর্তন আবশ্যক সে তাহা গ্রহণ করিয়াছে; যাহা অনাবশ্যক, জীর্ণপত্রের ন্যায় সে তাহা ত্যাগ করিয়াছে। এইরূপে বাহিরের বিভীষিকা সে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

আরও একটি শক্তি তাহার চিরসম্বল রহিয়াছে। সে যে বটবৃক্ষের বীজ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এই স্মৃতির ছাপ তাহার প্রতি অঙ্গে রহিয়াছে। এই জন্য তাহার মূল ভূমিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, তাহার শির ঊর্ধ্বে আলোকের সন্ধানে উন্নত এবং শাখা-প্রশাখা ছায়াদানে চতুর্দিকে প্রসারিত। তবে কী কী শক্তি বলে সে আহত হইয়াও বাঁচিয়া থাকে? ধৈর্য ও দৃঢ়তায় সে তাহার স্বস্থান দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া থাকে, অনুভূতিতে সে ভিতরের ও বাহিরের সামঞ্জস্য করিয়া লয়, স্মৃতিতে বহুজীবনের সঞ্চিত শক্তি নিজস্ব করিয়া লয়। আর যে-হতভাগ্য আপনাকে স্বস্থান ও স্বদেশ হইতে বিচ্যুত করে, যে-পর-অন্নে পালিত হয়, যে জাতীয় স্মৃতি ভুলিয়া যায়, সে-হতভাগ্য কী শক্তি লইয়া বাঁচিয়া থাকিবে? বিনাশ তাহার সম্মুখে, ধ্বংসই তাহার পরিণাম।

শ্রাবণসন্ধ্যা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮৬১-১৯৪১)

আজ শ্রাবণের অশান্ত ধারাবর্ষণে জগতে আর-যত-কিছু কথা আছে, সমস্তকেই ডুবিয়ে দিয়েছে। মাঠের মধ্যে অন্ধকার আজ নিবিড়—এবং যে কখনো একটি কথা কইতে জানে না, সেই মূক আজ কথায় ভরে উঠেছে।

অন্ধকারকে ঠিক মতো তার উপযুক্ত ভাষায় যদি কেউ কথা কওয়াতে পারে, তবে সে এই শ্রাবণের ধারাপতনধ্বনি। অন্ধকারের নিঃশব্দতার উপরে এই ঝর্-ঝর্ কলশব্দ যেন পর্দার উপরে পর্দা টেনে দেয়, তাকে আরো গভীর করে ঘনিয়ে তোলে, বিশ্বজগতের নিদ্রাকে নিবিড় করে আনে। বৃষ্টি-পতনের এই অবিরাম শব্দ, এ যেন শব্দের অন্ধকার।

আজ এই কর্মহীন সন্ধ্যাবেলাকার অন্ধকার তার সেই জপের মন্ত্রটিকে খুঁজে পেয়েছে। বারবার তাকে ধ্বনিত করে তুলেছে—শিশু তার নূতন শেখা কথাটিকে নিয়ে যেমন অকারণে অপ্রয়োজনে ফিরে ফিরে উচ্চারণ করতে থাকে সেই রকম—তার শান্তি নেই, শেষ নেই তার আর বৈচিত্র নেই।

আজ বোবা সন্ধ্যাপ্রকৃতির এই—যে হঠাৎ কন্ঠ খুলে গিয়েছে এবং আশ্চর্য হয়ে স্তব্ধ হয়ে সে যেন ক্রমাগত নিজের কথা নিজের কানেই শুনছে, আমাদের মনেও এর একটা সাড়া জেগে উঠেছে—সেও কিছু একটা বলতে চাচ্ছে।—ওই-রকম খুব বড় করেই বলতে চায়, ওই-রকম জলস্থল আকাশ একেবারে ভরে দিয়েই বলতে চায়,—কিন্তু সে তো কথা দিয়ে হবার জো নেই, তাই সে একটা সুরকে খুঁজছে। জলের কল্লোলে, বনের মর্মরে, বসন্তের উচ্ছ্বাসে, শরতের আলোকে, বিশাল প্রকৃতির যা-কিছু কথা সে তো স্পষ্ট কথায় নয়—সে কেবল আভাসে ইঙ্গিতে, কেবল ছবিতে গানে। এইজন্য প্রকৃতি যখন আলাপ করতে থাকে, তখন সে আমাদের মুখের কথাকে, নিরস্ত করে দেয়, আমাদের প্রাণের ভিতরে অনির্বচনীয়ের আভাসে ভরা গানকেই জাগিয়ে তোলে।

কথা জিনিসটা মানুষেরই, আর গানটা প্রকৃতির। কথা সুস্পষ্ট এবং বিশেষ প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ, আর গান অস্পষ্ট এবং সীমাহীনের ব্যাকুলতায় উৎকন্ঠিত। সেইজন্যে কথায় মানুষ মনুষ্যলোকের এবং গানে মানুষ বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে মেলে। এইজন্যে কথার সঙ্গে মানুষ যখন সুরকে জুড়ে দেয়,

তখন সেই কথা আপনার অর্থকে আপনি ছাড়িয়ে গিয়ে ব্যাপ্ত হয়ে যায়—সেই সুরে মানুষের সুখদুঃখকে সমস্ত আকাশের জিনিস করে তোলে, তার বেদনা প্রভাতসন্ধ্যার দিগন্তে আপনার রঙ মিলিয়ে দেয়, জগতের বিরাট অব্যক্তের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি বৃহৎ অপরূপতা লাভ করে, মানুষের সংসারের প্রাত্যহিক সুপরিচিত সংকীর্ণতার সঙ্গে তার ঐকান্তিক ঐক্য আর থাকে না।

তাই নিজের প্রতিদিনের ভাষার সঙ্গে প্রকৃতির চির দিনের ভাষাকে মিলিয়ে নেবার জন্যে মানুষের মন প্রথম থেকেই চেষ্টা করছে। প্রকৃতি হতে রঙ্ এবং রেখা নিয়ে নিজের চিন্তাকে মানুষ ছবি করে তুলছে, প্রকৃতি হতে সুর এবং ছন্দ নিয়ে নিজের ভাবকে মানুষ কাব্য করে তুলছে। এই উপায়ে চিন্তা অচিন্তনীয়ের দিকে ধাবিত হয়, ভাব অভাবনীয়ের মধ্যে এসে প্রবেশ করে। এই উপায়ে মানুষের মনের জিনিসগুলি বিশেষ প্রয়োজনের সংকোচ এবং নিত্যব্যবহারের মলিনতা ঘুচিয়ে দিয়ে চিরন্তনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এমন সরস নবীন এবং মহৎ মূর্তিতে দেখা দেয়।

আজ এই ঘনবর্ষার সন্ধ্যায় প্রকৃতির শ্রাবণ-অন্ধকারের ভাষা আমাদের ভাষার সঙ্গে মিলতে চাচ্ছে। অব্যক্ত আজ ব্যক্তের সঙ্গে লীলা করবে বলে আমাদের দ্বারে এসে আঘাত করছে। আজ যুক্তি তর্ক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ খাটবে না। আজ গান ছাড়া আর কোনো কথা নেই।

তাই আমি বলছি, আমার কথা আজ থাক। সংসারের কাজকর্মের সীমাকে, মনুষ্যলোকালয়ের বেড়াকে একটুখানি সরিয়ে দাও, আজ এই আকাশভরা শ্রাবণের ধারাবর্ষণকে অবারিত অন্তরের মধ্যে আহবান করে নেও।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধটি বড়ো বিচিত্র। বাহিরে তার কর্মক্ষেত্রে প্রকৃতি এক-রকমের, আবার আমাদের অন্তরের মধ্যে তার আর এক মূর্তি।

একটা দৃষ্টান্তে দেখো—গাছের ফুল। তাকে দেখতে যতই সৌখিন হ'ক, সে নিতান্তই কাজের দায়ে এসেছে। তার সাজসজ্জা সমস্তই আপিসের সাজ। যেমন করে হ'ক, তাকে ফল ফলাতেই হবে, নইলে তরুবংশ পৃথিবীতে টিকবে না, সমস্ত মরুভূমি হয়ে যাবে। এইজন্যেই তার রঙ এই জন্যেই তার গন্ধ। মৌমাছির পদরেণুপাতে যেমন তার পুষ্পজন্ম সফলতালাভের উপক্রম করে, অমনি সে আপনার রঙিন পাতা খসিয়ে ফেলে, আপনার মধুগন্ধ নির্মমভাবে বিসর্জন দেয়; তার সৌখিনতার সময়মাত্র নেই, সে অত্যন্ত ব্যস্ত। প্রকৃতির বাহিরবাড়িতে কাজের কথা ছাড়া আর অন্য কথা নেই। সেখানে কুঁড়ি ফুলের দিকে, ফুল ফলের দিকে, ফল বীজের দিকে, বীজ গাছের দিকে হন্‌হন্ করে ছুটে চলেছে,—যেখানে একটু বাধা পায় সেখানে আর মাপ নেই, সেখানে কোন

কৈফিয়ৎ কেউ গ্রাহ্য করে না, সেখানেই তার কপালে ছাপ পড়ে যায় 'নামঞ্জুর', তখনি বিনা বিলম্বে খসে ঝরে শুকিয়ে সরে পড়তে হয়। প্রকৃতির প্রকাণ্ড আপিসে অগণ্য বিভাগ, অসংখ্য কাজ। সুকুমার এই ফুলটিকে যে দেখছ, অত্যন্ত বাবুর মত গায়ে গন্ধ মেখে রঙিন পোষাক পরে এসেছে, সেও সেখানে রৌদ্রে জলে মজুরি করবার জন্যে এসেছে, তাকে তার প্রতি মুহূর্তের হিসাব দিতে হয়, বিনা কারণে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে যে একটু দোলা খাবে এমন এক পলকও তার সময় নেই।

কিন্তু এই ফুলটিই মানুষের অন্তরের মধ্যে যখন প্রবেশ করে, তখন তার কিছুমাত্র তাড়া নেই, তখন সে পরিপূর্ণ অবকাশ মূর্তিমান। এই একই জিনিস বাইরে প্রকৃতির মধ্যে কাজের অবতার, মানুষের অন্তরের মধ্যে শান্তি ও সৌন্দর্যের পূর্ণ প্রকাশ।

তখন বিজ্ঞান আমাদের বলে, 'তুমি ভুল বুঝছ—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ফুলের একমাত্র উদ্দেশ্য কাজ করা; তার সঙ্গে সৌন্দর্য মাধুর্যের যে অহেতুক সম্বন্ধ তুমি পাতিয়ে বসেছ, সে তোমার নিজের পাতানো।'

আমাদের হৃদয় উত্তর করে, 'কিছুমাত্র ভুল বুঝি নি। ওই ফুলটি কাজের পরিচয় পত্র নিয়ে প্রকৃতির-মধ্যে প্রবেশ করে, আর সৌন্দর্যের পরিচয়পত্র নিয়ে আমার দ্বারে এসে আঘাত করে—একদিকে আসে বন্দীর মতো, আর—একদিকে আসে মুক্তস্বরূপে—এর একটা পরিচয় যে সত্য আর অন্যটা সত্য নয়,—এ-কথা কেমন করে মানব। ওই ফুলটি গাছপালার মধ্যে অনবচ্ছিন্ন কার্যকারণসূত্রে ফুটে উঠেছে, এ-কথাটাও সত্য কিন্তু সে তো বাহিরের সত্য—আর অন্তরের সত্য হচ্ছে, আনন্দাদ্ধ্যেব খলিবমানি ভূতানি জায়ন্তে।'

ফুল মধুকরকে বলে 'তোমার ও আমার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তোমাকে আহ্বান করে আনব বলে আমি তোমার জন্যেই সেজেছি'—আবার মানুষের মনকে বলে, 'আনন্দের ক্ষেত্রে তোমাকে আহ্বান করে আনব বলে আমি তোমার জন্যেই সেজেছি।' মধুকর ফুলের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রে কিছু-মাত্র ঠকেনি, আর মানুষের মনও যখন বিশ্বাস ক'রে তাকে ধরা দেয় তখন দেখতে পায় ফুল তাকে মিথ্যা বলে নি।

ফুল যে কেবল বনের মধ্যেই কাজ করছে তা নয়—মানুষের মনের মধ্যেও তার যেটুকু কাজ, সে বরাবর করে আসছে।

আমাদের কাছে তার কাজটা কী। প্রকৃতির দরজায় যে-ফুলকে যথাঋতুতে যথাসময়ে মজুরের মতো হাজির দিতে হয়, আমাদের হৃদয়ের দ্বারে সে রাজ-দূতের মতো উপস্থিত হয়ে থাকে।

সীতা যখন রাবনের ঘরে একা বসে কাঁদছিলেন তখন একদিন যে-দূত তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিল, যে রামচন্দ্রের আংটি সঙ্গে করে এনেছিল; এই আংটি দেখেই সীতা তখনি বুঝতে পেরেছিলেন, এই দূতই তাঁর প্রিয়তমের কাছ থেকে এসেছে, তখনি তিনি বুঝলেন, রামচন্দ্র তাঁকে ভোলেন নি, তাঁকে উদ্ধার করে নেবেন বলেই তাঁর কাছে এসেছেন।

ফুলও আমাদের কাছে সেই প্রিয়তমের দূত হয়ে আসে। সংসারের সোনার লঙ্কায় রাজভোগের মধ্যে আমরা নির্বাসিত হয়ে আছি, রাক্ষস আমাদের কেবলি বলছে, 'আমিই তোমার পতি, আমাকেই ভজনা করো।'

কিন্তু সংসারের পারের খবর নিয়ে আসে ওই ফুল। সে চুপিচুপি আমাদের কানে এসে বলে, 'আমি এসেছি, আমাকে তিনি পাঠিয়েছেন। আমি সেই সুন্দরের দূত আমি সেই আনন্দময়ের খবর নিয়ে এসেছি। এই বিচ্ছিন্নতার দ্বীপের সঙ্গে তাঁর সেতু বাঁধা হয়ে গেছে। তিনি তোমাকে এক মুহূর্তের জন্যে ভোলেন নি, তিনি তোমাকে উদ্ধার করবেন। তিনি তোমাকে টেনে নিয়ে আপন করে নেবেন। মোহ তোমাকে এমন করে চিরদিন বেঁধে রাখতে পারবেনা।'

যদি তখন আমরা জেগে থাকি তো তাকে বলি, 'তুমি যে তাঁর দূত তা আমরা জানব কী করে।' 'সে বলে, এই দেখো আমি সেই সুন্দরের আংটি নিয়ে এসেছি। এর কেমন রঙ, কমন শোভা।'

তাই তো বটে। এ-যে তাঁরি আংটি। মিলনের আংটি। আর-সমস্ত ভুলিয়ে তখনি সেই আনন্দময়ের আনন্দস্পর্শ আমাদের চিত্তকে ব্যাকুল করে তোলে। তখনই আমরা বুঝতে পারি, এই সোনার লঙ্কাপুরীই আমার সব নয়—এর বাইরে আমার মুক্তি আছে-সেইখানে আমার প্রেমের সাফল্য আমার জীবনের চরিতার্থতা।

প্রকৃতির মধ্যে মধুকরের কাছে যা কেবলমাত্র রঙ, কেবল মাত্র গন্ধ, কেবল মাত্র ক্ষুধানিবৃত্তির পথ চেনবার উপায়চিহ্ন, মানুষের হৃদয়ের কাছে তাই সৌন্দর্য, তাই বিনা-প্রয়োজনের আনন্দ। মানুষের মনের মধ্যে সে রঙিন কালিতে লেখা প্রেমের চিঠি নিয়ে আসে।

তাই বলছিলুম, বাইরে প্রকৃতি যতই ভয়ানক ব্যস্ত, যতই একান্ত কেজো হ'ক-না, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তার একটি বিনা কাজের যাতায়াত আছে। সেখানে তার কামারশালার আগুন আমাদের উৎসবের দীপমালা হয়ে দেখা দেয়, তার কারখানাঘরের কলশব্দ সংগীত হয়ে ধ্বনিত হয়। বাইরে প্রকৃতির

কার্যকারণের লোহার শৃঙ্খল ঝম্‌ঝম্‌ করে অন্তরে তার আনন্দের অহেতুকতা সোনার তারে বীণাধ্বনি বাজিয়ে তোলে।

আমার কাছে এইটেই বড়ো আশ্চর্য ঠেকে—একই কালে প্রকৃতির এই দুই চেহারা, বন্ধনের এবং মুক্তির—একই-রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের মধ্যে এই দুই সুর. প্রয়োজনের এবং আনন্দের বাহিরের দিকে তার চঞ্চলতা, অন্তরের দিকে তার শান্তি—একই সময়ে একদিকে তার কর্ম আর একদিকে তার ছুটি; বাইরের দিকে তার তট, অন্তরের দিকে তার সমুদ্র।

এই-যে এই মুহূর্তেই শ্রাবণের ধারপতনে সন্ধ্যার আকাশ মুখরিত হয়ে উঠেছে, এ আমাদের কাছে তার সমস্ত কাজের কথা গোপন করে গেছে। প্রত্যেক ঘাসটির এবং গাছের প্রত্যেক পাতাটির অন্নপানের ব্যবস্থা করে দেবার জন্য সে যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে আছে, এই অন্ধকার সভায় আমাদের কাছে এ কথাটির কোন আভাসমাত্র সে দিচ্ছে না। আমাদের অন্তরের সন্ধ্যাকাশেও এই শ্রাবণ অত্যন্ত ঘন হয়ে নেমেছে কিন্তু সেখানে তার আপিসের রেশ নেই সেখানে কেবল গানের আসর জমাতে, কেবল লীলার আয়োজন করতে তার আগমন। সেখানে সে কবির দরবারে উপস্থিত। তাই ক্ষণে ক্ষণে মেঘমল্লারের সুরে কেবলই করুণ গান জেগে উঠেছে-

তিমির দিগ-ভরি ঘোর যামিনী,
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া,
বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙায়বি
হরি বিনে দিনরাতিয়া।

প্রহরের পর প্রহর ধরে এই বার্তাই সে জানাচ্ছে, 'ওরে, তুই-যে বিরহিনী—তুই বেঁচে আছিস কি করে, তোর দিনরাত্রি কেমন করে কাটছে।'

সেই চিরদিনরাত্রির হরিকেই চাই নইলে দিন রাত্রি অনাথ। সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে তুলে এই কথাটা আজ আর নিঃশেষ হতে চাচ্ছে না।

আমরা যে তাঁরি বিরহে এমন করে কাটাচ্ছি এ খবরটা আমাদের নিতান্তই জানা চাই। কেননা বিরহ মিলনেরই অঙ্গ। ধোঁয়া যেমন আগুন জ্বালার আরম্ভ, বিরহও তেমনই মিলনের আরম্ভ-উচ্ছ্বাস।

খবর আমাদের দেয় কে। ওই-যে তোমার বিজ্ঞান যাদের মনে করছ. তারা প্রকৃতির কারাগারের কয়েদী, তারা পায়ে শিকল দিয়ে একজনের সঙ্গে আর একজন বাঁধা থেকে দিনরাত্রি কেবল বোবার মত কাজ করে যাচ্ছে—তারাই। যেই তাদের শিকলের শব্দ আমাদের হৃদয়ের ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করে অমনি দেখতে পাই, এ-যে বিরহের বেদনাগান, এ-যে মিলনের আহ্বান সঙ্গীত।

যে-সব খবরকে কোন ভাষা দিয়ে বলা যায় না, সে-সব খবরকে এরাই তো চুপিচুপি বলে যায়—এবং মানুষ কবি সেই-সব খবরকেই গানের মধ্যে কতকটা কথায়, কতকটা সুরে, বেঁধে গাইতে থাকে ঃ

ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর!

আজ কেবলই মনে হচ্ছে এই যে-বর্ষা, এ তো এক সন্ধ্যার বর্ষা নয়, এ যেন আমার সমস্ত জীবনের অবিরল শ্রাবণধারা। যতদূর চেয়ে দেখি, আমার সমস্ত জীবনের উপরে সঙ্গিহীন বিরহসন্ধ্যার নিবিড় অন্ধকার—তারি দিগদিগন্তকে ঘিরেঅশ্রান্ত শ্রাবণের বর্ষণে প্রহরের পর প্রহর কেটে যাচ্ছে; আমার সমস্ত আকাশ ঝর্ ঝর্ করে বলছে, 'কৈসে গোঙায়বি হরি বিনে দিনরাতিয়া।' কিন্তু তবু এই বেদনা, এই রোদন, এ বিরহ একেবারে শূন্য নয়;—এই অন্ধকারের, এই শ্রাবণের বুকের মধ্যে একটি নিবিড় রস অত্যন্ত গোপনে ভরা রয়েছে, একটি কোন্ বিকশিত বনের সজল গন্ধ আসছে, এমন একটি অনির্বচনীয় মাধুর্য—যা যখনি প্রাণকে ব্যথায় কাঁদিয়ে তুলছে, তখনই সেই বিদীর্ণ ব্যথার ভিতর থেকে অশ্রুসিক্ত আনন্দকে টেনে বের করে নিয়ে আসছে।

বিরহ সন্ধ্যার অন্ধকারকে যদি শুধু এই বলে কাঁদতে হয় যে, 'কেমন করে তোর দিনরাত্রি কাটবে', তা-হলে সমস্ত রস শুকিয়ে যেত এবং আশার অংকুর পর্যন্ত বাঁচত না,—কিন্তু শুধু কেমন করে কাটবে নয় তো, কেমন করে কাটবে হরি বিনে দিনরাতিয়া—সেই জন্যে ঐ 'হরি বিনে' কথাটাকে ঘিরে ঘিরে এত অবিরল অজস্র বর্ষণ। চিরদিনরাত্রি যাকে নিয়ে কেটে যাবে, এমন একটি চিরজীবনের ধন কেউ আছে—তাকে না পেয়েছি নাই পেয়েছি, তবু সে আছে, সে আছে—বিরহের সমস্ত বক্ষ ভরে দিয়ে সে আছে—সেই হরি বিনে কৈসে গোঙায়বি দিনরাতিয়া। এই জীবনব্যাপী বিরহের যেখানে আরম্ভ সেখানে যিনি, যেখানে অবসান সেখানে যিনি, এবং তারি মাঝখানে গভীরভাবে প্রচ্ছন্ন থেকে যিনি করুণ সুরের বাঁশি বাজাচ্ছেন সেই হরি বিনে কৈসে গোঙায়বি দিনরাতিয়া।

বাংলা-ভাষা পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এতকাল আমাদের যে বাঙালী বলা হয়েছে তার সংজ্ঞা হচ্ছে আমরা বাংলা বলে থাকি। শাসনকর্তারা বাংলা প্রদেশের অংশ-প্রত্যংশ অন্য প্রদেশে জুড়ে দিয়েছেন, কিন্তু সরকারী দফতরের কাঁচিতে তার ভাষাটাকে ছেঁটে ফেলতে পারেননি।

ইতিমধ্যে স্বাদেশিক ঐক্যের মাহাত্ম্য আমরা ইংরেজের কাছে শিখেছি; জেনেছি এর শক্তি, এর গৌরব। দেখেছি এই সম্পর্কে এদের প্রেম আত্মত্যাগ জনহিতব্রত। ইংরেজের এই দৃষ্টান্ত আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেছে, অধিকার করেছে আমাদের সাহিত্যকে। আজ আমরা দেশের নামে গৌরব স্থাপন করতে চাই মানুষের ইতিহাসে।

এই-যে আমাদের দেশ আমাদের মনকে টানছে, এর সঙ্গে সঙ্গেই জেগেছে আমাদের ভাষার প্রতি টান। মাতৃভাষা নামটা আজকাল আমরা ব্যবহার করে থাকি, এ নামও পেয়েছি আমাদের নতুন শিক্ষা থেকে। ইংরেজীতে আপন ভাষাকে বলে মাদার টাঙ্গ, মাতৃভাষা তারই তর্জমা। এমন দিন ছিল যখন বাঙালী বিদেশে গিয়ে আপন ভাষাকে অনায়াসেই পুরানো কাপড়ের মতো ছেড়ে ফেলতে পারত; বিলেতে গিয়ে ভাষাকে সে দিয়ে আসত সমুদ্রে জলাঞ্জলি, ইংরেজভাষিণী অনুচরীদের সঙ্গে রেখে ছেলেমেয়েদের মুখে বাংলা চাপা দিয়ে তার উপরে ইংরেজির জয়পতাকা দিত সগর্বে উড়িয়ে। আজ আমাদের ভাষা এই অপমান থেকে উদ্ধার পেয়েছে, তার গৌরব আজ সমস্ত বাংলাভাষীকে মাহাত্ম্য দিয়েছে। বৎসরে বৎসরে জেলায় জেলায় সাহিত্য-সম্মেলন বাঙালির একটা পার্বণ হয়ে দাঁড়িয়েছে; একে নিয়ে তাকে চেতিয়ে তুলতে হয়নি; হয়েছে স্বভাবতই।

বাংলাভাষা ভারতবর্ষের প্রায় পাঁচ কোটি লোকের ভাষা। হিন্দি বা হিন্দুস্থানী যাদের যথার্থ ঘরের ভাষা, শিক্ষা করা ভাষা নয়, সুনীতিকুমার দেখিয়েছেন, তাদের সংখ্যা চার কোটি বারো লক্ষের কাছাকাছি। এর উপরে আসে আট কোটি আটাশি লক্ষ লোক যারা তাদের খাঁটি মাতৃভাষা বর্জন করে সাহিত্যের সভা-সমিতিতে স্কুলে আদালতে হিন্দুস্থানির শরণাপন্ন হয়। তাই হিন্দুস্থানিকে ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যবহারের জন্যে এক ভাষা বলে গণ্য করা যেতে পারে; তার মানে, বিশেষ প্রয়োজনে কোন বিশেষ ভাষাকে কৃত্রিম

উপায়ে স্বীকার করা চলে, যেমন আমরা ইংরেজী ভাষাকে স্বীকার করেছি। কিন্তু ভাষার একটা অকৃত্রিম প্রয়োজন আছে; সে প্রয়োজন কোন কাজ চালাবার জন্য নয়, আত্মপ্রকাশের জন্যে।

রাষ্ট্রিক কাজের সুবিধা করা চাই বই-কি, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কাজ দেশের চিত্তকে সরস সফল ও সমুজ্জ্বল করা। সে কাজ আপন ভাষা নইলে হয় না। দেউড়িতে একটা সরকারী প্রদীপ জ্বালানো চলে, কিন্তু একমাত্র তারই তৈল জোগাবার খাতিরে ঘরে ঘরে প্রদীপ নেবানো চলে না।

এই প্রসঙ্গে য়ুরোপের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক; সেখানে দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, অথচ এক সংস্কৃতির ঐক্য সমস্ত মহাদেশে। সেখানে বৈষয়িক অনৈক্যে যারা হানাহানি করে এক সংস্কৃতির ঐক্যে তারা মনের সম্পদ নিয়তই অদল বদল করছে। ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ধারায় বয়ে নিয়ে আসা পণ্যে সমৃদ্ধশালী য়ুরোপীয় চিত্ত জয়ী হয়েছে সমস্ত পৃথিবীতে।

তেমনি ভারতবর্ষেও ভিন্ন ভিন্ন ভাষার উৎকর্ষ সাধনে দ্বিধা করলে চলবে না। মধ্যযুগে য়ুরোপের সংস্কৃতির এক ভাষা ছিল ল্যাটিন। সেই ঐক্যের বেড়া ভেদ করেই য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা যেদিন আপন শক্তি নিয়ে প্রকাশ পেলে সেইদিন য়ুরোপের বড়ো দিন। আমাদের দেশেও সেই বড়ো দিনের অপেক্ষা করব—সব ভাষা একাকার করার দ্বারা নয়, সব ভাষার আপন আপন বিশেষ পরিণতির দ্বারা।

বাংলা ভাষাকে চিনতে হবে ভালো করে; কোথায় তার শক্তি কোথায় তার দুর্বলতা, দুই'ই আমাদের জানা চাই।

রূপকথায় বলে, এক যে ছিল রাজা, তার ছিল দুই রাণী, সুয়োরাণী আর দুয়োরাণী; তেমনি বাংলাবাক্যাধীশেরও আছে দুই রাণী—একটাকে আদর করে নাম দেওয়া হয়েছে সাধুভাষা; আর একটাকে কথ্য ভাষা, কেউ বলে চলতি ভাষা, আমার কোন কোন লেখায় আমি বলেছি প্রাকৃত বাংলা। সাধুভাষা মাজাঘসা, সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান থেকে ধার করা অলংকারে সাজিয়ে তোলা। চলতি ভাষার আটপৌরে সাজ নিজের চরকায় কাটা সুতো দিয়ে বোনা। অলংকারের কথা যদি জিজ্ঞাসা কর কালিদাসের একটা লাইন তুলে দিলে তার জবাব হবে; কবি বলেনঃ কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতিনাম্। যার মাধুর্য আছে সে যা পরে তাতেই তার শোভা। রূপকথায় শুনেছি সুয়োরাণী ঠাঁই দেয় দুয়োরাণীকে গোয়াল ঘরে; কিন্তু গল্পের পরিণামের দিকে দেখি সুয়োরাণী যায় নির্বাসনে, টিঁকে থাকে একলা দুয়োরাণী রাণীর পদে। বাংলায় চলতি ভাষা বহুকাল ধরে জায়গা পেয়েছে সাধারণ

মাটির ঘরে, হেঁশেলের সঙ্গে, গোয়ালের ধারে গোবর-নিকোনো আঙিনার পাশে যেখানে সন্ধ্যেবেলায় প্রদীপ জ্বালানো হয় তুলসীতলায় আর বোষ্টমী এসে নাম শুনিয়ে যায় ভোর বেলাতে। গল্পের শেষ অংশটা এখনও সম্পূর্ণ আসে নি, কিন্তু আমার বিশ্বাস সুয়োরাণী নিবেন বিদায় আর একলা দুয়োরাণী বসবেন রাজাসনে।

চলতি ভাষার চলার বিরাম নেই, তার চলবার শক্তি আড়ষ্ট হবার সময় পায়না। আমাদের দিন রাত্রির মুখরিত সব কথা ঝরে পড়ছে তার মাটিতে, তার সঙ্গে মিশিয়ে গিয়ে তার প্রকাশের শক্তিকে করছে উর্বরা।

সভ্যতার সংকট

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ আমার বয়স আশি বৎসর পূর্ণ হল, আমার জীবনক্ষেত্রের বিস্তীর্ণতা আজ আমার সম্মুখে প্রসারিত। পূর্বতম দিগন্তে যে জীবন আরম্ভ হয়েছিল তার দৃশ্য অপর প্রান্ত থেকে নিঃসক্ত দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি এবং অনুভব করতে পারছি যে, আমার জীবনের এবং সমস্ত দেশের মনোবৃত্তির পরিণতি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে; সেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে গভীর দুঃখের কারণ আছে।

বৃহৎ মানববিশ্বের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আরম্ভ হয়েছে সেদিনকার ইংরেজ জাতির ইতিহাসে। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে উদ্ঘাটিত হল একটি মহৎ সাহিত্যের উচ্চশিখর থেকে ভারতের এই আগন্তুকের চরিত্র-পরিচয়। তখন আমাদের বিদ্যালাভের পথ্য-পরিবেশনে প্রাচুর্য ও বৈচিত্র ছিল না। এখনকার যে বিদ্যা জ্ঞানের নানা কেন্দ্র থেকে বিশ্বপ্রকৃতির পরিচয় ও তার শক্তির রহস্য নতুন নতুন করে দেখাচ্ছে তার অধিকাংশ ছিল তখন নেপথ্যে, অগোচরে। প্রকৃতিতত্ত্বে বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা ছিল অল্পই। তখন ইংরেজী ভাষার ভিতর দিয়ে ইংরেজি সাহিত্যকে জানা ও উপভোগ করা ছিল মার্জিতমনা বৈদগ্ধ্যের পরিচয়। দিনরাত্রি মুখরিত ছিল বার্কের বাগ্মিতায়, মেকলের ভাষাপ্রবাহের তরঙ্গভঙ্গে; নিয়তই আলোচনা চলত শেক্স্পিয়ারের নাটক নিয়ে বায়রনের কাব্য, নিয়ে এবং তখনকার পলিটিক্সে সর্বমানবের বিজয়ঘোষণায়। তখন আমরা স্বজাতির স্বাধীনতার সাধনা আরম্ভ করেছিলাম, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ছিল ইংরেজ জাতির ঔদার্যের প্রতি বিশ্বাস। সে বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে একসময় আমাদের সাধকেরা স্থির করেছিলেন যে, এই বিজিত জাতির স্বাধীনতার পথ বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে। কেননা, একসময় অত্যাচার প্রপীড়িত জাতির আশ্রয়স্থল ছিল ইংলন্ডে। যারা স্বজাতির সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণপণ করছিল তাদের অকুন্ঠিত আসন ছিল ইংলন্ডে। মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় দেখেছি ইংরেজ চরিত্রে। তাই আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে ইংরেজকে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসিয়েছিলেম। তখনো সাম্রাজ্যমদমত্ততায় তাদের স্বভাবের দাক্ষিণ্য কলুষিত হয় নি।

আমার বয়স যখন অল্প ছিল ইংলন্ডে গিয়েছিলেম, সেই সময় জন ব্রাইটের মুখ থেকে পার্লামেন্টে এবং তার বাহিরে কোনো কোনো সভায়

যে বক্তৃতা শুনেছিলেম তাতে শুনেছি চিরকালের ইংরেজের বাণী। সেই বক্তৃতায় হৃদয়ের ব্যাপ্তি জাতিগত সকল সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল সে আমার আজ পর্যন্ত মনে আছে এবং আজকের এই শ্রীভ্রষ্ট দিনেও আমার পূর্বস্মৃতিকে রক্ষা করছে। এই পরিনির্ভরতা নিশ্চয়ই আমাদের শ্লাঘার বিষয় ছিল না। কিন্তু এর মধ্যে এইটুকু প্রশংসার বিষয় ছিল যে, আমাদের আবহমান কালের অনভিজ্ঞতার মধ্যেও মনুষ্যত্বের যে একটি মহৎ রূপ সেদিন দেখেছি, তা বিদেশীয়কে আশ্রয় ক'রে প্রকাশ পেলেও, তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের ছিল ও কুণ্ঠা আমাদের মধ্যে ছিল না। কারণ, মানুষের মধ্যে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তা সংকীর্ণভাবে কোন জাতির মধ্যে বদ্ধ হতে পারে না, তা কৃপণের অবরুদ্ধ ভাণ্ডারের সম্পদ নয়। তাই, ইংরেজের যে সাহিত্যে আমাদের মন পুষ্টিলাভ করেছিল আজ পর্যন্ত তার বিজয়শঙ্খ আমার মনে মন্দ্রিত হয়েছে।

'সিভিলিজেশন,' যাকে আমরা সভ্যতা নাম দিয়ে তর্জমা করেছি, তার যথার্থ প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় পাওয়া সহজ নয়। এই সভ্যতার যে রূপ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল মনু তাকে বলেছেন সদাচার। অর্থাৎ তা কতকগুলি সামাজিক নিয়মের বন্ধন। সেই নিয়মগুলির সম্বন্ধে প্রাচীনকালে যে ধারণা ছিল সেও একটি সংকীর্ণ ভূগোলখণ্ডের মধ্যে বদ্ধ। সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী যে দেশ ব্রহ্মাবর্ত নামে বিখ্যাত ছিল সেই দেশে যে আচার পারম্পর্যক্রমে চলে এসেছে তাকেই বলে সদাচার। অর্থাৎ, এই আচারের ভিত্তি প্রথার উপরেই প্রতিষ্ঠিত—তার মধ্যে যত নিষ্ঠুরতা, যত অবিচারই থাক। এই কারণে প্রচলিত সংস্কার আমাদের আচার ব্যবহারকেই প্রাধান্য দিয়ে চিত্তের স্বাধীনতা নির্বিচারে অপহরণ করেছিল। সদাচারের যে আদর্শ একদা মনু ব্রহ্মাবর্তে প্রতিষ্ঠিত দেখেছিলেন সেই আদর্শ ক্রমশ লোকাচারকে আশ্রয় করলে। আমি যখন জীবন আরম্ভ করেছিলুম তখন ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এই বাহ্য আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেশের শিক্ষিত মনে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। রাজনারায়ণ বাবু কর্তৃক বর্ণিত তখনকার কালের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ব্যবহারের বিবরণ পড়লে সে কথা স্পষ্ট বোঝা যাবে। এই সদাচারের স্থলে সভ্যতার আদর্শকে আমরা ইংরেজ জাতির চরিত্রের সঙ্গে মিলিত করে গ্রহণ করেছিলেম। আমাদের পরিবারে এই পরিবর্তন, কী ধর্মমতে কী লোকব্যবহারে, ন্যায়বুদ্ধির অনুশাসনে পূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছিল। আমি সেই ভাবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলুম এবং সেই সঙ্গে আমাদের স্বাভাবিক সাহিত্যানুরাগ ইংরেজকে উচ্চাসনে বসিয়েছিল। এই গেল জীবনের প্রথম ভাগ। তারপর থেকে ছেদ

আরম্ভ হল কঠিন দুঃখে। প্রত্যহ দেখতে পেলুম, সভ্যতাকে যারা চরিত্র উৎস থেকে উৎসারিতরূপে স্বীকার করেছে, রিপুর প্রবর্তনায় তারা তাকে কী অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে।

নিভৃতে সাহিত্যের রসসম্ভোগের উপকরণের বেষ্টন হতে একদিন আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র আমার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হল তা হৃদয়বিদারক। অন্ন বস্ত্র পানীয় শিক্ষা আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীরমনের পক্ষে যা-কিছু আবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক-শাসনচালিত কোনো দেশেই ঘটেনি। অথচ এই দেশ ইংরেজকে দীর্ঘকাল ধরে তার ঐশ্বর্য জুগিয়ে এসেছে। যখন সভ্যজগতের মহিমাধ্যানে একান্তমনে নিবিষ্ট ছিলেম তখন কোনোদিন সভ্যনামধারী মানব-আদর্শের এতবড়ো নিষ্ঠুর বিকৃতরূপ কল্পনা করতেই পারি নি; অবশেষে দেখছি, একদিন এই বিকারের ভিতর দিয়ে বহু-কোটি জনসাধারণের প্রতি সভ্যজাতির অপরিসীম অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদাসীন্য।

যে যন্ত্রশক্তির সাহায্যে ইংরেজ আপনার বিশ্বকর্তৃত্ব রক্ষা করে এসেছে তার যথোচিত চর্চা থেকে এই নিঃসহায় দেশ বঞ্চিত। অথচ চক্ষের সামনে দেখলুম জাপান যন্ত্রচালনার যোগে দেখতে দেখতে সর্বতোভাবে কি রকম সম্পদবান হয়ে উঠল। সেই জাপানের সমৃদ্ধি আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি দেখেছি সেখানে স্বজাতির মধ্যে তার সভ্য-শাসনের রূপ। আর দেখেছি রাশিয়ার মস্কাও নগরীতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আরোগ্য বিস্তারের কী অসামান্য অকৃপণ অধ্যবসায়—সেই অধ্যবসায়ের প্রভাবে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের মূর্খতা ও দৈন্য ও আত্মাবমাননা অপসারিত হয়ে যাচ্ছে। এই সভ্যতা জাতিবিচার করেনি, বিশুদ্ধ মানবসম্বন্ধের প্রভাব সর্বত্র বিস্তার করেছে। তার দ্রুত এবং আশ্চয পরিণতি দেখে একইকালে ঈর্ষা এবং আনন্দ অনুভব করেছি। মস্কাও শহরে গিয়ে রাশিয়ার শাসনকার্যের একটি অসাধারণতা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল—দেখেছিলেম, সেখানকার মুসলমানদের সঙ্গে রাষ্ট্র-অধিকারের, ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে অমুসলমানদের কোনো বিরোধ ঘটে না; তাদের উভয়ের মিলিত স্বার্থসম্বন্ধের ভিতরে রয়েছে শাসনব্যবস্থার যথার্থ সত্য ভূমিকা। বহুসংখ্যক পরজাতির উপরে প্রভাব চালনা করে এমন রাষ্ট্রশক্তি আজ প্রধানত দুটি জাতির হাতে আছে - এক ইংরেজ, আর-এক সোভিয়েট রাশিয়া। ইংরেজ এই পরজাতীয়ের পৌরুষ দলিত করে দিয়ে তাকে চিরকালের মতো নির্জীব করে রেখেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রিক সম্বন্ধ আছে বহুসংখ্যক মরুচর মুসলমান জাতির আমি নিজে সাক্ষ্য দিতে পারি, এই জাতিকে সকল দিকে শক্তিমান করে তোলবার জন্য

তাদের অধ্যবসায় নিরন্তর। সকল বিষয়ে তাদের সহযোগী করে রাখবার জন্য সোভিয়েট গভর্নমেন্টের চেষ্টার প্রমান আমি দেখেছি এবং সে সম্বন্ধে কিছু পড়েছি। এইরকম গভর্নমেন্টের প্রভাব কোনো অংশে অসম্মানকর নয় এবং তাতে মনুষ্যত্বের হানি করে না। সেখানকার শাসন বিদেশীয় শক্তির নিদারুণ নিষ্পেষণী যন্ত্রের শাসন নয়। দেখে এসেছি, পারস্যদেশ একদিন দুই য়ুরোপীয় জাতির জাঁতার চাপে যখন পিষ্ট হচ্ছিল তখন সেই নির্মম আক্রমণের য়ুরোপীয় দংষ্ট্রাঘাত থেকে আপনাকে মুক্ত করে কেমন করে এই নবজাগ্রত জাতি আত্মশক্তির পূর্ণতা সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছে। দেখে এলেম, জরথুষ্ট্রিয়ানদের সঙ্গে মুসলমানদের এককালে যে সাংঘাতিক প্রতিযোগিতা ছিল বর্তমান সভ্যশাসনে তার সম্পূর্ণ উপশম হয়ে গিয়েছে। তার সৌভাগ্যের প্রধান কারণ এই যে, সে য়ুরোপীয় জাতির চক্রান্তজাল থেকে মুক্ত হতে পেরেছিল। সর্বান্তঃকরণে আজ আমি এই পারস্যের কল্যাণ কামনা করি। আমাদের প্রতিবেশী আফগানিস্তানের মধ্যে শিক্ষা এবং সমাজনীতির সেই সার্বজনীন উৎকর্ষ যদিচ এখনো ঘটেনি, কিন্তু তার সম্ভাবনা অক্ষুন্ন রয়েছে, তার একমাত্র কারণ—সভ্যতাগর্বিত কোনো য়ুরোপীয় জাতি তাকে আজও অভিভূত করতে পারেনি। এরা দেখতে দেখতে চার দিকে উন্নতির পথে, মুক্তির পথে অগ্রসর হতে চলল।

ভারতবর্ষ ইংরেজের সভ্যশাসনের জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে তলিয়ে পড়ে রইল নিরুপায় নিশ্চলতার মধ্যে। চৈনিকদের মতন এতবড়ো প্রাচীনসভ্য জাতিকে ইংরেজ স্বজাতির স্বার্থ সাধনের জন্য বলপূর্বক অহিফেনবিষে জর্জরিত করে দিলে, এবং তার পরিবর্তে চীনের এক অংশ আত্মসাৎ করলে। এই অতীতের কথা যখন ক্রমশ ভুলে এসেছি তখন দেখলুম উত্তর-চীনকে জাপান গলাধঃকরণ করতে প্রবৃত্ত; ইংলন্ডের রাষ্ট্রনীতি প্রবীণেরা কী অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে সেই দস্যুবৃত্তিকে তুচ্ছ বলে গণ্য করেছিল! পরে এক সময়ে স্পেনের প্রজাতন্ত্র-গভর্ণমেন্টের তলায় ইংলন্ড কীরকম কৌশলে ছিদ্র করে দিলে, তাও দেখলাম এই দূর থেকে। সেই সময়েই এও দেখেছি, একদল ইংরেজ সেই বিপদগ্রস্ত স্পেনের জন্য আত্মসমর্পণ করেছিলেন। যদিও ইংরেজের এই ঔদার্য প্রাচ্য চীনের সংকটে যথোচিত জাগ্রত হয় নি, তবু য়ুরোপীয় জাতির প্রজাস্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য যখন তাদের কোনো বীরকে প্রাণপাত করতে দেখলুম তখন আবার একবার মনে পড়ল, ইংরেজকে একদা মানবহিতৈষীরূপে দেখেছি এবং কী বিশ্বাসের সঙ্গে ভক্তি করেছি। য়ুরোপীয় জাতির স্বভাবগত সভ্যতার প্রতি বিশ্বাস ক্রমে কী করে হারানো গেল তারই এই শোচনীয় ইতি-

হ্রাস আজ আমাকে জানাতে হল। সভ্যশাসনের চালনায় ভারতবর্ষে সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ অভাব মাত্র নয়; সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ, যার কোনো তুলনা দেখতে পাই নি ভারতবর্ষের বাইরে মুসলমান স্বায়ত্তশাসন-চালিত দেশে। আমাদের বিপদ এই যে, এই দুর্গতির জন্যে আমাদেরই সমাজকে একমাত্র দায়ী করা হবে। কিন্তু এই দুর্গতির রূপ যে প্রত্যহই ক্রমশ উৎকট হয়ে উঠেছে, সে যদি ভারত-শাসন-যন্ত্রের উর্ধ্বস্তরে কোনো এক-গোপন কেন্দ্রে প্রশ্রয়ের দ্বারা পোষিত না হত তাহলে কখনোই ভারত-ইতিহাসের এতবড়ো অপমানকর অসভ্য পরিণাম ঘটতে পারত না। ভারতবাসী যে বুদ্ধি-সামর্থ্যে কোনো অংশে জাপানের চেয়ে ন্যূন, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই দুই প্রাচ্যদেশের সর্বপ্রধান প্রভেদ এই ইংরেজ-শাসনের দ্বারা সর্বতোভাবে অধিকৃত ও অভিভূত ভারত, আর জাপান এই-রূপ কোনো পাশ্চাত্য জাতির পক্ষছায়ার আবরণ থেকে মুক্ত। এই বিদেশীয় সভ্যতা, যদি একে সভ্যতা বলো, আমাদের কী অপহরণ করেছে তা জানি; সে তার পরিবর্তে দণ্ড হাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে **Law and Order**, বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস, যা দারোয়ানি মাত্র। পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা-অভিমানের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারেনি। অর্থাৎ, মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সবচেয়ে মূল্যবান এবং যাকে যথার্থ সভ্যতা বলা যেতে পারে, তার কৃপণতা এই ভারতীয়দের উন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে দিয়েছে। অথচ, আমার ব্যক্তিগত সৌভাগ্যক্রমে মাঝে মাঝে মহদাশয় ইংরেজের সঙ্গে আমার মিলন ঘটেছে। এই মহত্ত্ব আমি অন্য কোনো জাতির কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখতে পাই নি। এঁরা আমার বিশ্বাসকে ইংরেজ জাতির প্রতি আজও বেঁধে রেখেছেন। দৃষ্টান্তস্থলে এন্ড্রুজের নাম করতে পারি; তাঁর মধ্যে যথার্থ ইংরেজকে, যথার্থ খৃষ্টানকে, যথার্থ মানবকে বন্ধুভাবে অত্যন্ত নিকটে দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল। আজ মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষণীতে স্বার্থসম্পর্কহীন তাঁর নির্ভীক মহত্ত্ব আরও জ্যোতির্ময় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাঁর কাছে আমার এবং আমাদের সমস্ত জাতির কৃতজ্ঞতার নানা কারণ আছে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে একটি কারণে আমি তাঁর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। তরুণ বয়সে ইংরেজি সাহিত্যের পরিবেশের মধ্যে ইংরেজ জাতিকে আমি নির্মল শ্রদ্ধা একদা সম্পূর্ণচিত্তে নিবেদন করেছিলেম, আমার শেষ বয়সে তিনি তারই জীর্ণতা ও কলঙ্ক মোচনে সহায়তা করে গেলেন। তাঁর স্মৃতির সঙ্গে এই জাতির মর্মগত মাহাত্ম্য আমার মনে ধ্রুব হয়ে থাকবে। আমি এঁদের নিকটতম বন্ধু বলে গণ্য করেছি এবং

সমস্ত মানব জাতির বন্ধু বলে মান্য করি। এঁদের পরিচয় আমার জীবনে একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে সঞ্চিত হয়ে রইল। আমার মনে হয়েছে, ইংরেজের মহত্বকে এঁরা সকলপ্রকার নৌকোডুবি থেকে উদ্ধার করতে পারবেন। এঁদের যদি না দেখতুম এবং না জানতুম তাহলে পাশ্চাত্য জাতির সম্বন্ধে আমার নৈরাশ্য কোথাও প্রতিবাদ পেত না।

এমন সময় দেখা গেল, সমস্ত য়ুরোপে বর্বরতা কিরকম নখদন্ত বিকাশ করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত। এই মানবপীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে। আমাদের হত-ভাগ্য নিঃসহায় নীরন্ধ্র অকিঞ্চনতার মধ্যে আমরা কি তার কোন আভাস পাইনি?

ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসন ধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিসহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্ন-স্তূপ! কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়-যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

এই কথা আজ বলে যাব, প্রবল-প্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্ম-ম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে; নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।।

ঐ মহামানব আসে,
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক—
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নবজীবনের আশ্বাসে।
'জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়'
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
১লা বৈশাখ, ১৩৪৮।

নিয়মের রাজত্ব

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

(১৮৬৪-১৯১৯)

বিশ্বজগৎ নিয়মের রাজ্য, এইরূপ একটা বাক্য আজকাল সর্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানসম্পৃক্ত যে-কোন গ্রন্থ হাতে করিলেই দেখা যাইবে যে, লেখা রহিয়াছে, প্রকৃতির রাজ্যে অনিয়মের অস্তিত্ব নাই; সর্বত্রই নিয়ম, সর্বত্রই শৃঙ্খলা। ভূতপূর্ব আর্গাইলের ডিউক নিয়মের রাজত্ব সম্পর্কে একখানা বৃহৎ কেতাব লিখিয়া গিয়াছেন। মনুষ্যের রাজ্যে আইন আছে বটে এবং সেই আইন ভঙ্গ করিলে শাস্তিরও ব্যবস্থা আছে; কিন্তু অনেকেই আইনকে ফাঁকি দিয়া অব্যাহতি লাভ করে। কিন্তু বিশ্ব-জগতে অর্থাৎ প্রকৃতির রাজ্যে যে-সকল আইনের বিধান বর্তমান, তাহার একটাতেও ফাঁকি দেবার জো নাই। কোথাও ব্যভিচার নাই, কোথাও ফাঁকি দিয়া অব্যাহতি লাভের উপায় নাই। কাজেই প্রকৃতির নিয়মের জয়গান করিতে গিয়া অনেকে পুলকিত হন, ভাবাবেগে গদগদকণ্ঠ হইয়া থাকেন; তাঁহাদের দেহে বিবিধ সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হয়।

যাঁহারা মিরাক্‌ল বা অতিপ্রকৃত মানেন, তাঁহারা সকল সময় এই নিয়মের অব্যভিচারিতা স্বীকার করেন না, অথবা প্রকৃতিতে নিয়মের রাজত্ব স্বীকার করিলেও অতিপ্রাকৃত শক্তি সময়ে সময়ে সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয়, এইরূপ স্বীকার করেন। যাঁহারা মিরাক্‌ল চাহেন না, তাঁহারা প্রতিপক্ষকে মিথ্যাবাদী নির্বোধ পাগল ইত্যাদি মধুর সম্বোধনে আপ্যায়িত করেন। কখনও বা উভয় পক্ষে বাগ্‌যুদ্ধের পরিবর্তে বাহুযুদ্ধের অবতারণা হয়।

বর্তমান অবস্থায় প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে নূতন করিয়া গভীরভাবে একটা সন্দর্ভ লিখিবার সময় গিয়াছে, এরূপ না করিলেও চলিতে পারে।

প্রাকৃতিক নিয়ম কাহাকে বলে? দুই একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করা যাইতে পারে। গাছ হইতে ফল চিরকালই ভূমিপৃষ্ঠে পতিত হয়। এ পর্যন্ত যত গাছ দেখা গিয়াছে ও যত ফল দেখা গিয়াছে, সর্বত্রই এই নিয়ম। যে-দিন লোষ্ট্রপাতিত আম্র ভূপৃষ্ঠ অন্বেষণ না করিয়া আকাশ-মার্গে ধাবিত হইবে, সেই ভয়াবহ দিন মনুষ্যের ইতিহাসে বিলম্বিত হউক।

ফলে আম বল, জাম বল, নারিকেল বল, সকলেই অধোমুখে ভূমিতে পড়ে, কেহই ঊর্ধ্বমুখে আকাশপথে চলে না। কেবল আম জাম নারিকেল কেন

যে কোন দ্রব্য ঊর্ধ্বে উৎক্ষেপ কর না, তাহাই কিছুক্ষণ পরে ভূমিতে নামিয়া আসে। এই সাধারণ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম এ পর্যন্ত দেখা যায় নাই।

এতএব ইহা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। পার্থিব দ্রব্য মাত্রই ভূকেন্দ্রাভিমুখে গমন করিতে চাহে। এই নিয়মের নাম ভৌম আকর্ষণ বা মাধ্যাকর্ষণ।

প্রকৃতির রাজ্যে নিয়ম ভঙ্গ হয় না; কাজেই যদি কেহ আসিয়া বলে, দেখিয়া আসিলাম, অমুকের গাছের নারিকেল আজ বৃন্তচ্যুত হইবা মাত্র ক্রমেই বেলুনের মত উপরে উঠিতে লাগিল, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই হতভাগ্য ব্যক্তির উপর বিবিধ নিন্দাবাদ বর্ষিত হইতে থাকিবে। কেহ বলিবে —লোকটা মিথ্যাবাদী, কেহ বলিবে—লোকটা পাগল; কেহ বলিবে—লোকটা গুলি খায়; এবং যিনি সম্প্রতি রসায়ন নামক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিজ্ঞ হইয়াছেন, তিনি হয়তো বলিলেন, হইতেও বা পারে, বুঝি ঐ নারিকেলটার ভিতরে জলের পরিবর্তে হাইড্রোজেন গ্যাস ছিল। কেননা, তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস যে, নারিকেল,—খাঁটি নারিকেল, যাহার ভিতরে জল আছে, হাইড্রোজেন নাই, এহেন নারিকেল কখনই প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গে অপরাধী হইতে পারেনা।

খাঁটি নারিকেল নিয়ম ভঙ্গ করে না বটে, তবে হাইড্রোজেনপূর্ণ বোম্বাই নারিকেল নিয়ম ভঙ্গ কারতে পারে; আম ভূমিতে পড়ে, কিন্তু মেঘ বায়ুতে ভাসে; প্যারাসুট-বিলম্বিত আরোহী নীচে নামে বটে, কিন্তু বেলুনটা উপরে উঠে।

তবে এইখানে বুঝি নিয়ম ভঙ্গ হইল। পূর্বে এক নিঃশ্বাসে নিয়ম বলিয়া ফেলিয়াছিলাম, পার্থিব দ্রব্য মাত্রেই নিম্নগামী হয়; কিন্তু এখানে দেখিতেছি, নিয়মের ব্যভিচার আছে; যথা মেঘ, বেলুন ও হাইড্রোজেনপোরা বোম্বাই নারিকেল। লোহা জলে ডুবে, কিন্তু শোলা জলে ভাসে। কাজেই প্রকৃতির নিয়মে এইখানে ব্যভিচার।

অপর পক্ষ হটিবার নহেন; তাঁহারা বলিবেন, তা কেন, নিয়ম ঠিক আছে, পার্থিব দ্রব্য মাত্রেই নীচে নামে, এরূপ নিয়ম নহে। দ্রব্য মধ্যে জাতিভেদ আছে। গুরু দ্রব্য, নীচে নামে, লঘু দ্রব্য উপরে উঠে, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। লোহা গুরু দ্রব্য তাই জলে ডুবে, শোলা লঘু দ্রব্য তাই জলে ভাসে। ডুবাইয়া দিলেও উপরে উঠে। নারিকেল গুরু দ্রব্য, উহা নামে। কিন্তু বেলুন লঘু দ্রব্য; উহা উঠে।

এই নিয়মের ব্যতিক্রম খুঁজিয়া বাহির করা বস্তুতই কঠিন। কার সাধ্য ঠকায়? ঐ জিনিসটা উপরে উঠিতেছে কেন? উত্তর, এটা যে লঘু। ঐ জিনিসটা নামিতেছে কেন? উত্তর ওটা যে গুরু। যাহা লঘু তাহা ত উঠিবেই; যাহা গুরু, তাহা ত নামিবেই; ইহাই ত প্রকৃতির নিয়ম।

সোজা পথে আর উত্তর দিতে পারা যায় না; বাঁকা পথে যাইতে হয়। লোহা গুরু দ্রব্য; কিন্তু খানিকটা পারার মধ্যে ফেলিলে লোহা ডুবে না। ভাসিতে থাকে। সোলা লঘু দ্রব্য; কিন্তু জল হইতে তুলিয়া ঊর্ধ্ব-মুখে নিক্ষেপ করিলে ঘুরিয়া ভূতলগামী হয়। তবেই ত প্রাকৃতিক নিয়মের ভঙ্গ হইল।

উত্তর—আরে মূর্খ, গুরু লঘু শব্দের অর্থ বুঝিলে না। গুরু মানে এখানে পাঠশালার গুরু মহাশয় নহে বা মন্ত্রদাতা গুরু নহে; গুরু অর্থ অমুক পদার্থ অপেক্ষা গুরু অর্থাৎ ভারী। লোহা গুরু, তার অর্থ এই যে, লোহা বায়ু অপেক্ষা গুরু, জল অপেক্ষা গুরু; কাজেই বায়ু মধ্যে কি জলমধ্যে রাখিলে লোহা না ভাসিয়া ডুবিয়া যায়। আর লোহা পারার অপেক্ষা লঘু, সমান আয়তনের লোহা ও পারা নিক্তিতে ওজন করিলেই দেখিবে, কে লঘু কে গুরু। পারা অপেক্ষাও লোহা লঘু, সেজন্যে লোহা পারায় ভাসে। প্রাকৃতিক নিয়মটার অর্থই বুঝিলে না, কেবল তর্ক করিতে আসিতেছ!

এ পক্ষ বলিতে পারেন, আপনার বাক্যের অর্থ যদি বুঝিতে না পারি, সে ত আমার বুদ্ধির দোষ নহে, আপনার ভাষার দোষ। গুরু দ্রব্য নামে, লঘু দ্রব্য উঠে, বলিবার পূর্বে গুরু লঘু কাহাকে বলে আমাকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। আপনার আইনের ভাষা যোজনায় দোষ ঘটিয়াছে, উহার সংশোধন আবশ্যক।

ভাষা সংশোধনের পর প্রাকৃতিক আইনের সংশোধিত ধারাটাই দাঁড়াইবে এই রকম ঃ

ধারা।—কোন দ্রব্য অপর তরল বা বায়বীয় দ্রব্যমধ্যে রাখিলে প্রথম দ্রব্য যদি দ্বিতীয় দ্রব্য অপেক্ষা গুরু হয়, তাহা হইলে নিম্নগামী হইবে, আর যদি লঘু হয়, তাহা হইলে ঊর্ধ্বগামী হইবে।

ব্যাখ্যা।—এক দ্রব্য অন্য দ্রব্য অপেক্ষা গুরু কি লঘু তাহা উভয়ের সমান আয়তন লইয়া নিক্তিতে ওজন করিয়া দেখিতে হইবে।

উদাহরণ।—রাম প্রথম দ্রব্য, শ্যাম দ্বিতীয় দ্রব্য। রামকে শ্যামের আয়তন মত ছাঁটিয়া লইয়া তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া দেখ, রাম যদি শ্যাম অপেক্ষা গুরু হয়, তাহা হইলে শ্যামের মধ্যে রামকে রাখিলে রাম নিম্ন-গামী হইবে। শ্যামকে তরল পদার্থ মনে করিতে আপত্তি করিও না। সংশো-ধনের পর আইনের ভাষা অত্যন্ত সুবোধ্য হইয়া দাঁড়াইল, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

এখন দেখা যাক, কত দূর দাঁড়াইল। পার্থিব দ্রব্যমাত্রই ভূমি স্পর্শ করিতে চাহে নিম্নগামী হয়; ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম নহে। সুতরাং উহার

ব্যভিচার দেখিলে বিস্মিত হইবার হেতু নাই; পার্থিব দ্রব্য অবস্থা-বিশেষে অর্থাৎ অন্য পার্থিব বস্তুর সন্নিধানে কখনও বা উপরে উঠে, কখনও বা নীচে নামে। যখন অন্য কোন বস্তুর সন্নিধানে থাকে না, তখন সকল পার্থিব দ্রব্য নীচে নামে। যেমন শূন্য প্রদেশে পাম্পযোগে কোন প্রদেশকে জল-শূন্য ও বায়ুশূন্য করিয়া সেখানে যে কোন দ্রব্য রাখিবে, তাহাই নিম্নগামী হইবে। আর বায়ু মধ্যে, জল মধ্যে, তৈলের মধ্যে, পারদ মধ্যে কোন জিনিস রাখিলে তখন লঘু-গুরু বিচার করিতে হইতে হইবে। ফলে ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম; ইহার ব্যভিচার নাই। এই অর্থে প্রাকৃতিক নিয়ম অলঙ্ঘ্য।

তবে যত দোষ এই জলের আর তেলের আর পারার আর বাতাসের। উহাদের সান্নিধ্যই এই নিয়ম সংশয় উৎপাদনের হেতু হইয়াছিল। ভাগ্যিস মনুষ্য বুদ্ধিজীবি, তাই প্রকৃত দোষীর সন্ধান করিতে পারিয়াছে; নতুবা প্রকৃতিতে নিয়মের প্রভুত্বটা গিয়াছিল আর কি!

বাস্তবিকই দোষ এই তরল পদার্থের ও বায়বীয় পদার্থের। বেলুন উপরে উঠে, বায়ু আছে বলিয়া; শোলা জলে ভাসে, জল আছে বলিয়া; লোহা পারায় ভাসে, পারা আছে বলিয়া; নতুবা সকলেই ডুবিত, কেহই ভাসিত না, সকলেই নামিত, কেহই উঠিত না।

অর্থাৎ কিনা, পৃথিবী যেমন সকল দ্রব্যকেই কেন্দ্রমুখে আনিতে চায়, তরল ও বায়বীয় পদার্থ মাত্রেই তেমনই মগ্ন দ্রব্য মাত্রকেই উপরে তুলিতে চায়। প্রথম ব্যাপারের নাম দিয়াছি মাধ্যাকর্ষণ, দ্বিতীয় ব্যাপারের নাম দাও চাপ। মাধ্যাকর্ষণে নামায়, চাপে ঠেলিয়া উঠায়। যেখানে উভয় বর্তমান, সেখানে—উভয়ই কার্য করে। যার যত জোর। যেখানে আকর্ষণ চাপ অপেক্ষা প্রবল, সেখানে মোটের উপর নামিতে হয়। যেখানে চাপ আকর্ষণ অপেক্ষা প্রবল, সেখানে মোটের উপর উঠিতে হয়। যেখানে উভয়ই সমান, সেখানে 'ন যযৌ ন তস্থৌ'।

এখন এ পক্ষ স্পর্ধা করিয়া বলিবেন,—দেখিলে, প্রাকৃতিক নিয়মের আর ব্যতিক্রম আছে কি? আমাদের প্রকৃতি রাজ্যে কি কেবল একটা নিয়ম, কেইকিলব একটা আইন? অনেক নিয়ম ও অনেক আইন, অথবা একই আইনের অনেক ধারা। যথা—

১নং ধারা—পার্থিব আকর্ষণে বস্তু মাত্রেই নিম্নগামী হন।

২নং ধারা—তরল ও বায়বীয় পদার্থের চাপে বস্তু মাত্রই ঊর্ধ্বগামী হয়।

৩নং ধারা—আকর্ষণ ও চাপ উভয়ই যুগপৎ কাজ করে। আকর্ষণ প্রবল হইলে নামায়, চাপ প্রবল হইলে উঠায়।

কাহার সাধ্য, এখন বলে যে, প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচার আছে? উঠিলেও নিয়ম, নামিলেও নিয়ম, স্থির থাকিলেও নিয়ম; নিয়ম কাটাইবার জো নাই। প্রকৃতির রাজ্য বস্তুতই নিয়মের রাজ্য। নারিকেল-ফল যে নিয়ম লঙ্ঘন করে না, তাহা যে দিন হইতে নারিকেল-ফল মানুষের ভক্ষ্য হইয়াছে, তদবধি সকলেই জানে। বেলুন যে ঊর্ধ্বগামী হইয়াও নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারিল না, তাহাও দেখা গেল। কেননা পৃথিবীর আকর্ষণ উভয় স্থানেই বিদ্যমান।

পার্থিব দ্রব্য ব্যতীত অপার্থিব দ্রব্যও যে পৃথিবীর দিকে আসিতে চায়, তাহা কিন্তু সকলে জানিত না। দুইশত বৎসরের অধিক হইল, একজন লোক পৃথিবীকে জানান, অয়ি মাতঃ, তোমার আকর্ষণ কেবল নারিকেল ফলেই ও আতা-ফলেই আবদ্ধ নহে, তোমার আকর্ষণ বহুদূরব্যাপী। তোমার অধম সন্তানেরা তাহা জানিয়াও জানে না। এই ব্যক্তির নাম সার্ আইজাক নিউটন।

তিনি জানাইলেন, দূরস্থ চন্দ্রদেব পর্যন্ত পৃথিবী মুখে নামিতেছেন, ক্রমাগত ভূমি স্পর্শের চেষ্টা করিতেছেন, কেবল স্পর্শলাভটি ঘটিতেছে না। কেবল তাহাই কি? স্বয়ং দিবাকর, তাঁহার পার্ষদবর্গ সমভিব্যাহারে পৃথিবী মুখে আসিবার চেষ্টায় আছেন। কেবল তাহাই কি? পৃথিবীও তাহাদের প্রত্যেকের নিকট যাইতে চেষ্টা করিতেছেন। অর্থাৎ সকলেই সকলের নিকট যাইতে চাহিতেছেন। স্বস্থানে স্থির থাকিতে কাহারও চেষ্টা নাই; সকলেই সকলের নিকট ধাবমান। ধাবমান বটে, কিন্তু নির্দিষ্ট বিধানে; পৃথিবী সূর্য হইতে এত দূরে আছেন; আচ্ছা পৃথিবী এইটুকু জোরে সূর্যের অভিমুখে চলিতে থাকুন। চন্দ্র পৃথিবী হইতে এতটা দূরে আছেন; বেশ চন্দ্র প্রতি মিনিটে এত ফুট করিয়া পৃথিবীমুখে অগ্রসর হউন। পৃথিবী নিজেও চন্দ্র হইতে এত দূরে আছেন, তিনিও মিনিটে চন্দ্রের দিকে এত ফুট চলুন। তবে তাঁহার কলেবর কিছু গুরুভার, তাঁহাকে এতফুট হিসাবে চলিলেই হইবে; চন্দ্র-পৃথিবীর তুলনায় লঘুশরীর, তাহাকে এত ফুট হিসাবে না চলিলে হইবে না। তুমি বৃহস্পতি, বিশালকায় লইয়া বহু দূরে থাকিয়া পার পাইবে বলিয়া মনে করিও না। তোমার অপেক্ষা বহুগুণে বিশালকায় সূর্যদেব বর্তমান; তুমি তাঁহার অভিমুখে এই নির্দিষ্ট বিধানে চলিতে বাধ্য; আর বুধ-কুজাদি ক্ষুদ্র গ্রহগণকেও একেবারে অবজ্ঞা করিলে তোমার চলিবে না, তাহাদের দিক দিয়াও একটু ঘুরিয়া চলিতে হইবে। আর শনৈশ্চর, কোটি কোটি লোষ্ট্রখন্ডের মালা পরিয়া গর্ব করিও না; এই ক্ষুদ্র লোষ্ট্রখন্ডকে উপহাস করিবার তোমার ক্ষমতা নাই। নেপচুন, তুমি বহু দূরে থাকিয়া এত কাল লুকাইয়া ছিলে; বন্ধু উরেনসকে টান দিতে গিয়া স্বয়ং ধরা পড়িলে।

আবিষ্কৃত হইল বিশ্বজগতে একটা মহানিয়ম,—একটা কঠোর আইন; এই আইন ভঙ্গ করিয়া এড়াইবার উপায় কাহারও নাই। সূর্য হইতে বালুকণা পর্যন্ত সকলেই পরস্পরের মুখ চাহিয়া চলিতেছে, নির্দিষ্ট বিধানে নির্দিষ্ট পথে চলিতেছে। খড়ি পাতিয়া বলিয়া দিতে পারি, ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল মধ্যাহ্নকালে কোন্ গ্রহ কোথায় থাকিবেন। এই যে কঠোর আইন প্রকৃতির সাম্রাজ্যে প্রচলিত আছে, ইহার এলাকা কতদূর বিস্তৃত? সমস্ত বিশ্বসাম্রাজ্যে কি এই নিয়ম চলিতেছে? বলা কঠিন। সৌর-জগতের মধ্যে ত আইন প্রচলিত দেখিতেই পাইতেছি। সৌর-জগতের বাহিরের খবর কি? বাহিরের খবর পাওয়া দুষ্কর। খগোলমধ্যে স্থানে স্থানে এক এক যোড়া তারা দেখা যায়; তারকাযুগলের মধ্যে একে অন্যকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে; যেমন চন্দ্র ও পৃথিবীর এক যোড়া বা পৃথিবী সূর্য আর এক যোড়া, কতকটা তেমনই। পরস্পর বেষ্টন করিয়া ঘুরিবার চেষ্টা দেখিয়াই বুঝা যায়, সৌর-জগতের বাহিরেও এই আইন বলবৎ। কিন্তু সর্বত্র বলবৎ কিনা, বলা যায় না। কেন না, সংবাদের অভাব। দূরের তারাগুলি পরস্পর হইতে এত দূরে আছে যে, পরস্পর আকর্ষণ থাকিলেও তাহার ফল এত সামান্য যে, তাহা আমাদের গণাতেও আসে না, আমাদের প্রত্যক্ষগোচরও হয় না।

সম্ভবতঃ এই আইনের এলাকা বহুদূর বিস্তৃত। সমস্ত খগোলমধ্যে সকলেই সম্ভবতঃ এই আইনের অধীন। কিন্তু যদি কোন দিন আবিষ্কৃত হয় যে,কোন একটা তারা বা কোন একটা প্রদেশের তারকাগণ এই আইন মানিতেছে না তাহা হইলে কি হইবে? যদি বিশ্ব সাম্রাজ্যের কোন প্রদেশের মধ্যে এই আইন না চলে, তবে কি ব্রহ্মান্ডকে নিয়মতন্ত্র রাজ্য বলিয়া গণ্য করিব না?

মনে কর, নিউটন সৌর-জগতের মধ্যে যে নিয়মের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন দেখা গেল, বিশ্ব-জগতের অন্য কোন প্রদেশে সেই নিয়ম চলে না, সেখানে গতিবিধি অন্য নিয়মে ঘটে; তখন কি বলিব? তখন নিউটনের নিয়মকে সংশোধন করিয়া লইয়া বলিব, বিশ্বজগতের এই প্রদেশে এই নিয়ম অমুক প্রদেশে কিন্তু অন্য নিয়ম। এই প্রদেশে এই নিয়মের ব্যভিচার নাই, ঐ প্রদেশে ঐ নিয়মের ব্যভিচার নাই। কিন্তু সর্বত্রই নিয়মের বন্ধন,—জগৎ নিয়মের রাজ্য। নিউটনের আবিষ্কৃত নিয়ম সর্বত্র চলে না বটে, কিন্তু কোন না কোন নিয়ম চলে।

ইহার উপর আর নিয়মের রাজত্বে সংশয় স্থাপনের কোন উপায় থাকিতেছে না। কোন একটা নিয়ম আবিষ্কার করিলাম, যতদিন তাহার ব্যভিচারের দৃষ্টান্ত দেখিলাম না, বলিলাম—এই নিয়ম অনিবার্য ইহার ব্যভিচার নাই। যেদিন দেখিলাম, অমুক স্থানে আর সে নিয়ম চলিতেছে না, অমনি সংশোধনের

ব্যবস্থা! তখনই ভাষা বদলাইয়া নিয়ম সংশোধিতভাবে প্রকাশ করিলাম; বলিলাম—অহো এতদিন আমার ভুল হইয়াছিল; ঐ স্থানে ঐ নিয়ম, আর ঐ স্থানে এই নিয়ম। আগে যাহা নিয়ম বলিতেছিলাম, তাহা নিয়ম নহে; এখন যাহা দেখিতেছি তাহাই নিয়ম। প্রাকৃতিক নিয়মগুলি যেন ব্যাকরণের নিয়ম,—যেন ব্যাকরণের সূত্র। ইকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ সর্বত্র মুনি শব্দের মত, পতি শব্দ ও সখি শব্দ, এই দুইটি বাদ দিয়া। এখানে সাবেক নিয়মের যে ব্যভিচার ও ব্যতিক্রম দেখিতেছ, উহা প্রকৃত ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম নহে, উহা একটা নবাবিষ্কৃত অজ্ঞাতপূর্ব নিয়ম—এরূপ স্থানে এইরূপ ব্যভিচারই নিয়ম; ইহার উপর আর কথা নাই।

অর্থাৎ কিনা নিয়মের যতই ব্যভিচার দেখ না কেন, নিয়ম ভাঙ্গিয়াছি বলিবার উপায় নাই। জলে শোলা ভাসিতেছে, ইহাতে মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম ভাঙ্গিল কি? কখনও না, এখানে মাধ্যাকর্ষণ বর্তমান আছে, তবে জলের চাপে শোলাকে ডুবিতে দিতেছে না, এ স্থলে ইহাই নিয়ম। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে আমাদের দেশে বর্ষা হয়। এ বৎসর বর্ষা হইল না, তাহাতে নিয়ম ভাঙ্গিল কি? কখনই না এ বৎসর হিমালয়ে যথেষ্ট হিমপাত ঘটিয়াছে; অথবা আফ্রিকার উপকূলে এবার অতিবৃষ্টি ঘটিয়াছে: এবার ত এদেশে বর্ষা না হইবারই কথা; ঠিক ত নিয়মমত কাজই হইয়াছে। নিয়ম দেখা গেল, চুম্বকের কাঁটা উত্তরমুখে থাকে। পরেই দেখা গেল, ঠিক উত্তরমুখে থাকে না, একটু হেলিয়ে থাকে। আচ্ছা, উহাই ত নিয়ম। আবার কলিকাতায় যতটা হেলিয়া আছে, লন্ডন শহরে ততটা হেলিয়া নাই; না থাকিবারই কথা, উহাই ত নিয়ম। আবার কলিকাতায় এ বৎসর যতটা হেলিয়া আছে, ত্রিশ বৎসর পূর্বে ততটা হেলিয়া ছিল না। কি পাপ, উহাই ত নিয়ম? উহা চুম্বকের কাঁটা চিরকালই এক মুখে থাকিবে, এমন কি কথা আছে? উহা একটু একটু করিয়া প্রতি বৎসর সরিয়া যায়; দুইশত বৎসর বরাবরই দেখিতেছি, ঐরূপ সরিয়া যাইতেছে, উহাই ত নিয়ম। কাঁটা আবার থাকিয়া থাকিয়া নাচে, কাঁপে, স্পন্দিত হয়। ঠিকই ত। সময়ে সময়ে নাচাই ত নিয়ম। প্রতি এগার বৎসরে একবার উহার এইরূপ নর্তন-প্রবৃত্তি বাড়িয়া উঠে। আবার সূর্যবিম্বে যখন কলঙ্ক সংখ্যার বৃদ্ধি হয়, যখন মেরু প্রদেশে উদীচী ঊষার দীপ্তি প্রকাশ পায়, তখনও এই নর্তন-প্রবৃত্তি বাড়ে। বাড়িবেই ত ইহাই ত নিয়ম।

একটা নিয়ম আছে, আলোকের রশ্মি সরল রেখাক্রমে ঋজু পথে যায়; যতক্ষণ একই পদার্থের মধ্যে দিয়া চলে, ততক্ষণ বরাবর একই মুখে চলে; জানালা দিয়া রোদ্র আসিলে সম্মুখের দেয়ালে আলো পড়ে। ছিদ্রের ভিতরে

দিয়া চাহিলে সম্মুখের জিনিস দেখা যায়, আশেপাশের জিনিস দেখা যায় না, কাজেই বলিতে হইবে আলোক ঋজু পথে চলে। নতুবা ছায়া পড়িত না; চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণ ঘটিত না। অতএব আলোকের সোজা পথে যাওয়াই নিয়ম। কিন্তু সর্বত্রই কি এই নিয়ম? অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রের ভিতর দিয়া আলো গেলে দেখা যায় আলোক ঠিক সোজা পথে না গিয়া আশে-পাশে কিছু দূর পর্যন্ত যায়। শব্দ যেমন জানালার পথে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে চলে ও আশে-পাশে চলে সেইরূপ আলোকরশ্মিও সূক্ষ্ম ছিদ্রমধ্যে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে চলে ও আশে-পাশে চলে। এখন বলিতে হইবে, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম, এইরূপ ক্ষেত্রে আশে-পাশে যাওয়াই নিয়ম। বস্তুতঃ এ স্থলেও প্রাকৃতিক নিয়মের কোন লঙ্ঘন হয় নাই।

শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় এই। যাহা দেখিবে, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। যাহা এ পর্যন্ত দেখি নাই, তাহা নিয়ম নহে বলিয়া নিশ্চিত থাকিতে পারি; কিন্তু যে কোন সময়ে একটা অজ্ঞাতপূর্ব ঘটনা ঘটিয়া আমার নির্ধারিত প্রাকৃতিক নিয়মকে বিপর্যস্ত করিয়া দিতে পারে। কাজেই এটা প্রাকৃতিক নিয়ম, ওটা নিয়ম নহে, ইহা পূরা সাহসে বলাই দায়।

অথবা যাহা দেখিব, তাহাই যখন নিয়ম, তখন নিয়ম লঙ্ঘনের সম্ভাবনা কোথায়? চিরকাল সূর্য পূর্বে উঠে, দেখিয়া আসিতেছি; উহাই প্রাকৃতিক নিয়ম মনে করিয়া বসিয়া আছি; কেহ পশ্চিমে সূর্যোদয় বর্ণনা করিলে তাহাকে পাগল বলি। কিন্তু কাল প্রাতে যদি দুনিয়ার লোক দেখিতে পায়, সূর্যদেব পশ্চিমে উঠিলেন আর পূর্ব মুখে চলিতে লাগিলেন, তখন সে দিন হইতে উহাকেই প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া গণ্য করা হইবে। অবশ্য এরূপ ঘটনার সম্ভাবনা অত্যন্ত অল্প। কিন্তু যদি ঘটে পৃথিবীর সমস্ত বৈজ্ঞানিক একজোট হইয়া তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিবেন কি?

প্রকৃতি রাজ্যে নিয়মটা কিরূপ, তাহা কতক বোঝা গেল। তুমি সোজা চলিতেছ, ভাল, উহাই নিয়ম; বাঁকা চলিতেছ, বেশ কথা, উহাই নিয়ম। তুমি হাসিতেছ, নিয়মানুযায়ী; কাঁদিতেছ, তাহাতেও নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। যাহা ঘটে, তাহাই তখন নিয়ম, তখন নিয়মের ব্যভিচারের আর অবকাশ থাকিল কোথায়? কোন নিয়ম সোজা, কোন নিয়ম বা খুব জটিল। কোনটাতে বা ব্যভিচার দেখি না, কোনটাতে বা ব্যভিচার দেখি, কিন্তু বলি, ঐখানে ঐ ব্যভিচার থাকাই নিয়ম। কাজেই নিয়মের রাজ্য ছাড়িয়া যাইবার উপায় নাই।

ফলে জাগতিক ঘটনা পরম্পরার মধ্যে কতকগুলো সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ঘটনাগুলো একেবারে অসম্বদ্ধ বা শৃঙ্খলাশূন্য নহে। মানুষ যত দেখে, যত সূক্ষ্মভাবে দেখে, যত বিচার করিয়া দেখে ততই বিবিধ সম্বন্ধের আবি-

ষ্কার করিয়া থাকে। বহুকাল হইতে মানুষ দেখিয়া আসিতেছে সূর্য পূর্বে উঠে, নারিকেল ভূমিতে পড়ে, কাষ্ঠরূপী ইন্ধনযোগে প্রাকৃত অগ্নি উদ্দীপ্ত হয়, আর অন্নরূপী ইন্ধনযোগে জঠরাগ্নি নির্বাপিত হয়। এই সকল ঘটনার পরস্পর সম্বন্ধ মনুষ্য বহুকাল হইতে জানে। আলোক ও তড়িত প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির সম্পর্কে নানা তথ্য বিবিধ ঘটনার পরস্পর সম্বন্ধ, মনুষ্য অল্পদিন মাত্র জানিয়াছে। যত দেখে ততই শেখে, ততই জানে যতক্ষণ কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ-সীমায় না আইসে, ইন্দ্রিয়গোচর না হয়, ততক্ষণ তাহা অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। ইন্দ্রিয়গোচর হইলেই তৎসম্পর্কে একটা নূতন তথ্যের আবিষ্কার হয়। কিন্তু পূর্ব হইতে কে বলিতে পারে, কালি কোন্ নূতন নিয়মের আবিষ্কার হইবে? বিংশ শতাব্দীর শেষে মনুষ্যের জ্ঞানের সীমানা কোথায় পৌঁছিবে, আজ তাহা কে বলিতে পারে?

যাহা দেখিতেছি, যে সকল ঘটনা দেখিতেছি, তাহাদিগকে মিলাইয়া তাহাদের সাহচর্যগত ও পরম্পরাগত সম্পর্ক যাহা নিরূপণ করিতেছি, তাহাই যখন প্রাকৃতিক নিয়ম, তখন প্রকৃতিতে অনিয়মের সম্ভাবনা কোথায়? যাহা কিছু ঘটে, তাহা যতই অজ্ঞাতপূর্ব হউক না কেন, তাহা যতই অভিনব হউক না, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। কোন স্থলে কোন নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিলে সেই ব্যতিক্রমকেই সেখানে নিয়ম বলিতে হয়। কাজেই ব্রহ্মাণ্ড নিয়মের রাজ্য ইহাতে আবার বিস্ময়ের কথা কি? ইহাতে আনন্দে গদগদ হইবারই বা হেতু কি? আর নিয়মের শাসনে জগদ্‌যন্ত্র চলিতেছে মনে করিয়া একজন সৃষ্টি-ছাড়া নিয়ন্তার কল্পনা করিবারই বা অধিকার কোথায়? জগতে কিছু-না-কিছু ঘটিতেছে, এটার পর ওটা ঘটিতেছে, যাহা যেরূপে ঘটিতেছে, তাহাই নিয়ম, প্রাকৃতিক নিয়মের আর কোন তাৎপর্য নাই। এই নিয়ম দেখিয়া বিস্ময়ের কোন হেতু নাই। এই ঘটনাই বরং আশ্চর্য—একটা কিছু যে ঘটিতেছে, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। জগৎঘটনাটার প্রয়োজন কি ছিল, ইহা ঘটেই বা কেন, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। ইহার উত্তরে অজ্ঞানবাদী বলেন, জানি না, ভক্ত বলেন, ইহা কোন অঘটন-ঘটনাপটুর লীলা, বৈদান্তিক বলেন, আমি সেই অঘটন-ঘটনায় পটু—আমার ইহাতে আনন্দ, বৌদ্ধ একেবারে চুকাইয়া দেন ও বলেন, কিছুই ঘটে নাই।

সাহিত্যে খেলা

প্রমথ চৌধুরী

(১৮৬৮-১৯৪৬)

জগৎ-বিখ্যাত ফরাসী ভাস্কর রোঁদ্যা, যিনি নিতান্ত জড় প্রস্তরের দেহ থেকে অসংখ্য জীবিতপ্রায় দেবদানব কেটে বার করেছেন তিনিও, শুনতে পাই, যখন-তখন হাতে কাদা নিয়ে, আঙ্গুলের টিপে মাটির পুতুল তৈয়ের করে থাকেন। এই পুতুল গড়া হচ্ছে তাঁর খেলা। শুধু রোঁদ্যা কেন পৃথিবীর শিল্পীমাত্রেই এই শিল্পের খেলা খেলে থাকেন। যিনি গড়তে জানেন, তিনি শিবও গড়তে পারেন, বাঁদরও গড়তে পারেন। আমাদের সঙ্গে বড় বড় শিল্পী-দের তফাৎ এইটুকু যে. তাঁদের হাতে এক করতে আর হয় না। সম্ভবতঃ এই কারণে কলারাজ্যের মহাপুরুষদের যা-খুশী তাই করবার যে অধিকার আছে, ইতর শিল্পীদের সে অধিকার নেই। স্বর্গ হতে দেবতারা মধ্যে মধ্যে ভূতলে অবতীর্ণ হওয়াতে কেউ আপত্তি করেন না, কিন্তু মর্ত্যবাসীদের পক্ষে রসাতলে গমন করাটা বিশেষ নিন্দনীয়। অথচ একথা অস্বীকার করবার জো নাই যে, যখন এ জগতে দশটা দিক আছে তখন সেই সব দিকেই গতায়ত করবার প্রবৃত্তিটি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। মন উঁচুতেও উঠতে চায়, নিচুতেও নামতে চায়। বরং সত্য কথা বলতে গেলে সাধারণ লোকের মন স্বভাবতঃই যেখানে আছে তারই চারপাশে ঘুরে বেড়াতে চায়, উড়তেও চায় না ডুবতেও চায় না। কিন্তু সাধারণ লোকে সাধারণ লোককে কি ধর্ম, কি নীতি, কি কাব্য সকল রাজ্যেই অহরহ ডানায় ভর দিয়ে থাকতেই পরামর্শ দেয়। একটু উঁচুতে না চড়লে আমরা দর্শক এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর নয়ন-মন আকর্ষণ করতে পারি নে। বেদীতে না বসলে আমাদের উপদেশ কেউ মানে না, রঙ্গমঞ্চে না চড়লে আমাদের অভিনয় কেউ দেখে না, আর কাষ্ঠমঞ্চে না দাঁড়ালে আমাদের বক্তৃতা কেউ শোনে না। সুতরাং জনসাধারণের চোখের সম্মুখে থাকবার লোভে আমরা অগত্যা চব্বিশ ঘন্টা টঙে চড়ে থাকতে চাই, কিন্তু পারি নে। অনেকের পক্ষে নিজের আয়ত্তের বহির্ভূত উচ্চস্থানে উঠবার চেষ্টাই মহাপতনের কারন হয়। এসব কথা বলবার অর্থ এই যে, কষ্টকর হলেও আমাদের পক্ষে অবশ্য মহাজনদের পথ অনুসরণ করাই কর্তব্য। কিন্তু ডাইনে বাঁয়ে ছোটখাট গলি ঘুঁজিতে খেলাচ্ছলে প্রবেশ করবার যে অধিকার তাঁদের আছে, সে অধিকারে আমরা কেন বঞ্চিত হব। গান করতে গেলেই যে সুর তারায় চড়িয়ে রাখতে হবে,

কবিতা লিখতে হলেই যে মনের শুধু গভীর ও প্রখর ভাব প্রকাশ করতে হবে, এমন কোনো নিয়ম থাকা উচিত নয়। শিল্পরাজ্যে খেলা করবার প্রবৃত্তির ন্যায় অধিকারও বড়-ছোট সকলেরই সমান আছে। এমনকি, একথা বললেও অত্যুক্তি হয় না যে, এ পৃথিবীতে একমাত্র খেলার ময়দানে, ব্রাহ্মণ-শূদ্রের প্রভেদ নেই। রাজার ছেলের সঙ্গে দরিদ্রের ছেলেরও খেলায় যোগ দেবার অধিকার আছে। আমরা যদি একবার সাহস করে কেবলমাত্র খেলা করবার জন্য সাহিত্য জগতে প্রবেশ করি, তাহলে নির্বিবাদে সে জগতের রাজারাজড়ার দলে মিশে যাব। কোনোরূপ উচ্চ আশা নিয়ে সে ক্ষেত্রে উপস্থিত হলেই নিম্নশ্রেণীতে পড়ে যেতে হবে।

লেখকেরাও অবশ্য দশের কাছে হাততালির প্রত্যাশা রাখেন, বাহবা না পেলে মনঃক্ষুণ্ণ হন। কেননা তাঁরাই হচ্ছেন যথার্থ সামাজিক জীব, বাদবাকি সকলে কেবল মাত্র পারিবারিক। বিশ্বমানবের মনের সঙ্গে নিত্যনূতন সম্বন্ধ পাতানোই হচ্ছে কবি-মনের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম। এমনকি, কবির আপন মনের গোপন কথাটিও গীতি-কবিতাতে রঙ্গভূমির স্বগতোক্তিস্বরূপেই উচ্চারিত হয়, যাতে করে সেই মর্মকথা হাজার লোকের কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু উচ্চমঞ্চে আরোহণ করে উচ্চৈস্বরে উচ্চবাচ্য না করলে যে জনসাধারণের নয়ন-মন আকর্ষণ করা যায় না, এমন কোনো কথা নেই। সাহিত্যজগতে যাঁদের খেলা করবার প্রবৃত্তি আছে, সাহস আছে ও ক্ষমতা আছে, মানুষের নয়ন-মন আকর্ষণ করবার সুযোগ বিশেষ করে তাঁদের কপালেই ঘটে। মানুষ যে খেলা দেখতে ভালোবাসে তার পরিচয় তো আমরা এই জড় সমাজেও নিত্য পাই। টাউনহলে বক্তৃতা শুনতেই বা ক'জন যায় আর গড়ের মাঠে ফুটবল খেলা দেখতেই বা ক'জন যায়। অথচ এ কথাও সত্য যে টাউনহলের বক্তৃতার উদ্দেশ্য অতি মহৎ—ভারত উদ্ধার আর গড়ের মাঠের খেলোয়াড়দের ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ি আগাগোড়া অর্থশূন্য এবং উদ্দেশ্যবিহীন। আসল কথা এই যে, মানুষের দেহ-মনের সকল প্রকার ক্রিয়ার মধ্যে ক্রীড়া শ্রেষ্ঠ, কেননা তা উদ্দেশ্যহীন। মানুষে যখন খেলা করে, তখন সে এক আনন্দ ব্যতীত অপর কোনো ফলের আকাঙ্ক্ষা রাখে না। যে খেলার ভিতর আনন্দ নেই কিন্তু উপরি পাওনার আশা আছে, তার নাম খেলা নয়, জুয়াখেলা। ও ব্যাপার সাহিত্যে চলে না, কেননা ধর্মতঃ জুয়াখেলা লক্ষ্মীপূজার অঙ্গ, সরস্বতীপূজার নয়। এবং যেহেতু খেলার আনন্দ নিরর্থক অর্থাৎ অর্থগত নয় সে কারণে তা কারও নিজস্ব হতে পারে না। এ আনন্দে সকলেরই অধিকার সমান।

সুতরাং সাহিত্যে খেলা করবার অধিকার যে আমাদের আছে, শুধু তাই নয়, স্বার্থ এবং পরার্থ এ দুয়ের যুগপৎ সাধনের জন্য মনোজগতে খেলা করাই হচ্ছে আমাদের পক্ষে সর্বপ্রধান কর্তব্য। যে লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে ফলের চাষ করতে ব্রতী হন, যিনি কোনোরূপ কার্য-উদ্ধারের অভিপ্রায়ে লেখনী ধারণ করেন, তিনি গীতের মর্মও বোঝেন না, গীতার ধর্মও বোঝেন না। কেননা খেলা হচ্ছে জীবজগতে একমাত্র নিষ্কাম কর্ম, অতএব মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়। স্বয়ং ভগবান বলেছেন, যদিচ তাঁর কোনই অভাব নেই তবুও তিনি এই বিশ্ব সৃজন করেছেন, অর্থাৎ সৃষ্টি তাঁর লীলা মাত্র। কবির সৃষ্টিও এই বিশ্ব সৃষ্টির অনুরূপ, সে সৃজনের মূলে কোনো অভাব দূর করবার অভিপ্রায় নেই—সে সৃষ্টির মূল অন্তরাত্মার স্ফূর্তি এবং তার ফল আনন্দ। এক কথায় সাহিত্য-সৃষ্টি জীবাত্মার লীলামাত্র এবং সে বিশ্বলীলার অন্তর্ভূত। কেননা জীবাত্মা পরমাত্মার অঙ্গ এবং অংশ।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারো মনোরঞ্জন করা নয়; এ দুয়ের ভিতর যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে, সেইটি ভুলে গেলেই লেখকেরা নিজে খেলা না করে পরের জন্য খেলনা তৈরী করতে বসেন। সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ বাংলাদেশে আজ দুর্লভ নয়। কাব্যের ঝুমঝুমি, বিজ্ঞানের চুষি কাঠি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙালাঠি, ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল, নীতির টিনের ভেঁপু, এবং ধর্মের জয়ঢাক—এইসব জিনিসে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে। সাহিত্যরাজ্যে খেলনা পেয়ে পাঠকের মনতুষ্টি হতে পারে, কিন্তু তা গড়ে লেখকের মনতুষ্টি হতে পারে না। কারণ পাঠক সমাজ যে-খেলনা আজ আদর করে, কাল সেটিকে ভেঙ্গে ফেলে—সে প্রাচ্যই হোক পাশ্চাত্যই হোক, কাশীরই হোক আর জার্মানির হোক, দুদিন ধরে তা কারও মনোরঞ্জন করতে পারে না। আমি জানি যে, পাঠকসমাজকে আনন্দ দিতে গেলে তাঁরা প্রায়শঃই বেদনাবোধ করে থাকেন। কিন্তু এতে ভয় পাবার কিছুই নেই; কেননা কাব্য জগতে যার নাম আনন্দ, তারই নাম বেদনা।

অপর পক্ষে এ যুগে পাঠক হচ্ছে জনসাধারণ, তাঁদের মনোরঞ্জন করতে হলে আমাদের অতি সস্তা খেলনা গড়তে হবে, নইলে তা বাজারে কাটবে না। এবং সস্তা করার অর্থ খেলো করা। বৈশ্য লেখকের পক্ষেই শূদ্র পাঠকের মনোরঞ্জন করা সংগত। অতএব সাহিত্যে আর যাই কর-না কেন পাঠক-সমাজের মনোরঞ্জন করবার চেষ্টা করো না।

তবে কি সাহিত্যের উদ্দেশ্য লোককে শিক্ষা দেওয়া?—অবশ্য নয়। কেননা কবির মতিগতি শিক্ষকের মতিগতির সম্পূর্ণ বিপরীত। স্কুল না বন্ধ

হলে যে খেলার সময় আসে না, এ তো সকলেরই জানা কথা। কিন্তু সাহিত্য-রচনা যে আত্মার লীলা, একথা শিক্ষকেরা স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। সুতরাং শিক্ষা ও সাহিত্যের ধর্মকর্ম যে এক নয়, এ সত্যটি একটু স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেওয়া আবশ্যক। প্রথমতঃ শিক্ষা হচ্ছে সেই বস্তু যা লোকে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হয়, অপর পক্ষে কাব্যরস লোকে শুধু স্বেচ্ছায় নয়, সানন্দে পান করে, কেননা শাস্ত্র মতে সে রস অমৃত। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মনকে বিশ্বের খবর জানানো, সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানুষের মনকে জাগানো, কাব্য যে সংবাদপত্র নয়, সেকথা সকলেই জানেন। তৃতীয়তঃ অপরের মনের অভাব পূর্ণ করার উদ্দেশ্যেই শিক্ষকের হস্তে শিক্ষা জন্ম লাভ করছে, কিন্তু কবির নিজের মনের পরিপূর্ণতা হতেই সাহিত্যের উৎপত্তি। সাহিত্যের উদ্দেশ্য যে আনন্দদান করা, শিক্ষা দান করা নয়, একটি উদাহরণের সাহায্যে তার অকাট্য প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। বাল্মীকি আদিতে মুনি ঋষিদের জন্য রামায়ন রচনা করেছিলেন জনগনের জন্য নয়। এ কথা বলা বাহুল্য যে, বড় বড় মুনি ঋষিদের কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু রামায়ণ শ্রবণ করে মহর্ষিরাও যে কতদূর আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন তার প্রমাণ তারা কুশীলবকে তাদের যথাসর্বস্ব, এমন কি কৌপীন পর্যন্ত, পেলা দিয়েছিলেন। রামায়ণ কাব্য হিসাবে যে অমর এবং জনসাধারণ আজও যে তার শ্রবণে পঠনে আনন্দ উপভোগ করে তার একমাত্র কারণ, আনন্দের ধর্মই এই যে তা সংক্রামক। অপর পক্ষে লাখে একজনও যে যোগ-বাশিষ্ট রামায়ণের ছায়া মাড়ান না তার কারণ সে বস্তু লোককে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল, আনন্দ দেবার জন্য নয়। আসল কথা এই যে, সাহিত্য কস্মিনকালেও স্কুলমাস্টারির ভার নেয়নি। এতে দুঃখ করবার কোন কারণ নেই। দুঃখের বিষয় এই যে, স্কুলমাস্টারেরা একালে সাহিত্যের ভার নিয়েছেন।

কাব্যরস নামক অমৃত যে আমাদের অরুচি জন্মেছে, তার জন্য দায়ী এ যুগের স্কুল এবং তার মাষ্টার। কাব্য পড়বার ও বুঝবার জিনিস, কিন্তু স্কুলমাষ্টারের কাজ হচ্ছে এই পড়ানো ও বুঝানো। লেখক এবং পাঠকের মধ্যে এখন স্কুলমাস্টার দন্ডায়মান। এই মধ্যস্থদের কৃপায় আমাদের সঙ্গে কবির মিলন দূরে থাক, চার চক্ষুর মিলনও ঘটে না। স্কুলঘরে আমরা কাব্যের রূপ দেখতে পাইনে, শুধু তার গুণ শুনি। টীকা ভাষ্যে প্রসাদে আমরা কাব্য সম্বন্ধে সকল নিগূঢ় তথ্য জানি, কিন্তু সে যে কি বস্তু তা চিনিনে। আমাদের শিক্ষকদের প্রাসাদে আমাদের এ জ্ঞান লাভ হয়েছে যে, পাথুরে কয়লা হীরার সবর্ণ না হলেও সগোত্র; অপর পক্ষ হীরক ও কাচ যমজ হলেও সহোদর নয়। এর একের জন্ম পৃথিবীর গর্ভে, অপরটি মানুষের হাতে এবং এ উভয়ের

ভিতর এক দা-কুমড়ার সম্বন্ধ ব্যতীত অপর কোনো সম্বন্ধ নেই। অথচ এত জ্ঞান সত্ত্বেও আমরা সাহিত্যে কাচকে হীরা এবং হীরাকে কাচ বলে নিত্য ভুল করি, এবং হীরা ও কয়লাকে একশ্রেণীভুক্ত করতে তিলমাত্রও দ্বিধা করিনে, কেননা ওরূপ করা যে সঙ্গত, তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আমাদের মুখস্থ আছে। সাহিত্য শিক্ষার ভার নেয় না, কেননা মনোজগতে শিক্ষকের কাজ হচ্ছে কবির কাজের ঠিক উলটো। কারণ কবির কাজ হচ্ছে কাব্য সৃষ্টি করা, আর শিক্ষকের কাজ হচ্ছে প্রথমে তা বধ করা, তারপরে তার শবচ্ছেদ করা, এবং ঐ উপায়ে তার তত্ত্ব আবিষ্কার করা ও প্রচার করা। এইসব কারণে নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, কারও মনোরঞ্জন করাও সাহিত্যের কাজ নয়, কাউকে শিক্ষা দেওয়াও নয়। সাহিত্য ছেলের হাতের খেলাও নয়, গুরুর হাতের বেতও নয়। বিচারের সাহায্যে এই মাত্রই প্রমাণ করা যায়। তবে বস্তু যে কি, তার জ্ঞান অনুভূতি-সাপেক্ষ, তর্কসাপেক্ষ নয়। সাহিত্যে মানবাত্মা খেলা করে এবং সেই খেলার আনন্দ উপভোগ করে। এ কথার অর্থ যদি স্পষ্ট না হয় তাহলে কোন সুদীর্ঘ ব্যাখ্যার দ্বারা স্পষ্টতর করা আমাদের অসাধ্য।

কথার কথা

প্রমথ চৌধুরী

সম্প্রতি বাংলা ব্যাকরণ নিয়ে আমাদের ক্ষুদ্র সাহিত্য সমাজে একটা বড় রকম বিবাদের সূত্রপাত হয়েছে। আমি বৈয়াকরণ নই, হবারও কোন ইচ্ছে নেই। আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত লাইব্রেরী মুসলমানেরা ভস্মসাৎ করেছে বলে সাধারণতঃ লোকে দুঃখ করে থাকে, কিন্তু প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক Montaigne মঁতেইন্‌-এর মনোভাব এই যে, ও ছাই গেছে বাঁচা গেছে! কেননা সেখানে অভিধান ও ব্যাকরণের লক্ষ গ্রন্থ ছিল। বাবা! শুধু কথার উপর এত কথা! আমিও মঁতেইন্‌-এর মতে সায় দিই। যেহেতু আমি ব্যাকরনের কোন ধার ধারি নে, সুতরাং কোন ঋষিঋণমুক্ত হবার জন্য এ বিচারে আমার যোগ দেবার কোন আবশ্যক ছিলনা। কিন্তু তর্ক জিনিসটে আমাদের দেশে তরল পদার্থ, দেখতে-না-দেখতে বিষয় হতে বিষয়ান্তরে অবলীলাক্রমে গড়িয়ে যাওয়াটাই তার স্বভাব। তর্কটা শুরু হয়েছিল ব্যাকরণ নিয়ে, এখন মাঝামাঝি অবস্থায় অলংকারশাস্ত্রে এসে পৌঁচেছে, শেষ হবে বোধ হয় বৈরাগ্যে। সে যাই হোক পন্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় এই মত প্রচার করেছেন যে, আমরা লেখায় যত অধিক সংস্কৃত শব্দ আমদানি করব, ততই আমাদের সাহিত্যের মঙ্গল। আমার ইচ্ছে বাংলা সাহিত্য বাংলা ভাষাতেই লেখা হয়। দুর্বলের স্বভাব, নিজের পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে না। বাইরের একটা আশ্রয় আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। আমরা নিজের উন্নতির জন্য পরের উপর নির্ভর করি! স্বদেশের উন্নতির জন্যে আমরা বিদেশীর মুখাপেক্ষী হয়ে রয়েছি, এবং একই কারণে নিজ ভাষায় শ্রী বৃদ্ধির জন্যে অপর ভাষার সাহায্য ভিক্ষা করি। অপর জাতি অপর ভাষা যতই শ্রেষ্ঠ হোক না কেন, তার অঞ্চল ধরে বেড়ানোটা কি মনুষ্যত্বের পরিচয় দেয়? আমি বলি আমরা নিজেকে একবার পরীক্ষা করে দেখিনা কেন। ফল কি হবে কেউ বলতে পারে না, কারণ কোন সন্দেহ নেই যে সে পরীক্ষা আমরা পূর্বে কখনো করি নি। স্বাধীন হবার চেষ্টাতেও সুখ আছে। যাক ওসব বাজে কথা। আমি বাংলা ভাষা ভালোবাসি, সংস্কৃতকে ভক্তি করি। কিন্তু এ শাস্ত্র মানি নে যে, যাকে শ্রদ্ধা করি তারই শ্রাদ্ধ করতে হবে। আমার মত ঠিক কিংবা শাস্ত্রী মহাশয়ের মত ঠিক, সে বিচার করতে আমি বসিনি। শুধু তিনি যে যুক্তি দ্বারা নিজের মত সমর্থন করতে উদ্যত হয়েছেন, তাই আমি যাচিয়ে দেখতে চাই।

কেউ হয়তো প্রথমেই জিজ্ঞাসা করতে পারেন, বাংলা ভাষা কাকে বলে। বাঙালির মুখে এ প্রশ্ন শোভা পায় না। এ প্রশ্নের সহজ উত্তর কি এই নয় যে,

যে ভাষা আমরা সকলে জানি শুনি বুঝি, যে ভাষায় আমরা ভাবনা-চিন্তা সুখ-দুঃখ বিনা আয়াসে, বিনা ক্লেশে বহুকাল হতে প্রকাশ করে আসছি এবং সম্ভবতঃ আরও বহুকাল পর্যন্ত প্রকাশ করব, সেই ভাষাই বাংলা ভাষা ? বাংলা ভাষার অস্তিত্ব প্রকৃতিবাদ অভিধানের ভিতর নয়; বাঙালির মুখে। কিন্তু অনেকে দেখতে পাই, এই অতি সহজ কথাটা স্বীকার করতে নিতান্ত কুন্ঠিত। শুনতে পাই কোনো কোনো শাস্ত্রজ্ঞ মৌলবী বলে থাকেন যে দিল্লীর বাদ্শাহ যখন উর্দুভাষা সৃষ্টি করতে বসলেন, তখন তাঁর অভিপ্রায় ছিল একেবার খাঁটি ফারসি ভাষা তৈয়ার করা, কিন্তু বেচারা হিন্দুদের কান্নাকাটিতে কৃপাপরবশ হয়ে হিন্দি ভাষার কতকগুলো কথা উর্দুতে ঢুকতে দিয়েছিলেন। আমাদের মধ্যেও হয়তো শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিতদের বিশ্বাস যে, আদিশূরের আদি পুরুষ যখন গৌড়-ভাষা সৃষ্টি করতে উদ্যত হলেন, তখন তার সংকল্প ছিল যে ভাষাটাকে বিলকুল সংস্কৃত ভাষা করে তোলেন, শুধু গৌড়বাসীদের প্রতি পরম অনুকম্পাবশতঃ তাদের ভাষার গুটিকতক কথা বাংলা ভাষায় ব্যবহার করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। এখন যাঁরা সংস্কৃতবহুল ভাষা ব্যবহার করবার পক্ষপাতী তাঁরা ঐ যে গোড়ায় গলদ হয়েছিল তাই শুধরে নেবার জন্যে উৎকন্ঠিত হয়েছেন। আমাদের ভাষায় অনেক অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ আছে, সেইগুলিকেই ভাষার গোড়া পত্তন ধরে নিয়ে, তার উপর যত পার আরও সংস্কৃত শব্দ চাপাও। কালক্রমে বাংলায় ও সংস্কৃতে দ্বৈতভাব থাকবেনা। আসলে জ্ঞানী লোকের কাছে এখনো নেই। মাতৃভাষার মায়ায় বদ্ধ বলে, আমরা সংস্কৃত-বাংলায় অদ্বৈতবাদী হয়ে উঠতে পারছি নে। বাংলায় ফারসি কথার সংখ্যাও বড় কম নয়, ভাগ্যক্রমে ফারসি-পড়া বাঙালির সংখ্যা বড় কম। নইলে সম্ভবতঃ তাঁরা বলতেন, বাংলাকে ফারসিবহুল করে তোলেন। মধ্যে থেকে আমাদের মা সরস্বতী, কাশী যাই কি মক্কা যাই, এই ভেবে আকুল হতেন। এক-একবার মনে হয় ও উভয় সংকট ছিলো ভালো, কারণ একেবার পন্ডিতমন্ডলীর হাতে পড়ে মার আশু কাশী-প্রাপ্তি হবারই অধিক সম্ভাবনা।

এই প্রসঙ্গে পন্ডিত প্রবর সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বক্তব্য এই যে সাহিত্যের উৎপত্তি মানুষের অমর হবার ইচ্ছায়। যা-কিছু বর্তমান আছে, তার কুলজি লিখতে গেলেই গোড়ার দিকটে গোঁজামিল দিয়ে সারতে হয়। বড় বড় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক, যথা শংকর স্পেন্সার প্রভৃতিও ঐ উপায় অবলম্বন করেছেন। সুতরাং কোনো জিনিসের উৎপত্তির মূল নির্ণয় করতে যাওয়াটা বৃথা পরিশ্রম। কিন্তু এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, আর যা হতেই হোক, অমর হবার ইচ্ছা থেকে সাহিত্যের উৎপত্তি হয়নি। প্রথমতঃ অমরত্বের ঝুঁকি আমরা সকলেই সামলাতে পারি নে, কিন্তু কলম চালাবার জন্য আমাদের অনেকেরই আঙুল নিস্‌পিস্ করে। যদি ভাল-মন্দ-মাঝারি আমাদের প্রতি

কথা প্রতি কাজে চিরস্থায়ী হবার তিলমাত্র সম্ভাবনা থাকত তাহলে মনে করে দেখুন তো আমরা ক'জনে মুখ খুলতে কিংবা হাত তুলতে সাহসী হতুম ? অমরত্বের বিভীষিকা চোখের উপর থাকলে, আমরা যা perfect তা ব্যতীত কিছু বলতে কিংবা করতে রাজি হতুম না। আর আমরা সকলেই মনে মনে জানি যে, আমাদের অতি ভালো কাজ, অতি ভালো কথাও perfection-এর অনেক নীচে। আসল কথা মৃত্যু আছে বলেই বেঁচে সুখ। পুণ্যক্ষয় হবার পরে আবার মর্ত্যালোকে ফিরে আসবার সম্ভাবনা আছে বলেই দেবতারা অমর-পুরীতে স্ফূর্তিতে বাস করেন, তা না হলে স্বর্গেও তাদের অসহ্য হত। সে যাই হোক, আমরা মানুষ, দেবতা নই; সুতরাং আমার মুখের কথা দৈববাণী হবে, এ ইচ্ছে আমাদের মনে স্বাভাবিক নয়।

দ্বিতীয়তঃ, যদি কেউ শুধু অমর হবার জন্য লিখব, এই কঠিন পণ করে বসেন, তাহলে সে ইচ্ছা সফল হবার আশা কত কম বুঝতে পারলে তিনি যদি বুদ্ধিমান হন তাহলে লেখা হতে নিশ্চয়ই নিবৃত্ত হবেন। কারণ সকলেই জানি যে হাজারে ন'শ নিরানব্বই জনের সরস্বতী মৃতবৎসা। তাছাড়া সাহিত্য জগতে মড়ক অষ্টপ্রহর লেগে রয়েছে। লাখে এক বাঁচে, বাদবাকির প্রাণ দু-দণ্ডের জন্যও নয়। চরক পরামর্শ দিয়েছেন, যে দেশে মহামারীর প্রকোপ, সে দেশ ছেড়ে পলায়ন করাই কর্তব্য। অমর ইচ্ছা ও আশায়, কে সে রাজ্যে প্রবেশ করতে চায় ?

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আরও বক্তব্য এই যে, জীবন্ত ভাষায় ব্যাকরণ করতে নেই, তাহলেই নির্ঘাত মরণ। সংস্কৃত মৃত ভাষা, কারণ ব্যাকরণের নাগপাশে বদ্ধ হয়ে সংস্কৃত প্রাণত্যাগ করেছে। আরও বক্তব্য এই যে মুখের ভাষার ব্যাকরণ নেই, কিন্তু লিখিত ভাষায় ব্যাকরণ নইলে চলে না। প্রমাণ —সংস্কৃত শুধু অমরত্ব লাভ করেছে, পালি প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষা একেবারে চিরকালের জন্য মরে গেছে; অর্থাৎ, এককথায় বলতে গেলে, যে-কোনো ভাষারই হোক না কেন, চিরকালের জন্য বাঁচতে হলে আগে মরা দরকার। তাই যদি হয়, তাহলে বাংলা যদি ব্যাকরণের দড়ি গলায় দিয়ে আত্মহত্যা করতে চায়, তাতে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আপত্তি কি। তার মতানুসারে তো যমের দুয়োর দিয়ে অমরপুরীতে ঢুকতে হয়। তিনি আরও বলেন যে, পালি প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষায় হাজার হাজার গ্রন্থ রচিত হয়েছে, কিন্তু প্রাকৃত সংস্কৃত নয় বলে পালি প্রভৃতি ভাষা লুপ্ত হয়ে গেছে। অতএব বাংলা যতটা সংস্কৃতের কাছাকাছি নিয়ে আসতে পার, ততই তার মঙ্গল। যদি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মত সত্য হয়, তাহলে সংস্কৃতবহুল বাংলায় লেখা কেন, একেবারে সংস্কৃত ভাষাতেই তো আমাদের লেখা কর্তব্য। কারণ, তাহলে অমর হবার বিষয়ে আর

কোন সন্দেহ থাকে না। কিন্তু একটি কথা ভালো বুঝতে পারছিনে; পালি প্রভৃতি ভাষা মৃত সত্য, কিন্তু সংস্কৃত কি মৃত নয়? ও দেবভাষা অমর হতে পারে, কিন্তু ইহলোকে নয়। এ সংসারে মৃত্যুর হাত কেউ এড়াতে পারে না; পালিও পারে নি, সংস্কৃতও পারে নি, আমাদের মৃতদেহ স্কন্ধে নিয়ে বেড়াতে হবে, বাংলার উপর এ কঠিন পরিশ্রমের বিধান কেন। বাংলার প্রাণ একটুখানি, অতখানি চাপ সইবে না।

এ বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তব্য যদি ভুল না বুঝে থাকি, তাহলে তাঁর মত সংক্ষেপে এই দাঁড়ায় যে, বাংলাকে প্রায় সংস্কৃত করে আনলে আসামি, হিন্দুস্থানি প্রভৃতি বিদেশী লোকদের পক্ষে বঙ্গভাষা শিক্ষাটা অতি সহজসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠবে; দ্বিতীয়তঃ, অন্যভাষার যে সুবিধাটুকু নেই, বাংলার তা আছে—যে-কোনো সংস্কৃত কথা যেখানে হোক লেখায় বসিয়ে দিলে বাংলা ভাষার বাংলাত্ব নষ্ট হয় না—অর্থাৎ যারা আমাদের ভাষা জানেন না, তাঁরা যাতে সহজে বুঝতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে, সাধারণ বাঙালির পক্ষে আমাদের লিখিত ভাষা দুর্বোধ্য করে তুলতে হবে। কথাটা এতই অদ্ভুত যে এর কি উত্তর দেব ভেবে পাওয়া যায় না; সুতরাং তাঁর অপর মতটি ঠিক কিনা দেখা যাক। আমাদের দেশে ছোট ছেলেদের বিশ্বাস যে, বাংলা কথার পিছনে অনুস্বর জুড়ে দিলে সংস্কৃত হয়; আর প্রাপ্ত বয়স্ক লোকদের মত যে, সংস্কৃত কথার অনুস্বর বিসর্গ ছেঁটে দিলে বাংলা হয়। দুটো বিশ্বাসই সমান সত্য। বাঁদরের লেজ কেটে দিলেই কি মানুষ হয়? শাস্ত্রী মহাশয় উদাহরণ স্বরূপে বলেছেন, হিন্দিতে 'ঘরমে যায়েগা' চলে, কিন্তু 'গৃহমে যায়েগা' চলে না—ওটা ভুল হিন্দি নয়। কিন্তু বাংলায় ঘরের বদলে গৃহ যেখানে-সেখানে ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ সকল ভাষার একটা নিয়ম আছে, শুধু বাংলা ভাষার প্রধান গুণ যে, বাঙালি কথায় লেখায় যথেচ্ছাচারী হতে পারে। শাস্ত্রী মহাশয়ের নির্বাচিত কথা দিয়েই তাঁর ও ভুল ভাঙ্গিয়ে দেওয়া যায়: 'ঘরের ছেলে ঘরে যাও, ঘরের ভাত বেশী করে খেয়ো', এই বাক্যটি হতে কোথাও 'ঘর' তুলে দিয়ে 'গৃহ' স্থাপন করে দেখুন তো কানেই বা কেমন শোনায়, আর মনেই বা কত পরিষ্কার হয়।

আসল কথাটি কি এই নয় যে, লিখিত ভাষায় আর মুখের ভাষায় মূলে কোনো প্রভেদ নেই। ভাষা দুয়েরই এক শুধু প্রকাশের উপায় ভিন্ন। এক দিকে স্বরের সাহায্যে, অপরদিকে অক্ষরের সাহায্যে। বাণীর বসতি রসনায়। শুধু মুখের কথাই জীবন্ত। যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা কই সে ভাষায় লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ পায়। আমাদের প্রধান চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত কথায় ও লেখায় ঐক্য রক্ষা করা, ঐক্য নষ্ট করা নয়। ভাষা মানুষের মুখ

হতে কলমের মুখে আসে, কলমের মুখ হতে মানুষের মুখে নয়। উল্টোটা চেষ্টা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে। কেউ কেউ বলেন যে, আমাদের ভাবের ঐশ্বর্য এতটা বেড়ে গেছে যে বাপ-ঠাকুরদাদার ভাষার ভিতর তা আর ধরে রাখা যায় না। কথাটা ঠিক হতে পারে, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তার বড় একটা প্রমাণ পাওয়া যায় না। কণাদের মতে 'অভাব' একটা পদার্থ'। আমি হিন্দুসন্তান, কাজেই আমাকে বৈশেষিক দর্শন মানতে হয়; সেই কারণেই আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, প্রচলিত বাংলা সাহিত্যেও অনেকটা পদার্থ আছে। ইংরেজী সাহিত্যের ভাব, সংস্কৃত ভাষার শব্দ ও বাংলা ভাষার ব্যাকরণ—এই তিন চিজ মিলিয়ে যে খিচুড়ি তৈয়ের করি তাকেই আমরা বাংলা সাহিত্য বলে থাকি। বলা বাহুল্য, ইংরেজী না জানলে তার ভাব বুঝা যায় না; আর সংস্কৃত না জানলে তার ভাষা বোঝা যায় না। আমার এক এক সময়ে সন্দেহ হয় যে, হয়ত বিদেশের ভাব ও পুরাকালের ভাষা, এই দুয়ের আওতার ভিতর পড়ে বাংলা সাহিত্য ফুটে উঠতে পারছে না। এ-কথা অবশ্য মানি যে, আমাদের ভাষায় কতক পরিমানে নূতন কথা আনবার দরকার আছে। যার জীবন আছে, তারই প্রতিদিন খোরাক যোগাতে হবে। আর আমাদের ভাষার দেহপুষ্টি করতে হলে প্রধানতঃ অমরকোষ থেকে নতুন কথা টেনে আনতে হবে। কিন্তু যিনি নূতন সংস্কৃত কথা ব্যবহার করবেন তাঁর এটিই মনে রাখা উচিত যে, তাঁর আবার নতুন করে প্রতি কথাটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হবে তা যদি না পারেন তাহলে বঙ্গ-সরস্বতীর কানে শুধু পরের সোনা পরানো হবে। বিচার না করে একরাশ সংস্কৃত শব্দ জড়ো করলেই ভাষারও শ্রীবৃদ্ধি হবে না, সাহিত্যেরও গৌরব বাড়বে না, মনোভাবও পরিষ্কার করে ব্যক্ত করা হবে না। ভাষার এখন শানিয়ে ধার বার করা আবশ্যক, ভার বাড়ানো নয়। যে কথাটা নিতান্ত না হলে নয়, সেটি যেখান থেকে পার নিয়ে এস, যদি নিজের ভাষার ভিতর তাকে খাপ খাওয়াতে পার। কিন্তু তার বেশী ভিক্ষে ধার কিংবা চুরি করে এন না। ভগবান পবন নন্দন বিশল্যকরনী আনতে গিয়ে আস্ত গন্ধমাদন যে সমূল উৎপাটন করে এনেছিলেন, তাতে তার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় দেননি।

অর্ধাঙ্গী

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত্ হোসেন

(১৮৮০-১৯৩২)

কোন রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে প্রথমে রোগের অবস্থা জানা আবশ্যক। তাই অবলাজাতির উন্নতির পথ আবিষ্কার করিবার পূর্বে তাহাদের অবনতির চিত্র দেখাইতে হয়। আমি "স্ত্রীজাতির অবনতি" শীর্ষক প্রবন্ধে ভগ্নীদিগকে জানাইয়াছি যে, আমাদের একটা রোগ আছে—দাসত্ব ; সে রোগের কারণ এবং অবস্থা কতক পরিমানে ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। এক্ষণে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব, সেই রোগ হওয়ায় আমাদের সামাজিক অবস্থা কেমন বিকৃত হইয়াছে। ঔষধ পথ্যের বিধান স্থানান্তরে দেওয়া হইবে।

এইখানে গোঁড়া পর্দাপ্রিয় ভগ্নীদের অবগতির জন্য দু-একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক বোধ করি। আমি অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হই নাই। কেহ যদি আমার "স্ত্রীজাতির অবনতি" প্রবন্ধে পর্দা বিদ্বেষ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য দেখিতে না পান তবে আমাকে মনে করিতে হইবে, আমি নিজের মনোভাব উত্তমরূপে ব্যক্ত করিতে পারি নাই, অথবা তিনি প্রবন্ধটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন নাই। সে প্রবন্ধে প্রায় সমগ্র নারীজাতির উল্লেখ আছে। সকল সমাজের মহিলাগণই কি অবরোধ বন্দিনী থাকেন ? অথবা তাঁহারা পর্দানশীন নহেন বলিয়া কি তাহাদিগকে সম্পূর্ণ উন্নত বলিয়াছি ? আমি মানসিক দাসত্বের (**enslaved** মনের) আলোচনা করিয়াছি।

কোন একটা নূতন কাজ করিতে গেলে সমাজ প্রথমতঃ গোলযোগ উপস্থিত করে, এবং পরে সেই নূতন চালচলন সহিয়া লয়, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ পার্সী মহিলাদের পরিবর্তিত অবস্থার উল্লেখ করিয়াছি। পূর্বে তাঁহারা ছত্র ব্যবহারেও অধিকারিণী ছিলেন না। তারপর তাঁহাদের বাড়াবাড়ীটা সীমা লংঘন করিয়াছে, তবুত পৃথিবী ধ্বংস হয় নাই। এখন পার্সী মহিলাদের পর্দামোচন হইয়াছে সত্য কিন্তু মানসিক দাসত্ব মোচন হইয়াছে কি ? অবশ্যই হয় নাই। আর ঐ যে পর্দা ছাড়িয়াছেন, তাহা দ্বারা তাহাদের স্বকীয় বুদ্ধি বিবেচনার ত কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। পার্সী পুরুষগণ কেবল অন্ধভাবে বিলাতী সভ্যতার অনুকরণ করিতে যাইয়া স্ত্রীদিগকে পর্দার বাহিরে আনিয়াছেন, উহাতে অবলাদের জীবনীশক্তির ত কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না—তাঁহারা যে জড়পদার্থ, সেই জড়পদার্থই আছেন। পুরুষ যখন তাঁহাদিগকে

অন্তঃপুরে রাখিতেন তাঁহারা তখন সেইখানেই থাকিতেন। আবার পুরুষ যখন তাঁহাদের "নাকের দাড়ি" ধরিয়া টানিয়া তাঁহাদিগকে মাঠে বাহির করিয়াছেন, তখনই তাঁহারা পর্দার বাহির হইয়াছেন! ইহাতে রমণীকূলের বাহাদুরী কি? ঐরূপ পর্দা বিরোধ কখনই প্রশংসনীয় নহে।

কলম্বস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করিতে কৃতসংকল্প হন, তখন লোকে তাহাকে বাতুল বলে নাই কি? নারী আপন স্বত্ব স্বামিত্ব ভুলিয়া আপনাকে নরের ন্যায় শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে চাহে, ইহাও বাতুলতা বই আর কি?

পুরুষগণ স্ত্রীজাতির প্রতি যতটুকু সম্মান প্রদর্শন করেন, তাহাতে আমরা সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইতে পারি না। লোকে কালী শীতলা প্রভৃতি রাক্ষস প্রকৃতির দেবীকে ভয় করে, পূজা করে, সত্য। কিন্তু সেইরূপ বাঘিনী, নাগিণী, সিংহী প্রভৃতি "দেবী"ও কি ভয় ও পূজা লাভ করে না? তবেই দেখা যায় পূজাটা কে পাইতেছেন, রমণী কালী না রাক্ষসী নৃমুন্ডমালিনী?

নারীকে শিক্ষা দিবার জন্য গুরুলোকে সীতা দেবীকে আদর্শরূপে দেখাইয়া থাকেন। সীতা অবশ্যই পর্দানশীন ছিলেন না। তিনি রামচন্দ্রের অর্ধাঙ্গিনী, রাণী, প্রণয়িনী এবং সহচরী। আর রামচন্দ্র প্রেমিক, ধার্মিক—সবই। কিন্তু সীতার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ পায় যে, একটি পুতুলের সঙ্গে কোন বালকের যে সম্বন্ধ, সীতার সঙ্গে রামের সম্বন্ধও প্রায় সেইরূপ। বালক ইচ্ছা করিলে পুতুলকে প্রাণপণে ভালোবাসিতে পারে; পুতুল হারাইলে বিরহে অধীর হইতে পারে; পুতুলের ভাবনায় অনিদ্রায় রজনী যাপন করিতে পারে; পুতুলটা যে ব্যক্তি চুরি করিয়াছিল, তাহার প্রতি খড়্গহস্ত হইতে পারে; হারান পুতুল ফিরিয়া পাইলে আহলাদে আটখানা হইতে পারে; কিন্তু পুতুল বালকের কিছুই করিতে পারে না, কারণ, হস্তপদ থাকা সত্ত্বেও পুত্তলিকা অচেতন পদার্থ। বালক তাহার পুতুল স্বেচ্ছায় অনলে উৎসর্গ করিতে পারে, পুতুল পুড়িয়া গেল দেখিয়া ভূমে লুটাইয়া ধূলি ধূসরিত হইয়া উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে পারে।

রামচন্দ্র "স্বামিত্বের" ষোল আনা পরিচয় দিয়াছেন!! আর সীতা?—কেবল প্রভু রামের সহিত বনযাত্রার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন যে তাঁহারও ইচ্ছা প্রকাশের শক্তি আছে। রাম বেচারা অবোধ বালক, সীতার অনুভব শক্তি আছে, ইহা তিনি বুঝিতে চাহেন নাই, কেননা, বুঝিয়া কার্য করিতে স্বামিত্বটা পূর্ণ মাত্রায় খাটান যাইত না—সীতার অমন পবিত্র হৃদয়খানি অবিশ্বাসের পদাঘাতে দলিত ও চূর্ণ করিতে প্যারা যাইত না।

আচ্ছা, দেশকালের নিয়মানুসারে কবির ভাষায় স্বর মিলাইয়া না হয় মানিয়া লই যে, আমরা স্বামীর দাসী নহি—অর্ধাঙ্গী। আমরা তাঁহাদের গৃহে

গৃহিণী, মরণে (না হয় অন্ততঃ তাঁহাদের চাকুরী উপলক্ষে যথা তথা) অনুগামিনী সুখ দুঃখে সমভাগিনী, ছায়াতুল্য সহচারী ইত্যাদি।

কিন্তু কলিযুগে আমাদের ন্যায় অর্ধাঙ্গী লইয়া পুরুষগণ কিরূপ বিকলাঙ্গ হইয়াছে তাহা কি কেহ একটু চিন্তাচক্ষে দেখিয়াছেন? আক্ষেপের (অথবা "প্রভু"দের সৌভাগ্যের) বিষয় যে, আমি চিত্রকর নহি—নতুবা এই নারীরূপ অর্ধাঙ্গ লইয়া তাঁহাদের কেমন অপরূপ মূর্তি হইয়াছে, তাহা আঁকিয়া দেখাইতাম!

শুক্লকেশ বুদ্ধিমানগণ বলেন যে, আমাদের সাংসারিক জীবনটা দ্বিচক্র শকটের ন্যায়—ঐ শকটের এক চক্র পতি অপরটি পত্নী। তাই ইংরেজী ভাষায় কথায় কথায় স্ত্রীকে অংশিনী (**Partner** উত্তমার্ধ **better half**) ইত্যাদি বলে। জীবনের কর্তব্য অতি গুরুতর, সহজ নহে—

"সুকঠিন গার্হস্থ্য ব্যাপার
সুশৃঙ্খলে কে পারে চালাতে?
রাজ্যশাসনের রীতি নীতি
সূক্ষ্মভাবে রয়েছে ইহাতে।"

বোধ হয় এই গার্হস্থ্য ব্যাপারটাকে মস্তকস্বরূপ কল্পনা করিয়া শাস্ত্রকারকগণ পতি ও পত্নীকে তাহার অবয়ব বলিয়াছেন। তবে দেখা যাউক বর্তমান যুগে সমাজের মূর্তিটা কেমন।

মনে করুন, কোন স্থানে পূর্বদিকে একটি বৃহৎ দর্পণ আছে, যাহাতে আপনি আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে পারেন। আপনার দক্ষিণাঙ্গভাগ পুরুষ এবং বামাঙ্গভাগ স্ত্রী। এই দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখুন—

আপনার দক্ষিণ বাহু দীর্ঘ (ত্রিশ ইঞ্চি) এবং স্থূল, বাম দৈর্ঘ্য চব্বিশ ইঞ্চি এবং ক্ষীণ। দক্ষিণ চরণ দৈর্ঘ্যে ১২ ইঞ্চি, বাম চরণ অতিশয় ক্ষুদ্র। দক্ষিণ স্কন্ধ উচ্চতায় পাঁচ ফিট, বাম স্কন্ধ উচ্চতায় চারি ফিট! (তবেই মাথাটা সোজা থাকতে পারে না, বাম দিকে ঝুকিয়াছে।) দক্ষিণ কর্ণ হস্তি কর্ণের ন্যায় বৃহৎ, বাম কর্ণ রাসভকর্ণের ন্যায় দীর্ঘ। দেখুন!—ভাল করিয়া দেখুন আপনার মূর্তিটা কেমন!! যদি এ মূর্তিটা অনেকের মনোমত না হয়, তবে দ্বিচক্র শকটের গতি দেখাই। যে শকটের এক চক্র বড় (পতি) এবং এক চক্র ছোট (পত্নী) হয়, সে শকট অধিক দূরে অগ্রসর হইতে পারে না; —সে কেবল একই স্থানে (গৃহ-কোণেই) ঘুরিতে থাকিবে। তাই ভারতবাসী উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না।

সমাজের বিধি-ব্যবস্থা আমাদিগকে তাঁহাদের অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক রাখিয়াছে; তাঁহাদের সুখ-দুঃখ এক প্রকার, আমাদের সুখ-দুঃখ অন্য

প্রকার। এস্থলে বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "নবদম্পতির প্রেমালাপ" কবিতার দুই চার ছত্র উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম :

"বর। কেন সখি কোণে কাঁদিছ বসিয়া ?"
"কনে। পুষি মেনিটিরে ফেলিয়া এসেছি ঘরে।"

* *

"বর। কি করিছ বনে কুঞ্জ-ভবনে ?"
"কনে। খেতেছি বসিয়া টোপা কূল।"

* *

"বর। জগত ছানিয়া, কি দিব আনিয়া জীবন করি ক্ষয় ?
তোমা তরে সখি বল করিব কি ?"
"কনে। আরো কূল পাড় গোটা ছয়।"

* *

"বর। বিরহের বেলা কেমনে কাটিবে ?"
"কনে। দেব পুতুলের বিয়ে।"

সুতরাং দেখা যায় কন্যাকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় না, যাহাতে সে স্বামীর ছায়াতুল্য সহচরী হইতে পারে। প্রভুদের বিদ্যার গতির সীমা নাই, স্ত্রীদের বিদ্যার দৌড় সচরাচর বোধোদয় পর্যন্ত।

স্বামী যখন পৃথিবী হইতে সূর্য ও নক্ষত্রের দূরত্ব মাপেন, স্ত্রী তখন একটা বালিশের ওয়াড়ের দৈর্ঘ্য প্রস্থ (সেলাই করিবার জন্য) মাপেন। স্বামী যখন কল্পনা-সাহায্যে সুদূর আকাশে গ্রহ নক্ষত্রমালা-বেষ্টিত সৌরজগতে বিচরণ করেন, সূর্যমণ্ডলের ঘনফল তুলাদণ্ডে ওজন করেন এবং ধূমকেতুর গতি নির্ণয় করেন, স্ত্রী তখন রন্ধনশালায় বিচরণ করেন, চাউল ডাল ওজন করেন এবং রাঁধুনির গতি নির্ণয় করেন। বলি জ্যোতির্বেত্তা মহাশয়, আপনার পার্শ্বে, আপনার সহধর্মিণী কই। বোধ হয়, গৃহিনী যদি আপনার সঙ্গে সূর্য মণ্ডলে যান, তবে তথায় পহুছিবার পূর্বেই পথিমধ্যে উত্তাপে বাষ্পীভূত হইয়া যাইবেন। তবে সেখানে গৃহিণীর যাওয়াই ভাল !!

অনেকে বলেন স্ত্রীলোকদের উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন নাই। মেয়েরা চর্ব-চোষ্য রাঁধিতে পারে, বিবিধ প্রকার সেলাই করিতে পারে, দুই-চারিখানা উপন্যাস পাঠ করিতে পারে, ইহাই যথেষ্ট। আর বেশী আবশ্যক নাই। কিন্তু ডাক্তার বলেন যে আবশ্যক আছে, যেহেতু মাতার দোষ গুণ লইয়া পুত্রগণ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়। এজন্য দেখা যায় যে, আমাদের দেশে অনেক বালক শিক্ষকের বেত্রতাড়নায় কণ্ঠস্থ বিদ্যার জোরে এফ. এ. বি, এ, পাশ হয় বটে

কিন্তু বালকের মনটা তাহার মাতার সহিত রান্না ঘরেই থাকে। তাহাদের বিদ্যা পরীক্ষায় এ কথার সত্যতা উপলব্ধি হইতে পারে।*

আমার জনৈক বন্ধু তাহার ছাত্রকে উত্তর দক্ষিণ প্রভৃতি দিকনির্ণয়ের কথা (cardinal points) বুঝাইতেছিলেন। শেষে তিনি প্রশ্ন করিলেন, যদি তোমার দক্ষিণ হস্ত পশ্চিমে এবং বাম হস্ত পূর্বে থাকে, তবে তোমার মুখ কোন্ দিকে হইবে? উত্তর পাইলেন, "আমার পশ্চাৎ দিকে।"

যাহারা কন্যার ব্যায়াম করা আবশ্যক মনে করেন, তাঁহারা দৌহিত্রকে হৃষ্ট পুষ্ট "পাহল-ওয়ান" দেখিতে চাহেন কি না? তাঁহাদের দৌহিত্র ঘুষিটা খাইয়া থাপড়টা মারিতে পারে, এরূপ ইচ্ছা করেন কি না? যদি সেরূপ ইচ্ছা করেন, তবে বোধ হয় তাহারা "সুকুমারী গোলাপ-লতিকায় কাঁঠাল ফলাইতে চাহেন !!" আর যদি তাহারা ইচ্ছা করেন যে দৌহিত্রও বলিষ্ঠ না হয়, বরং পয়জার পেটা হইয়া নত মস্তকে উচ্চস্বরে বলে "মাৎ মারো। চোট লাগ্‌তা হায় !!" এবং পরাজয় লাভ শেষ হইলে দূরে গিয়া প্রহার কর্তাকে

*"দাসী" পত্রিকা হইতে কতকগুলি প্রশ্নোত্তর উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না—

প্রশ্ন। **When was Cromwell born** (ক্রমওয়েলের জন্ম কখন হইয়াছিল)?

উত্তর। **In the year 1649 when he was fourteen years old** (৬৪৯ সালে যখন তিনি চৌদ্দ বৎসরের ছিলেন)।

প্রশ্ন। **Describe his continental policy** (তাঁহার রাষ্ট্রীয় নীতি বর্ণনা কর)।

উত্তর। **He was honest and truthful and he had nine children** (তিনি সাধু প্রকৃতি এবং সত্যবাদী ছিলেন এবং তাঁহার নয়টি সন্তান সন্ততি ছিল)।

প্রশ্ন। **What is the adjective of ass** (গর্দভের বিশেষণ কি)

উত্তর। **Assansole** (আসানসোল)।

প্রশ্ন। **Who was Chandra Gupta** (চন্দ্র গুপ্ত কে)?

উত্তর। **Chandra Gupta was the grand daughter of Asoka** (চন্দ্রগুপ্ত অশোকের দৌহিত্রী)।

"পরীক্ষারহস্য। 'কলা ঝলসাইতে লাগিল' ইহার ইংরাজী অনুবাদ করিতে বলা হইয়াছিল। একজন ছাত্র লিখিয়াছেন, **'rosted some plantations'**? আর একজন লিখিয়াছেন, **rosted some plantagenets**; অপর একজন লিখিয়াছেন, **rosted some plaintiffs'**। কেহ মনে করিবেন না যে, ইহা কল্পিত উত্তর? সত্য সত্যই এরূপ উত্তর পাওয়া গিয়াছে।"

শাসাইয়া বলে যে "কায় মারতা থা? হাম নালিশ করেগা?" তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগকে আমার বক্তব্য বুঝাইতে অক্ষম।

খ্রীস্টিয়ান সমাজে যদিও স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট সুবিধা আছে, তবু রমণী আপন স্বত্ব ষোল আনা ভোগ করিতে পায় না। তাহাদের মন দাসত্ব হইতে মুক্তি পায় না। স্বামী ও স্ত্রী কতক পরিমাণে জীবনের পথে পাশাপাশি চলিয়া থাকেন বটে; কিন্তু প্রত্যেক উত্তমার্ধই (Better half) তাঁহার অংশীর (partner-এর) জীবনে আপন জীবন মিলাইয়া তন্ময়ী হইয়া জান না। স্বামী যখন ঋণজালে জড়িত হইয়া ভাবিয়া মর্মে মরিতেছেন, স্ত্রী তখন একটা নূতন টুপীর (bonnet-এর) চিন্তা করিতেছেন। কারণ তাহাকে কেবল মূর্তিমতী করিতে হইতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে—তাই তিনি মনোরমা কবিতা সাজিয়া থাকিতে চাহেন। ঋণদায়রূপ গদ্য (prosaic) অবস্থা তিনি বুঝিতে অক্ষম।

এখন মুসলমান সমাজে প্রবেশ করা যাউক: মুসলমানের মতে আমরা পুরুষের "অর্ধেক" অর্থাৎ দুইজন নারী একজন নরের সমতুল্য। অথবা দুইটি ভ্রাতা ও একটি ভগিনী একত্র হইলে আমরা "আড়াই জন" হই। আপনারা "মহম্মদীয় আইনে" দেখিতে পাইবেন যে বিধান আছে, পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যা পুত্রের অর্ধেক ভাগ পাইবে। এ নিয়মটি কিন্তু পুস্তকেই সীমাবদ্ধ। যদি আপনারা একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কোণ ধনবান মুসলমানের সম্পত্তি বিভাগ করা দেখেন, কিম্বা জমিদারী পরিদর্শন করিতে যান তবে দেখিবেন, কার্যতঃ কন্যার ভাগে শূন্য (০) কিংবা যৎসামান্য পড়িতেছে।

আমি এখন অপার্থিব সম্পত্তির কথা বলিব। পিতার স্নেহ, যত্ন, ইত্যাদি অপার্থিব সম্পত্তি। এখানেও পক্ষপাতিতার মাত্রা বেশী। ঐ যত্ন, স্নেহ, হিতৈষিতার অর্ধেকই আমরা পাই কই? যিনি পুত্রের সুশিক্ষার জন্য চারি জন শিক্ষক নিযুক্ত করেন, তিনি কন্যার জন্য দুই জন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করেন কি? যেখানে পুত্র তিনটা (বি. এ. পর্যন্ত) পাশ করে, সেখানে কন্যা দেড়টা পাশ (এন্ট্রান্স পাশ ও এফ এ. ফেল) করে কি? পুত্রদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা করা যায় না বালিকাদের বিদ্যালয় সংখ্যায় পাওয়াই যায় না। যেস্থলে ভ্রাতা "শমস উল-ওলামা"[১] সেস্থলে ভগিনী "নাজ্‌ম উল-ওলামা" হইয়াছেন কি? তাহাদের অন্তঃপুর গগনে অসংখ্য "নজমন্নেসা" "শামসন্নেসা" শোভা পাইতেছেন বটে, কিন্তু আমরা সাহিত্য-গগনে 'নজ্‌ম-উল-ওলামা" দেখিতে চাই।

আমাদের জন্য এ দেশে শিক্ষার বন্দোবস্ত সচরাচর এইরূপ—প্রথমে আরবীর বর্ণমালা, অতঃপর কোরআন শরীফ পাঠ। কিন্তু শব্দগুলির অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া হয়না, কেবল স্মরণশক্তির সাহায্যে টিয়াপাখীর মত আবৃত্তি

কর; কোন পিতার হিতৈষণার মাত্রা বৃদ্ধি হইলে, তিনি দুহিতাকে "হাফেজা" করিতে চেষ্টা করেন। সমুদয় কোরআনখানি যাঁহার কণ্ঠস্থ থাকে, তিনিই "হাফেজ"। আমাদের আরবী শিক্ষা এ পর্যন্ত। পারস্য এবং উর্দু শিখিতে হইলে প্রথমেই "করিমা ববখ্‌শ এ বরহালে মা" এবং একেবারে (উর্দু) "বানাতন্‌নাস্‌" পড়।[২] একে আকার ইকার নাই, তাতে আবার আর কোন সহজ পাঠ্য-পুস্তক পূর্বে পড়া হয় নাই, সুতরাং পাঠের গতি দ্রুতগামী হয় না। অনেকের এই কয়খানি পুস্তক পাঠ শেষ হওয়ার পূর্বেই কন্যা জীবন শেষ হয়। বিবাহ হইলে বালিকা ভাবে, "যাহা হোক, পড়া হইতে রক্ষা পাওয়া গেল"। কোন কোন বালিকা রন্ধন ও সূচীকর্মে সুনিপণা হয়। বঙ্গদেশেও বালিকাদিগকে রীতিমত বঙ্গভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় না। কেহ কেহ উর্দু পড়িতে শিখে, কিন্তু কলম ধরিতে শিখে না। ইহাদের উন্নতির চরম সীমা সল্‌মা চুমকির কারুকার্য, উলের জুতা-মোজা ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে শিক্ষা পর্যন্ত।

যদি ধর্মগুরু মোহাম্মদ (দঃ) আপনাদের হিসাব নিকাশ লয়েন যে, "তোমার কন্যার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছ?" তবে আপনারা কি বলিবেন?

পয়গম্বরদের ইতিহাসে শুনা যায়, জগতে যখনই মানুষ বেশী অত্যাচার অনাচার করিয়াছে, তখনই এক একজন পয়গম্বর আসিয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়াছেন। আরবে স্ত্রীজাতির প্রতি অধিক অত্যাচার হইতেছিল; আরববাসীগণ কন্যাহত্যা করিতেছিল, তখন হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কন্যাকুলের রক্ষকস্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তিনি কেবল বিবিধ ব্যবস্থা দিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, স্বয়ং কন্যা পালন করিয়া আদর্শ দেখাইয়াছেন। তাঁহার জীবন ফাতেমাময় করিয়া দেখাইয়াছেন—কন্যা কিরূপ আদরণীয়া। সে আদর সে স্নেহ জগতে অতুল।

আহা! তিনি নাই বলিয়া আমাদের এ দুর্দশা। তবে আইস ভগিনীগণ! আমরা সকলে সমস্বরে বলি ঃ

"করিমা বখ্‌বশ-এ বরহালে মা।" করিমা (ঈশ্বর) অবশ্যই কৃপা করিবেন যেহেতু "সাধনায় সিদ্ধি।" আমরা 'করিমের' অনুগ্রহ লাভের জন্য যত্ন করিলে অবশ্যই তাঁহার করুণা লাভ করিব। আমরা ঈশ্বর ও মাতার নিকট ভ্রাতাদের অর্ধেক নহি। তাহা হইলে এইরূপ স্বাভাবিক বন্দোবস্ত হইত—পুত্র যেখানে দশমাস স্থান পাইবে, দুহিতা সেখানে পাঁচ মাস। পুত্রের জন্য যতখানি দুগ্ধ আমদানী হয়, কন্যার জন্য তাহার অর্ধেক। সেরূপ ত নিয়ম নাই। আমরা জননীর স্নেহ মমতা ভ্রাতার সমানই ভোগ করি। মাতৃহৃদয়ে পক্ষপাতিতা নাই। তবে কেমন করিয়া বলিব, ঈশ্বর পক্ষপাতী? তিনি কি মাতা অপেক্ষা অধিক করুণাময় নহেন?

আমি এবার রন্ধন ও সূচীকার্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহাতে আবার যেন কেহ মনে না করেন যে, আমি সূচীকর্ম ও রন্ধনশিক্ষার বিরোধী। জীব-

নের প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু অন্নবস্ত্র; সুতরাং রন্ধন ও সেলাই অবশ্য শিক্ষণীয়। কিন্তু তাই বলিয়া জীবনটাকে শুধু রান্নাঘরেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নহে।

স্বীকার করি যে, শারীরিক দুর্বলতাবশতঃ নারীজাতি অপর জাতির সাহায্যে নির্ভর করে; তাই বলিয়া পুরুষ 'প্রভু' হইতে পারে না। কারণ জগতে দেখিতে পাই প্রত্যেকের নিকট কোন-না-কোন প্রকার সাহায্য প্রার্থনা না করে, যেন একে অপরের সাহায্য ব্যতীত চলিতে পারে না। তরুলতা যেমন বৃষ্টির সাহায্য প্রার্থী, মেঘও সেইরূপ তরুর সাহায্য চায়। জল বৃদ্ধির নিমিত্ত নদী বর্ষার সাহায্য পায়, মেঘ আবার নদীর নিকট ঋণী। তবে তরঙ্গিনী কাদম্বিনীর "স্বামী" বা কাদম্বিনী তরঙ্গিনীর "স্বামী"? এ স্বাভাবিক নিয়মের কথা ছাড়িয়া কেবল সামাজিক নিয়মের দৃষ্টিপাত করিলেও আমরা তাহাই দেখি।

কেহ সূত্রধর, কেহ তন্তুবায় ইত্যাদি। একজন ব্যারিষ্টার ডাক্তারের সাহায্যপ্রার্থী, আবার ডাক্তার ব্যারিষ্টারের সাহায্য চাহেন। তবে ডাক্তারকে ব্যারিষ্টারের স্বামী বলিব, না ব্যারিষ্টার ডাক্তারের স্বামী? যদি ইহাদের কেহ কাহাকে "স্বামী" বলিয়া স্বীকার না করেন তবে শ্রীমতীগণ জীবনের চিরসঙ্গী শ্রীমানদিগকে "স্বামী" ভাবিবেন কেন?

আমরা উত্তমার্ধ (better halves) তাঁহারা নিকৃষ্ট (worse halves), আমরা অর্ধাঙ্গী, তাঁহারা অর্ধাঙ্গ। অবলার হাতেও সমাজের জীবন মরণের কাঠি আছে, যেহেতু "না জাগিলে সব ভারত ললনা" এ ভারত আর জাগিতে পারিবে না। প্রভুদের ভীরুতা কিম্বা তেজস্বিতা জননীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তবে কেবল শারীরিক বলের দোহাই দিয়া অদূরদর্শী ভ্রাতৃমহোদয়গণ যেন শ্রেষ্ঠত্বের দাবী না করেন।

আমরা পুরুষের ন্যায় সুশিক্ষা অনুশীলনের সম্যক সুবিধা না পাওয়ায় পশ্চাতে পড়িয়া আছি। সমান সুবিধা পাইলে আমরাও কি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিতাম না? আশৈশব আত্মনিন্দা শুনিতেছি, তাই এখন আমরা অন্ধভাবে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করি এবং নিজেকে অতি তুচ্ছ মনে করি। অনেক সময়ে "হাজার হোক ব্যাটা ছেলেদের দোষ" ক্ষমা করিয়া অন্যায় প্রশংসা করি। এইত ভুল।[৩]

আমি ভগিনীদের কল্যাণ কামনা করি, তাঁহাদের ধর্ম বন্ধন বা সমাজবন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে একটা উন্মুক্ত প্রান্তরে বাহির করিতে চাহি না। মানসিক উন্নতি করিতে হইলে হিন্দুকে হিন্দুত্ব বা খ্রীস্টানকে খ্রীস্টানী ছাড়িতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। আপন আপন সম্প্রদায়ের পার্থক্য রক্ষা করিয়াও মনটাকে স্বাধীনতা দেওয়া যায়। আমরা যে কেবল উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে অবনত হইয়াছি, তাই বুঝিতে ও বুঝাইতে হইবে।

অনেকে হয়ত ভয় পাইয়াছেন যে বোধ হয় একটা পত্নী-বিদ্রোহের আয়োজন করা হইতেছে। অথবা ললনাগণ দলে দলে উপস্থিত হইয়া বিপক্ষকে রাজকীয় কার্যক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া দিয়া সেই পদগুলি অধিকার করিবেন—শামলা, চোগা, আইন-কানুনের পাঁজি পুঁথি লুঠিয়া লইবেন অথবা সদলবলে কৃষিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কৃষকগুলিকে তাড়াইয়া দিয়া তাহাদের শস্যক্ষেত্র দখল করিবেন, হাল গরু কাড়িয়া লইবেন। তবে তাঁহাদের অভয় দিয়া বলিতে হইবে—নিশ্চিন্ত থাকুন।

পুরুষগণ আমাদিগকে সুশিক্ষা হইতে পশ্চাদপদ রাখিয়াছেন বলিয়া আমরা অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছি। ভারতে ভিক্ষুক ও ধনবান—এই দুইদল লোক অলস; এবং ভদ্র মহিলার দল কর্তব্য অপেক্ষা অল্প কাজ করে। আমাদের আরামপ্রিয়তা খুব বাড়িয়াছে। আমাদের হস্ত, মন, পদ, চক্ষু ইত্যাদির সদ্ব্যবহার করা হয় না। দশজন রমণীরত্ন একত্র হইলে ইহার উহার—বিশেষতঃ আপন আপন অর্ধাঙ্গের নিন্দা কিংবা প্রশংসা করিয়া বাকপটুতা দেখায়। আবশ্যক হইলে কোন্দলও চলে।

আশা করি এখন "স্বামী" স্থলে "অর্ধাঙ্গ" শব্দ প্রচলিত হইবে।

১। "শমস-উল-ওলামা", পণ্ডিতদের উপাধি বিশেষ। ঐ শব্দগুলির অনুবাদ এইরূপ হয়—শমস sun; ওলামা, ("আলম" শব্দের বহুবচন) learned men। এইরূপ নজম-উল-ওলামা অর্থে the "star" of the learned men (বা women) বুঝিতে হইবে।

২। এখানে একটি দশম বর্ষের বালিকার গল্প মনে পড়িল। পল্লীগ্রামে অনেকের বাড়ী ধান ভানিবার জন্য ভানানী নিযুক্ত হয়। সেই বালিকা "বনাতন নাস" পড়িতে যাইয়া হোসনে আরার মেজাজের বর্ণনাটা হৃদয়ঙ্গম করা অপেক্ষা ভানানীদের ধানভানা কাজটা সহজ মনে করিত। তাই সুযোগ পাইলেই সে ঢেঁকিশালে গিয়া দুই একসের ধান্যের শ্রাদ্ধ করিত। সে ধান্য হইতে তণ্ডুল পরিষ্কার পাওয়া যাইতনা—তাহা "whole meal" ময়দার ন্যায় ধান্য-তুষ-তণ্ডুল মিশ্রিত এক প্রকার অদ্ভুত সামগ্রী হইত। যে রোগীদের জন্য হোলমিল ময়দার ব্যবস্থা দেওয়া হয় তাহাদের জন্য উক্ত হোলমিল তণ্ডুল চূর্ণ অবশ্যই উপকারী খাদ্য সন্দেহ নাই।

৩। এস্থলে জনৈক নারীহিতৈষী মহাত্মার উদ্ধৃগাথা মনে পড়িল। তিনি (১৯০৫ খৃষ্টাব্দের কোন মাসিক পত্রিকায়) লিখিয়াছেন ঃ জগতে তোমাদের নিন্দাগীত এতদূর উচ্চরাগে পাওয়া গিয়াছে যে, শেষে তোমরাও জগতের কথায় বিশ্বাস করিয়া ভাবিলে যে, "আমরা বাস্তবিক বিদ্যালাভের উপযুক্ত নহি। সুতরাং মূর্খতার কুফল ভোগের নিমিত্ত তোমরা নত মস্তকে প্রস্তুত হইলে।" কি চমৎকার কথা। জগদীশ্বর উক্ত কবিকে দীর্ঘজীবী করুন।

বাঙ্গালা অভিধানে আমোদ

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

(১৮৮৫—১৯৬৯)

বাঙ্গালা অভিধান আমোদের খনি। একজন শুভদর্শী (optimist) তাহাতে সুখশান্তি সৌভাগ্য সৌন্দর্য পুণ্য আনন্দ সকলই দেখিতে পাইয়া অতুল আনন্দনীরে ভাসিবেন। একজন শাব্দিক (Philologist) তাহাতে আপনার প্রশস্ত কর্মক্ষেত্র দেখিয়া উল্লাসে মাতিবেন। আমি শাব্দিকের হিসাবে আমোদের একটু তালিকা দিব।

প্রথমে বাঙালা অভিধানের শব্দরাশিকে উৎপত্তি বা জাতি হিসাবে ভাগ করিলে আমরা দেখিতে পাই—

(১) কতকগুলি শব্দ দৃশ্যতঃ সংস্কৃতের ন্যায়, বস্তুত নয়। কৃত্রিম বর্ণ-বিন্যাস দ্বারা আমরা এই শব্দগুলির বাঙ্গালীভাব চাপিয়া রাখি। উদাহরণ যথা—বাঙ্গালা সকল (উচ্চারণ শকোল), সংস্কৃত সকল; বাং ভিক্ষা (উং ভিক্খা বা ভিক্খে বা ভিক্কে), সং-ভিক্ষা (উং ভিক্খা); বাং পদ্ম (উং পদ্দ), সং পদ্ম (উং পদ্‌ম); বাং যদি (উং জদি) সং-যদি ইত্যাদি। এই শ্রেণীর শব্দগুলিকে আমরা তদ্রূপ বা সংস্কৃতরূপ শব্দ বলিব; তৎসম বলিব না।

(২) কতকগুলি শব্দ সংস্কৃত শব্দের পরিবর্তন দ্বারা উৎপন্ন। উদাং যথা বাং-কান, সং-কর্ণ, বাং-ওঝা, সং-উপাধ্যায়; বাং-আনাড়ী, সং-অজ্ঞানী; বাং-ঝী, সং-দুহিতা; ইত্যাদি।

এই পরিবর্তন একটি নিয়মবদ্ধ প্রক্রিয়া। সেই নিয়মসমষ্টিকে বাঙ্গালা ভাষায় শব্দশাস্ত্র (phonology) বলা হয়। এই শ্রেণীর শব্দগুলিকে আমরা তদ্ভব শব্দ বলিব।

(৩) কতকগুলি শব্দ বৈদেশিক ভাষা হইতে সংগৃহীত এবং উচ্চারণে প্রায় তদ্রূপ। উদাং যথা, বাং আদালত আরবী আদালত; বাং কলম, আং কলম (ক-q); বাং কাগজ, পারসী কাগয (য-z); বাং পাদরী, পর্তুগীজ পাদ্রে (padre); বাং ডিক্রী, ইং ডিক্রী (Decree) ইত্যাদি। এই শ্রেণীর শব্দগুলিকে আমরা বৈদেশিকরূপ শব্দ বলিব।

(৪) কতকগুলি শব্দ বৈদেশিক শব্দের পরিবর্তন দ্বারা উৎপন্ন। উদাং যথা বাং-খরা; পারসী খরগোশ; বাং-তাগাদা, আরবী তাকাযা (ক-q;

য-z); বাং কাগিজ, আং কমীস (ক-q); বাং মাকু, পারসী মাকুব; বাং লাট, ইং লর্ড। এই শ্রেণীর শব্দগুলিকে আমরা বৈদেশিক শব্দ বলিব। বৈদেশিক ভাষাগুলির মধ্যে আরবী ও পারসী হইতে অধিকাংশ বৈদেশিক-রূপ ও বৈদেশিক শব্দ উৎপন্ন। সোজাসুজি আরবী হইতে বাঙ্গালা ভাষায় কোনো শব্দ আসে নাই। বাঙ্গালায় আমরা যে সকল আরবী শব্দ পাই, সেগুলি পারসীর অভ্যন্তর দিয়া আগত। তুর্কি, পর্তুগীজ, ইংরাজী, মালয়, চীন, সাঁওতালী প্রভৃতি ভাষা হইতেও অল্প বিস্তর শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ইংরাজীর অভ্যন্তর দিয়া ফরাসী, স্পেনীয়, ইটালীয়, গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষার দুইটি চারটি শব্দ বাঙ্গালায় আসিয়াছে। বৈদেশিকভব শব্দগুলির মধ্যে কতকগুলি আকার পরিবর্তন করিয়া এ প্রকার রূপ ধারণ করিয়াছে যে, সহসা তাহাদিগকে বিদেশী বলিয়া চেনা যায় না, যেনো ধুতি-চাদর-পরা পার্শী ভদ্রলোক। উদাহরণ স্বরূপ কবিরাজী সোনামুখী শব্দ শুনিয়া মনে হইবে নিশ্চয়ই সং স্বর্ণমুখী শব্দজাত। কিন্তু বাস্তবিক বাঙ্গালা সোনামুখী পারসী সানাএ মক্কী (মক্কা জাত সানা গুল্ম) শব্দজাত। বাং সাব্যস্ত আং সাবিত; বাং বক্রি আং বাকি; বাং কণ্ঠভূষণ, ইং কন্ট্রিবিউশন (contribution)। এই শ্রেণীর শব্দগুলিকে আমরা ছদ্মবেশী শব্দ বলিব। ছদ্মবেশী শব্দগুলি বৈদেশিকভব শব্দ শ্রেণীর অন্তর্গত।

(৫) কতকগুলি শব্দের সংস্কৃত কিংবা অন্য কোন ভাষা হইতে উৎপত্তি স্থির হয় নাই। উদাহরণ কুলা, পাটা, গাছ, কালা, হাবা ইত্যাদি। এই শ্রেণীর শব্দগুলিকে আমরা দেশী শব্দ বলিব। ভাষাতত্ত্বের (Philology) জ্ঞানাধিক্যের সহিত হয়ত আমরা কোন কোন দেশী শব্দের প্রকৃত উৎপত্তি জ্ঞাত হইয়া সেইগুলিকে পূর্বোক্ত চারি শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট করিতে সক্ষম হইব। সুবল বাবুর বাঙ্গালা অভিধানে খোকা, খামকা, চালাক, পো, মজা, মাল্লা, লেপ, বালিশ, সেয়ান, এই শব্দগুলিকে আদিম নিবাসীদিগের ভাষাগত শব্দাবলী বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলি যথাক্রমে সং স্তোক, পাং খাহ্‌মখাহ্‌, পাং চালক, সং পুত্র পাং মযাহ্‌ (য-z), আং মল্লাহ, আং লেহাফ্‌, পাং বালিশ সং সজ্ঞান শব্দজাত।

(৬) আর কতকগুলি শব্দ মূলতঃ বৈদেশিক শব্দ; কিন্তু বাঙ্গালার কৃৎ কিংবা তদ্ধিত বিভক্তিযুক্ত হইয়াছে; উদাং যথা, মুরগী পারসী মুর্‌গ+বাং ঈ প্রত্যয়। কিংবা শব্দটি তৎসম, তদ্ভব বা দেশীয় শব্দ, কিন্তু তাহাতে বৈদেশিক প্রত্যয় যুক্ত হইয়াছে; উদাং যথা, গুরুগিরি=সং গুরু+পাং গরী, পান-দান=বাং পান=পাং দান ইত্যাদি। এই শ্রেণীর শব্দকে আমরা সংকর বা দো আঁসলা বলিব।

আমরা দেখিলাম জাতি হিসাবে বাঙ্গালা ভাষায় শব্দ সমষ্টিকে আমরা মোটামুটি ৬ ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। শব্দার্থের দিক হইতে দেখিলে আমরা দেখিতে পাইব—

(১) অনেকগুলি শব্দের এক একটি মাত্র অর্থ, যেমন জল, চোখ, ঘোড়া, ইত্যাদি। এই শ্রেণীর শব্দগুলিকে আমরা একার্থক শব্দ বলিব।

(২) অল্প কতকগুলি শব্দের একাধিক অর্থ; যথা বেল, (১) ফুল বিশেষ, (২) ফল বিশেষ, (৩) সূচীকর্মবিশিষ্ট ফিতা বিশেষ; কৈ (১) মৎস্য বিশেষ, (২) কোথায়; চাল, (১) ঘরের আচ্ছাদন বিশেষ, (২) তণ্ডুল। এই শ্রেণীর শব্দগুলিকে আমরা অনেকার্থক শব্দ বলি। অনেকার্থক শব্দগুলির উৎপত্তি বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, অনেক স্থলে মূলে কয়েকটি পৃথক পৃথক অর্থ প্রকাশক শব্দ বর্ণ-পরিবর্তনাদির দ্বারা একরূপ ধারণ করিয়াছে। পূর্বে পৃথক শব্দগুলির যে সকল অর্থ ছিলো, এক্ষণে একটি শব্দের সহিত সেই সমস্ত অর্থ সংলগ্ন হইয়াছে। উদাং যথা, কৈ মৎস্য অর্থে=সং কবয়, কৈ কোথায় অর্থে প্রাং কহি; বেল ফুল অর্থে=সং বিচিকিল্ল, বেল ফল অর্থে=সং বিল্ল, সূচীকর্মবিশেষ অর্থে=সং বল্লী। সংস্কৃতের সহিত তুলনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব সংস্কৃতে যেমন কোন কোন শব্দের আধ কুড়ির অধিক অর্থ হয়, বাঙ্গালায় সেরূপ হয় না. বড় জোর তিনটি কি চারিটি অর্থ। সংস্কৃতে হরি শব্দের ১৪টি অর্থ। কোষ বলিতেছে "যমা-নিলেন্দ্র চন্দ্রাক বিষ্ণুসিংহাযু বাজিষু। শুকাহি কপিভেকেষু হরির্না কপিলে ত্রিষু"। সংস্কৃতে অনেকার্থক শব্দ বাঙ্গালায় অর্থভেদে ভিন্নরূপ ধারণ করিয়া একার্থক হইয়াছে উদাং যথা সং দক্ষিণ (১) দিক বিশেষ, (২) বামের বিপরীত; বাঙ্গালায় প্রথম অর্থে দক্ষিণ এবং দ্বিতীয় অর্থে ডানরূপ আমরা পাইয়াছি।

(৩) অত্যল্প মাত্র শব্দের প্রতিশব্দ আছে। যথা পাট কোষ্টা; জল পানি; তিসী মসিনা; মহিষ বয়ার ভয়েস; লজ্জা সরম ইত্যাদি। কিন্তু প্রতিশব্দগুলি সাধারণতঃ বাঙ্গালার বিভিন্ন প্রদেশে কিংবা বিভিন্ন সমাজের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। যাহারা তিসী বলে তাহারা মসিনা বলে না, আর যাহারা মসিনা বলে তাহারা তিসী বলে না। যাহারা জল বলে তাহারা পানি বলে না; আর যাহারা পানি বলে তাহারা জল বলে না। সংস্কৃতে প্রতিশব্দের যেরূপ ছড়াছড়ি, বাঙ্গালায় তেমনি তাহার অভাব। এইজন্য খাঁটি বাঙ্গালায় কবিতা লিখিতে গেলে মিলের জন্য আমার প্রায় মন্দ কবির অনেক সময় মস্তক চুলকাইতে হয়।

বাঙ্গালা অভিধান আলোচনা করিলে আমরা আরো দেখিতে পাইব, অনেক শব্দের অর্থ মূলে যেরূপ ছিলো তাহার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অর্থের পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাইব—

(১) কতকগুলি শব্দের মূল অর্থের সংকোচ ঘটিয়াছে। উদাং যথা, পরিবার মূল অর্থ পরিজন, পরে স্ত্রী; জন্তু মূল অর্থে জীব (animal) পরে পশু; নিকা (আরবী নিকাহ্) অর্থ বিবাহ, বাঙ্গালা অর্থ মুসলিমদিগের বিধবা বিবাহ: মোরগ (পারসী মুর্গ) অর্থ পক্ষী, বাংলায় কুক্কুট ইত্যাদি।

(২) কতকগুলি শব্দের মূল অর্থের বিস্তৃতি ঘটিয়াছে। যথা কালী মূলে লিখিবার উপকরণ কৃষ্ণবর্ণ তরল পদার্থ বিশেষ, পরে যে-কোন বর্ণের লিখিবার উপকরণ তরল পদার্থ। লাল কালী না বলিয়া লালী বলিলে বোধ হয় বেশী শুদ্ধ হইত, কিন্তু কালীর অর্থ বিস্তৃত করিয়া আমরা তাহাকে লাল কালী বলি; তেল মূলে তিল জাতীয় স্নেহ পদার্থ, এক্ষণে স্নেহ পদার্থ মাত্র; শরাব আরবী শব্দ, অর্থ পানীয়, পারসী অর্থ মদ্য, বাংলা মদ্য ইত্যাদি।

(৩) কতকগুলি শব্দের মূল অর্থের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। উদাং যথা চাকরি (পাং) মূল অর্থ চাকরের কার্য, বাঙ্গালায় জীবিকা নির্বাহের সর্বোত্তম উপায়। যাঁহারা চাকুরী করেন যদি তাঁহাদিগকে তাঁহাদের মনিবের চাকর বলা যায় তবে হয়ত তাঁহারা মানহানি মোকদ্দমা রুজু করিবেন।

(৪) কতকগুলি শব্দের মূল অর্থের গৌরবহানি ঘটিয়াছে। গৌরব বৃদ্ধি অপেক্ষা গৌরব হানির দৃষ্টান্তই বাঙ্গালা অভিধানে বেশী পাওয়া যাইবে। কালের গুণ। উদাং যথা ঘেন্না সংস্কৃত ঘৃণা; প্রাচীন অর্থ দয়া, অর্বাচীন অর্থ জুগুপ্সা, বাঙ্গালায় সেই অর্থ আসিয়াছে। বাং পীড়িত, সং প্রীতি; বাং ভাতার সং ভর্তা; বাং নাগর মূল অর্থ নগরজাত; বাং ওঝা, সং উপাধ্যায়। বাং রাগ অর্থ ক্রোধ, সং অনুরাগ; ইত্যাদি।

(৫) কতকগুলি শব্দের ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক কারণে অর্থের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। উদাং যথা, যবন অর্থে প্রথমে গ্রীক, তৎপর পারসিক, এক্ষণে মুসলমান (ঘৃণাসূচক); হিন্দু অর্থে প্রথমে সিন্ধুনদের তীরবর্তী স্থানের লোক; তৎপরে ভারতবর্ষীয় লোক, এক্ষণে হিন্দু ধর্মাবলম্বী লোক; নেড়ে মূলে বৌদ্ধ, এক্ষণে মুসলমান (ঘৃণাসূচক); বিলাত মূলে দেশ, তৎপরে আফগানিস্তান ও পারস্য, এক্ষণে ইংল্যান্ড; সাহেব মূলে সঙ্গী, তৎপরে প্রভু, অনন্তর মুসলমান ভদ্রলোক, এক্ষণে ইউরোপবাসী; স্নেহ মূলে বরফ (snow) পরে তৈল, অবশেষে প্রীতি; ইত্যাদি।

বাঙ্গালা অভিধান দ্বারা আমরা বাঙ্গালী জাতির সামাজিক ইতিহাস ও সাধারণ বিশ্বাসের কিছু পরিচয় পাইতে পারি। বাঙ্গালা ভাষায় পারসী ও পারসীর মধ্যে দিয়া আগত আরবী শব্দের সংখ্যা প্রায় ১০০০ হইবে। ঐ সকল শব্দের সাহায্যে বাঙ্গালার জাতীয় ইতিহাসের লুপ্ত পৃষ্ঠার কিঞ্চিৎ উদ্ধার হইতে পারে। এখানে সংক্ষেপে কিছু নমুনা দিতেছি। কাগজ, দোয়াত,

কলম আরবী কিংবা পারসী শব্দ; ইহা দ্বারা-বোধ হয় মুসলমানেরা এদেশে শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে কাগজের বহুল প্রচলন করেন। এই শব্দ প্রমাণ ভিন্ন অন্যরূপেও আমরা জানি, মুসলমান আগমনের পূর্বে ভূর্জপত্র কিংবা তালপত্র কাগজের স্থানে ব্যবহৃত হইত। দরজিগিরি সম্বন্ধে অধিকাংশ কথা যথা, কাঁচি (তুর্কী কয়চী), ওরেব (সেলাই বিশেষ), রিপু (আং রফু), জেব, আস্তিন, জামা, কামীজ (আং কমীস), আরবী কিংবা পারসী। বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই ব্যবসাভেদে জাতিভেদ হইয়াছে, যেমন, কামার, কুমার ইত্যাদি; কিন্তু আমরা বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে কোন দরজির জাতি দেখিতে পাই না। এই উভয় দিক দিয়া আলোচনা করিলে মুসলমানেরা যে বাঙ্গালায় দরজির কার্যের প্রচলন করিয়াছেন, তাহাতে কোনো সন্দেহ থাকে না।অষ্টাদশ ভাগ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় বাবু অবিনাশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় পর্তুগীজ ভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষায় সংগৃহীত শব্দাবলীর একটি তালিকা দিয়াছেন। বাঙ্গালার পর্তুগীজ শব্দের অস্তিত্বদ্বারা বাঙ্গালায় এক সময় পর্তুগীজের প্রাদুর্ভাব প্রমাণ করিতেছে। ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে. চিনি চীন দেশ হইতে. মিশ্রী মিশর দেশ হইতে, লঙ্কা লঙ্কা দ্বীপ হইতে আলু বোখারা হইতে, সোনা-মুখী মক্কা হইতে, মরিচ মরিশস হইতে পেঁপে পপুয়া দ্বীপ হইতে, মর্ত্তমান কলা মর্ত্তবান হইতে, বাতাবী লেবু ঘাতেবীয়া হইতে, খোরাসানি যমানি খোরাসান হইতে এদেশে প্রথমে আমদানী হইয়াছে। নামগুলিই তাহার সাক্ষী। অন্য সাক্ষীও বোধ হয় পাওয়া যাইবে। রামধনু শব্দ দ্বারা বোধ হয় তাহাকে রামের ধনু বলিয়া বিশ্বাস করা হইত। সংস্কৃতে যেমন ইহার ভূরি উদাহরণ আছে, বাঙ্গালায় তেমন নাই।

আমি বাঙ্গালা অভিধানে আমাদের দিঙ্‌মাত্র প্রদর্শন করিলাম। রসিক পাঠক চেষ্টা করিলে তাহাতে আরও অনেক আমোদ পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

জাতির উত্থান

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান
(১৮৮৯ - ১৯৩৬)

কোন জাতিকে যদি বলা হয় তোমরা বড় হও, তোমরা জাগ তাতে ভাল
কাজ হয় বলে মনে হয় না। এক একটা মানুষ নিয়েই এক একটা জাতি।
পল্লীর অবজ্ঞাত এক একটা মানুষের কথা ভাবতে হবে।

মানুষকে শক্তিশালী, বড় ও উন্নত করে তোলার উপায় কি? তাকে
যদি শুধু বলি তুমি জাগো—আর কিছু না, তাতে সে জাগবে না। এই উপ-
দেশ বাণীর সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু জড়িত আছে। এইটে ভাল করে বোঝা
চাই।

আবার বলি কোন জাতিকে যদি বাহির হতে বলি বড় হও, তাতে
ভাল কাজ হবে না। মানুষকে এক একটা করেই ভাবতে হয়। একটা লোক
জাতীয় সহানুভূতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে হাজার হাজার টাকা তুরস্কে পাঠিয়ে-
ছিলেন। তিনি যখন অগণ্য আর্ত মানুষের বেদনা কাহিনী গাইতে গাইতে
ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে নিয়ে পথে বের হতেন, তখন প্রত্যেক মানুষের প্রাণ
সহানুভূতি, বেদনা ও করুণায় ভরে উঠত। এই ব্যক্তি কিছুদিন পর তাঁর
এক নিরন্ন প্রতিবেশীর সর্বস্বহরণ করতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। মানুষের
এই ভাবের জাগরণ ও বেদনাবোধের বেশী মূল্য আছে বলে মনে হয় না।
কারণ জাতির যখন পতন আরম্ভ হয়, তখন দেশসেবক যে কেউ থাকে না, তা
নয়। স্বাধীনতার মমতায় কেউ প্রাণ দেয় না, তা বলি না—যারা দেয় তাদের
মন ভিতরে ভিতরে অন্ধ হতে থাকে। জাতিকে খাঁটি রকমে বড় ও ত্যাগী
করতে হলে সমাজের প্রত্যেক মানুষকে বড় ও ত্যাগী করতে হবে। কি উপায়ে?
দেশের মানুষের ভিতর আত্মবোধ দেবার উপায় কি? প্রত্যেক মানুষ শক্তি-
শালী, উন্নতহৃদয়, প্রেমভাবাপন্ন, সত্য ও ন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধাবান, অন্যায়
ও মিথ্যার প্রতি বিতৃষ্ণ হবে কেমন করে? জাতির প্রত্যেক বা অধিকাংশ
মানুষ এই ভাবে উন্নত না হলে, জাতি বড় হবে না। প্রত্যেক মানুষের ভিতর
জ্ঞানের জন্য একটা স্বাভাবিক ব্যাকুলতা জন্মিয়ে দেওয়া চাই। সংসার এমন-
ভাবে চলছে, যাতে সকলের পক্ষে বিদ্যালয় বা উচ্চ জ্ঞানাগারে যোগ দেওয়া
হয় না। অথবা সারা ছাত্রজীবন ধরে বিদ্যালয়ে জ্ঞানলাভ করা হয়ে উঠে না;

কেউ বাল্যে পিতৃহীন হয়, কারো পিতা জ্ঞানালোচনাকে বিশেষ আবশ্যক কাজ মনে না করে ছেলেকে স্কুলে পাঠান না; কেউ পাঠাভ্যাসকালে উদ্ধত ও দুর্মতি হয়ে পড়াশুনা ত্যাগ করে, কেউ বিদেশী ভাষার নিষ্পেষণে নিজেকে বোকা ভেবে পড়াশুনা বাদ দেয়।

পাঁচ হাজার ছাত্রের মধ্যে পঞ্চাশ জন ছাড়া বাকী সব ছেলেই সময়ে জ্ঞানান্ধ, হীন ও মৌন মূক হয়ে যায়। এটা জাতির পক্ষে কত বড় ক্ষতির কথা।

মনুষ্যত্ব লাভের পর জ্ঞানের সেবা। জীবনের সকল অবস্থায় সকল সময়ে আহার স্নানের মত মানুষের পক্ষে জ্ঞানের সেবা করা প্রয়োজন।

উন্নত, ত্যাগী, শক্তিশালী, প্রেমিক, সত্য ও ন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধাবান মানুষ বিদ্যাহীন বা অল্পশিক্ষিত মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় না। মানুষকে বা জাতিকে বড় হতে হলে সব সময়ই তাকে জ্ঞানের সেবা করতে হবে।

দেশের সকল মানুষকে জ্ঞানী করে তোলার উপায় কি? জাতির জীবনের মেরুদণ্ড মনুষ্যত্ব ও জ্ঞান। এই দুটি চাপা রেখে জাতিকে জাগতে বললে সে জাগবে না।

বুদ্ধির দোষে হোক বা অবস্থার চক্রে হোক, কোন দেশে যদি বহু মানুষ অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষাবশতঃ অমার্জিতচিত্ত এবং জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাবোধহীন হয়ে পড়ে, তাহলে সে জাতির জীবন টেকসই হবে না। এইসব লক্ষ মৌন আত্মার স্পন্দন আনবার এক উপায় আছে, কোটি বদ্ধ মুখে ভাষা তুলে দেবার এক পন্থা আছে। সকল দেশে সকল সময়ে সেই পন্থা কার্যকরী হয়ে থাকে। সে পন্থা না থাকলে কোন জাতি বাঁচত না—উন্নত হওয়া—স্বপ্ন অপেক্ষা অসম্ভব হতো।

জাতিকে শক্তিশালী করতে প্রত্যেক সময়ে মানুষ এই পন্থা ধরেছে। গ্রীক জাতি, রোমান জাতি, মুসলমান জাতি, বর্তমান ইউরোপীয় জাতি—এই পথকে অবলম্বন ক'রে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করেছেন। যারা এই পথকে অবহেলা করে নিজদিগকে প্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছা করে তারা একটা অসম্ভব কাজ আরম্ভ করে। এই পথ আর কিছু নয়--দেশের বা জাতীয় সাহিত্যের পুষ্টি সাধন। যে সমাজে সাহিত্যের কোন আদর নাই, তা সাধারণত বর্বর সমাজ। কথা কাগজে ধরে অসংখ্য মানুষের দৃষ্টির সম্মুখে ধরার নাম সাহিত্য সেবা। এই যে কথা একথা সাধারণ কথা নয়—এই কথার ভিতর দিয়ে জীবনের সন্ধান বলে দেওয়া হয়, পুণ্যের বাণী ও মোক্ষের কথা প্রচার করা হয়, বর্তমান ও অন্তিম সুখের দ্বার মুক্ত করে দেওয়া হয়।

এই কথার ধারা, গান ও গল্প কখনও কবিতা ও দর্শন, কখনও প্রবন্ধ ও বিজ্ঞানের রূপ নিয়ে মানুষের সম্মুখে রঙ্গীন হয়ে, মধুর হয়ে দেখা দেয়।

দুর্গম কণ্টকাকীর্ণ আঁধার পথে কেউ যদি প্রদীপ না নিয়ে চলতে থাকে—কিংবা আলোর আবশ্যকতা আছে, একথা উপহাসের সঙ্গে অস্বীকার করে, তা'হলে তাকে কি বলা যায় ?

কোন জাতি সাহিত্যকে অস্বীকার বা অবহেলার চোখে দেখে উন্নত হাতে চেষ্টা করলে, সে জাতি আদৌ উন্নত হবে না। শিক্ষিতকে আরও শিক্ষিত, ভাবুককে আরও গভীর করবার জন্যে, দেশের অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত—শিক্ষা কেন্দ্রের বাহিরের-লোকগুলিকে শক্তিশালী, জ্ঞানী ও মনুষ্যত্ববোধ সম্পন্ন করবার জন্য প্রত্যেক দেশে বহু মনীষী জন্মগ্রহণ করেন।

জাতির পথপ্রদর্শক তাঁরাই। তাঁরাই জাতি গঠন করেন। গ্রীস, আরব, হিন্দু ও ইউরোপীয় শক্তি এবং সভ্যতার জন্মদাতা তাঁরাই।

প্রত্যেক দেশে সাহিত্যের ভিতর দিয়ে এইসব শিক্ষিত শ্রেণী জাতিকে ঊর্ধ্বে টেনে তোলেন। ক্ষুধাতুর আর্ত তাঁদের স্পর্শে রাজা হয়ে উঠে; পল্লীর কৃষক, দূর অজ্ঞাত কুটিরের ভিখারী, জমিদারের ভৃত্য, দরিদ্র গো-যানচালক, অন্ধকারের পাপী, বাজারের দরজি, নগরের ঘড়ি-নির্মাতা, নবাবের ভৃত্য, গ্রাম্য উরুটে যুবকশ্রেণী তাঁদের মন্ত্রে মহাপুরুষ হয়।

এই মন্ত্র গ্রহণ করবার উপযোগী কিছু শক্তি অর্থাৎ তাদের কিছু বর্ণ-জ্ঞান থাকা চাই। এরাই জাতির মেরুদণ্ড, ছোট বলে এদিগকে অস্বীকার করলে জাতি প্রাণশক্তিহীন হয়ে পড়ে। জাতিকে শক্তিশালী, শ্রেষ্ঠ, ধনসম্পদ-শালী, উন্নত ও সুখী করতে হলে শিক্ষা ও জ্ঞান বর্ষার বারিধারার মত সর্ব-সাধারণের মধ্যে সমভাবে বিতরণ করতে হবে। দেশে সরল ও কঠিন ভাষায় নানা প্রকারের পুস্তক প্রচার করলে এই কার্য সিদ্ধ হয়। শক্তিশালী দৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষদের লেখনীর প্রভাবে একটা জাতির মানসিক ও পার্থিব পরিবর্তন অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে সংশোধিত হয়ে থাকে। দেশের প্রত্যেক মানুষ তার ভুল ও কুসংস্কার, অন্ধতা ও জড়তা, হীনতা ও সংকীর্ণতাকে পরিহার করে একটা বিনয় মহিমোজ্জ্বল উচ্চ জীবনের ধারণা করতে শেখে। মনুষ্যত্ব ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করাই সে ধর্ম মনে করে, আত্মমর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন হয় এবং গভীর দৃষ্টি লাভ করে। তারপর বিরাট জাতির বিরাট দেহে শক্তি জেগে ওঠে।

ইংরেজের বিরাট শক্তির অন্তরালে বহু লেখকের লেখনীশক্তি আছে। বস্তুতঃ লেখকের বা জগতের পণ্ডিতবৃন্দ নিভৃতে লোকচক্ষুর অন্তরালে বসে বিশ্বের সকল অনুষ্ঠান ও কর্মকেন্দ্রে গতি প্রদান করেন। তাঁদেরই অজানা হস্তের কার্যফলে অসংখ্য মানুষ মরুভূমে সাগর রচনা করে, সাগর বক্ষে পাহাড় তোলে—জগৎ সভ্যতার নির্মাতা তাঁরাই।

কোন মানুষ যদি এই লেখকশ্রেণীর বা দেশীয় সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ না করে, তবে তারা বড় হীন। জাতির ভিতরকার সকল পণ্ডিতকে হত্যা কর—সমস্ত জাতিটা শক্তিহীন হয়ে পড়বে।

কোন সভ্য জাতিকে অসভ্য করবার ইচ্ছা যদি তোমার থাকে, তাহলে তাদের বইগুলি ধ্বংস কর এবং সকল পণ্ডিতকে হত্যা কর, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

লেখক, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতেরাই জাতির আত্মা—এই আত্মাকে যারা অবহেলা করে তারা বাঁচে না।

দেশকে বা জাতিকে উন্নত করার ইচ্ছা করলে সাহিত্যের সাহায্যেই তা করতে হবে। মানবমঙ্গলের জন্য যত অনুষ্ঠান আছে, তার মধ্যে এইটিই প্রধান ও সম্পূর্ণ।

জাতির ভিতর সাহিত্যের ধারা সৃষ্টি কর; আর কিছুর আবশ্যক নাই। কোন দেশকে সভ্য ও মানুষ করার বাসনা তোমার আছে? তাহলে বিধিব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে, সেই দেশের সাহিত্যকে উন্নত করতে তুমি চেষ্টা কর।

মাতৃভাষার সাহায্যেই সাহিত্যকে উন্নত করতে চেষ্টা করতে হবে। বিদেশী সাহিত্যে মানবসাধারণের কোন কল্যাণ হয় না। দেশীয় সাহিত্যকে উন্নত করতে হবে, আবার বিশ্বের উন্নত সাহিত্যের সারসংগ্রহ করতে হবে। নিজেদের যা কিছু আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকলে জাতির উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

সাহিত্যের শক্তিতে দেশের প্রত্যেক মানুষ শক্তিশালী মহাপুরুষ হতে পারে। মানুষের সকল বিপদের মীমাংসা ভিতর দিয়েই হয়ে থাকে।

জাতি যখন দৃষ্টিসম্পন্ন ও জ্ঞানী হয় তখন জাগবার জন্য সে কারো আহবানের অপেক্ষা করে না; কারণ জাগরণই তার স্বভাব।

আমার সুন্দর

কাজী নজরুল ইসলাম

(১৮৯৯—১৯৭৬)

আমার সুন্দর প্রথম এলেন ছোট গল্প হ'য়ে, তারপর এলেন কবিতা হয়ে। তারপর এলেন গান, সুর, ছন্দ ও ভাব হ'য়ে। উপন্যাস, নাটক, লেখা (গদ্য) হয়েও মাঝে মাঝে এসেছিলেন। 'ধূমকেতু' 'লাঙ্গল' 'গণবাণী'তে, তারপর এই 'নবযুগে' তাঁর শক্তি-সুন্দর প্রকাশ এসেছিল। আর তা এল রুদ্র-তেজে, বিপ্লবের বিদ্রোহের বাণী হ'য়ে। বলতে ভুলে গেছি, যখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সৈনিকের সাজে ফিরে এলাম, তখন সর্বপ্রথম হক সাহেবের দৈনিক পত্র 'নবযুগে' কি লেখাই লিখলাম, আজ তা মনে নেই; কিন্তু পনের দিনের মধ্যেই কাগজের টাকা বাজেয়াপ্ত হ'য়ে গেল।

এই গান লিখি ও সুর দিই যখন, তখন অজস্র অর্থ, যশঃ-সম্মান, অভিনন্দন, ফুল, মালা—বাংলার ছেলেমেয়েদের ভালবাসা পেতে লাগলাম; তখন আমার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ মাত্র। এই সম্মান পাওয়ার কারণ, সাহিত্যিক ও কবিদের মধ্যে আমি প্রথম জেলে যাই, জেলে গিয়ে চল্লিশ দিন অনশনব্রত পালন করি, রাজবন্দীদের উপর অত্যাচারের জন্য। এই অপরাধে আমাকে জেলের নানা রকম শৃঙ্খল-বন্ধন ('লিংক ফেটাস' 'বার ফেটাস' 'ক্রসফেটাস' প্রভৃতি)ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। এই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নাটক আমায় উৎসর্গ করেন, তাঁর এই আশীর্বাদ-মালা পেয়ে আমি জেলের সর্ব-জ্বালা, যন্ত্রণা অনশনক্লেশ ভু'লে যাই। আমার মত নগণ্য তরুণ কবি ও লেখককে কেন তিনি এত অনুগ্রহ ও আনন্দ দিয়েছিলেন, তিনিই জানেন; আমি কোনদিন জিজ্ঞাসা করিনি, তিনিও বলেননি। আজ এই প্রথম মনে হ'ল, তাঁর দক্ষিণ হস্ত দিয়ে আমার সুন্দরের আশীর্বাদ এসেছিল জেলের যন্ত্রণা-ক্লেশ দূর করতে। তখন কিন্তু একথা মনে হয়নি।

তখনও একথা ভাবতে পারিনি, এ লেখা আমার নয়, এ লেখা আমারি নামে আমার প্রথম বন্ধুর, আমারি সুন্দরের, আমারি আত্মা বিজড়িত আমার পরমাত্মীয়ের।

জেলে আমার সুন্দর শৃঙ্খলের কঠিন মালা পরিয়েছিলেন হাতে-পায়ে; জেল থেকে বেরিয়ে এলেই আমার অন্তরের অন্তরতম সুন্দরকে সারা বাঙ্গালা-দেশ দিয়েছিল ফুলের শৃঙ্খল, ভালবাসার সম্ভার, আত্মীয়তার আকুলতা। আট

বৎসর ধরে বাঙ্গালাদেশের প্রায় প্রতি জেলায়, প্রতি মহকুমায়, ছোট বড় গ্রামে ভ্রমণ করে দেশের স্বাধীনতার জন্য গান গেয়ে কখনো কখনো বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালাম। এই প্রথম আমার মাতৃভূমিকে ভালবাসলাম। মনে হ'ল এই আমার মা। তাঁর শ্যাম-স্নিগ্ধ মমতায়, তাঁর গভীর স্নেহ-রসে তাঁর উদার প্রশান্ত আকাশের কখনো ঘন কখনো ফিরোজা-নীলে আমার দেহ-মন-প্রাণ শান্ত-উদার আনন্দ-ছন্দে ছন্দায়িত হয়ে উঠল। আমার অন্তরের সুন্দরের এই অপরূপ প্রকাশকে এই প্রথম দেখলাম প্রকাশ-সুন্দর রূপে আমার জননী জন্মভূমিরূপে।

আমি সেদিনের ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা ও নেত্রীদের আহবানে মাতৃভূমি পরিক্রমণ করেছি; আমি তরুণদের সাথে মিশেছি - বন্ধুবলে, আত্মার আত্মীয় মনে করে। তারাও আমায় আলিঙ্গন করেছে বন্ধুবলে, ভাই বলে— কিন্তু কোনদিন আমার নেতা হবার লোভ হয়নি, আজও সে লোভ হয় না। আমার কেবলি যেন মনে হত, আমি মানুষকে ভালবাসতে পেরেছি। জাতি-ধর্মভেদ আমার কোনদিনও ছিল না, আজও নেই। আমাকে কোনদিন তাই কোন হিন্দু ঘৃণা করেননি। এই আমি প্রথম আমার যৌবন সুন্দর, প্রেম-সুন্দরকে দেখলাম।

তারপর আমার সুন্দর এলেন শোক-সুন্দর হ'য়ে। আমার পুত্র এল নিবিড় স্নেহ-সুন্দর হয়ে। বাইরে মোমের মত ছিল সে সুন্দর, মমতায় মধু-মাধুরী, রস-সুরভি ভরা ছিল তার অন্তরে। সে আমাকে আত্মার মত জড়িয়ে ধরলো। যেখানে যেতাম, সে আমার সাথে যেত। আমার সাথেই খেলত, মান অভিমান করতো। যে সুর শিখাতাম, সে সুর দু'বার শুনেই সে শিখে নিত। তখন তার তিন বছর আটমাস বয়স। একদিন রাত্রে বলল, "বাবা চাঁদের মধ্যে কে একটি ছেলে আমাকে বাঁশী বাজিয়ে ডাকছে।' হঠাৎ আমার দেহে মনে কি যেন বিষাদের, বিরহের, বেদনার ঢেউ দুলে উঠলো। চোখের জলে বুক ভেসে গেল। সেই রাত্রে তার প্রবল জ্বর এল। ভীষণ বসন্তরোগে ভুগে হাসতে হাসতে আনন্দধামের শিশু আনন্দধামে চ'লে গেল।

আমার সুন্দর পৃথিবীর আলো যেন এক নিমিষে নিভে গেল। আমার আনন্দ কবিতা, হাসি, গান যেন কোথায় পালিয়ে গেল, আমার বিরহ, আমার বেদনা সইতে না পেরে। এই আমার শোক সুন্দর।

এই আমার প্রথম প্রশ্ন জাগলো - কোন নিষ্ঠুর এই সৃষ্টি করে, কেন সে শিশু সুন্দরকে কেড়ে নেয়? এই শোকের মাঝে জেগে উঠলো স্রষ্টার বিরুদ্ধে প্রগাঢ় অভিমান, সেই অভিমান ঘনীভূত হয়ে আমার সর্ব অস্তিত্বে দেখা দিল

ভীষণমৌন বিদ্রোহ হয়ে, বিপ্লব হয়ে। চারি দিকে কেবল ধ্বনি উঠতে লাগলো, 'সংহার কর! ধ্বংস কর! বিনাশ কর!' কিন্তু শক্তি কোথায় পাই। কোথায়, কোন্ পথে পাব সেই প্রলয়-সুন্দরের, সংহার সুন্দরের দেখা? আমি বসে চিন্তা করতে লাগলাম। কোথা হতে একজন সাথী এসে বললেন, 'ধ্যান কর, দেখ্‌তে পাবে।' আমি বল্‌লাম, 'ধ্যান কি?' তিনি বললেন, 'একমাত্র তাঁকে ডাকা ও তাঁর চিন্তা করা।' এই প্রথম এলেন আমার ধ্যানসুন্দর। মাঝে মাঝে ভালো লাগতো, মাঝে মাঝে লাগতো না। মাঝে মাঝে ভ্রান্তি, মায়া আমাকে নানারূপে প্রলোভন দেখাতে লাগলো। তাঁরা বললো, 'আমরা তোমার প্রলয়-সুন্দরের প্রলয়-শক্তি, আমাদের সাথে পথ চল, তাহলে স্রষ্টাকে দেখতে পাবে —তা'হলে আমাদের শক্তিতে সংহার করতে পারবে।' আমার যে সহজ সাবলীল আনন্দ-চঞ্চলতা, যৌবনের মদির উন্মাদনা, গান, কবিতা ও সুরের রস-মাধুরী ছিল এদের সাথে পথ চ'লে যেন সব শুকিয়ে গেল।

আমি আমার প্রলয়-সুন্দরকে প্রাণপণে ডাকতে লাগলাম, 'পথ দেখাও, তোমার পথ দেখাও।' কে যেন স্বপ্নে এসে বললে, 'কোরান পড়, ওতে যা লেখা আছে, তা পড়ে তোমার প্রলয়-সুন্দরকে—আমারও ঊর্ধ্বে তোমার পূর্ণতাকে দেখতে পাবে।' আমি নমস্কার করে বললাম, 'তুমিই কি আমার কবিতায়, লেখায় বিদ্রোহ হয়ে, বিপ্লব-বাণী হয়ে আমার কল্পনায়, আমার চেতনায় প্রকাশিত হয়েছিলে?' তিনি আমায় বললেন, 'হ্যাঁ আমিই তোমার পূর্বচেতনার, প্রিকন্‌স্যাসনেস।' ইংরেজীতে বলেন, বোধ হয়, আমি যদি "পূর্বচেতনার" অর্থ না বুঝি তাই। আমি বললাম, 'আবার তোমার সাথে দেখা হবে?' তিনি বললেন, 'আমি যে নিত্য তোমার মাঝে আছি, আমি যে তোমার বন্ধু!' তিনি চলে গেলেন। সুখ-স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল, কিন্তু শিরায় শিরায়, অণু-পরমাণুতে সে স্বপ্নের আনন্দ-অমৃতের শিহরণ সর্ব অঙ্গে জড়িয়ে রইল প্রিয়ার পুষ্পমালার মত হয়ে।

গোপনে পড়তে লাগলাম, বেদান্ত, কোরান। আমার পৃথিবীর আকাশ যে কোন বজ্রনাদে ও তড়িৎ-লেখার তলোয়ারে বিদীর্ণ হয়ে গেল। আমি যে আরো, আরো ঊর্ধ্বে যেতে লাগলাম। দূর হতে দেখতে পেলাম অপরূপ স্বর্ণ সুন্দর জ্যোতিঃ। এই আমার স্বর্ণ-জ্যোতিঃ। সুন্দরকে প্রথম দেখলাম।

সহসা যেন কোন করাল ভয়ংকর শক্তি আমায় নীচের দিকে টানতে লাগলো। বলতে লাগলো, 'তোমার মাতৃঋণ তোমার স্বদেশের ঋণ শোধ না হতে কোথায় যাবে উন্মাদ?" আমি বললাম, 'সাবধান! আমার মাঝে আমার প্রলয় সুন্দর আছেন!' সেই ভয়ংকর বিরুদ্ধ শক্তি প্রবলবেগে নিম্নপানে টানতে লাগল। বলল, 'সেই প্রলয় সুন্দর তোমার মত অজ্ঞানোন্মাদ নন, তোমার

সেই পৃথিবীর ঋণ, ভারতের ঋণ, বাঙলার ঋণ, মানব ঋণ, তোমার আত্মার আত্মীয়ের ঋণ সম্পূর্ণরূপে শোধ না করে তুমি যেতে পারবে না।' আমি বললাম, 'তুমিই কি কোরানে লিখিত অভিশপ্ত-শক্তি শয়তান!' সে হেসে বললে, 'হ্যাঁ, চিনতে পেরেছ দেখে আনন্দিত হলাম। কোরানে কি পড় নাই আমার ঋণ শোধ না করে তুমি স্রষ্টার কাছে যেতে পারবে না, তাঁকে দেখতে পাবে না, আমার বাধাকে অতিক্রম করে যেতে পারবে না!' অনুভব করতে লাগলাম, আমার প্রলয় সুন্দর আর যেন সাহায্য করছে না। মাটির মানুষ মাটিতে ফিরে এলাম। এই পৃথিবীর মাটির মায়া আমাকে মায়ের মত প্রগাঢ় আলিঙ্গনে বক্ষে ধরলেন, চুম্বন করতে লাগলেন, কাঁদতে লাগলেন, আমি বিদ্রোহ ক'রে এই বন্ধন ছিন্ন করতে চাইলে সেই ভয়ংকর শক্তি পৃথিবীর কোল থেকে কেড়ে নিয়ে ভীষণ প্রহার করতে লাগলেন, আমার সহধর্মিনী অর্ধাঙ্গিনী শক্তিকে অর্ধ পঙ্গু ক'রে, শয্যাশায়ী করে দিলেন। অর্থ কমিয়ে দিলেন, ভীষণ ঋণ দেনার রজ্জু বন্ধন করে প্রহার করতে লাগলেন।

আমার পৃথিবী এসে আমাকে ধ'রে আমার জ্বালা জুড়িয়ে দিলেন। এমন সময় এলেন আমার এক না-দেখা বন্ধু। তিনি তাঁর বন্ধু, আমার এক বিদ্রোহী বন্ধুর মারফতে আমার অপরূপ চৈতন্য দিলেন। আমি আবার এই প্রথম ধরিত্রীসুন্দর মাকে ভালবাসলাম, জড়িয়ে ধরলাম! আমার সমস্ত জ্বালা যেন ধীরে ধীরে জুড়িয়ে যেতে লাগল। আমার অন্ধত্ব ঘুচে গেল! আমি আমার পৃথিব মাতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে, বাঙলার দিকে, ভারতের দিকে চেয়ে দেখলাম, দৈন্য, দারিদ্র্যে, অভাবে অসুরের পীড়নে তিনি জর্জরিতা হ'য়ে গেছেন! তাঁর মুখে-চোখে আনন্দ নেই, দেহে শক্তি নেই, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৈত্য-দানব-রাক্ষসের নির্যাতনে ক্ষত বিক্ষত। আমি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার ক'রে বললাম, "আমি ব্রহ্ম চাই না, আল্লাহ্ চাই না, ভগবান চাই না। এই সব নামের কেউ যদি থাকেন, তিনি নিজে এসে দেখা দেবেন! আমার বিপুল কর্ম আছে, আমার অপার অসীম এই ধরিত্রী মাতার ঋণ আছে! আমার বন্দিনী মাকে অসুরের অত্যাচার থেকে উদ্ধার করে আবার পূর্ণশ্রী-সুন্দর, আনন্দ-সুন্দর না করা পর্যন্ত আমার মুক্তি নেই, আমার শান্তি নেই।"

ভয়ংকর শক্তি আনন্দে হেসে উঠল। আমি বললাম, 'এ তোমার অভিনয়।' সে বলল, 'এ আমি প্রথম তোমার কাছে সত্যি ক'রে হাসলাম। অভিনয় করিনি।' চেয়ে দেখি, আমার পানে চেয়ে পৃথিবীর ফুল আনন্দে ঝরে পড়ল। আমি মাটি থেকে তাকে বুকে তুলে বললাম, 'কেন তুমি ঝরলে?' ফুল বললে, 'আমার মা লতাকে জিজ্ঞাসা কর, আমার রূপ-রস-সুরভি-মধুকে জিজ্ঞাসা কর। তুমি যে এই পৃথিবীর সুন্দর মানুষ, তোমার মাঝে আমার সুন্দর

আছেন, সেই সুন্দরকে দেখে আমি আনন্দে ঝরে পড়লাম।' আমি ফুলকে চুম্বন করলাম, অধরে বক্ষে কপোলে রেখে আদর করলাম। ফুল বললো, 'আমার সুন্দরকে পেয়েছি, আমার এই রূপ-রস-মধু সুরভি নিয়ে তোমার মাঝে নিত্য হ'য়ে থাকব।' এই আমি প্রথম পুষ্পিত সুন্দরকে দেখলাম। এই রূপে চাঁদের আলো, সকাল সন্ধ্যার অরুণ-কিরণ, ঘনশ্যাম-সুন্দর বনানী, তরঙ্গ হিল্লোলিতা ঝর্ণা, তটিনী, কূলহারা নীল-ঘন সাগর, দশদিক বিহারী সমীরণ আমায় জড়িয়ে ধরল! আমার সাথে মধুর ভাষায় বন্ধুর মত, সখার মত, কথা কইল। আমায় 'আমার সুন্দর' ব'লে ডাকল।

সহসা এল ঊর্ধ্ব গগনে বৈশাখী ঝড়, প্রগাঢ়-নীল কৃষ্ণ মেঘমালাকে জড়িয়ে। ঘন ঘন গম্ভীর ডমরু ধ্বনিতে বহ্নি-বর্ণা দামিনী-নাগিনীর ত্বরিত চঞ্চল সঞ্চারণে আমার বাহিরে অন্তরে যেন অপরূপ আনন্দ তরঙ্গায়িত হ'য়ে উঠল। সহসা আমার কণ্ঠে গান হয়ে, সুর হয়ে আবির্ভূত হল—'এল রে প্রলয়ংকর-সুন্দর বৈশাখী ঝড় মেঘ-মালা জড়ায়ে।' আমি সজল ব্যাকুল কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলাম, 'তুমি কে— কে?' মধুর সহজ কণ্ঠে উত্তর এল, 'তোমার প্রলয়-সুন্দর বন্ধু।'

আমি তখন বললাম, 'তুমি তো আমায় ত্যাগ করে চ'লে গিয়েছিলে, আবার কি জন্যে এলে?' সে আমার আত্মাকে জড়িয়ে ধ'রে বলল, 'তুমি স্রষ্টাকে সংহার করে তোমার মাকে সংহার করতে, মাতৃহত্যা ক'রতে চেয়েছিলে, আত্মসংহার করতে চেয়েছিলে। তাই আমি তোমার দু'ধারী তলোয়ার কেড়ে নিয়ে অভিমানে ফিরে গেছি। তোমার চৈতন্য ফিরে এসেছে, তোমার মাঝেই তোমার স্রষ্টাকে দেখতে পাবে আজ—সৃষ্টিতে, পৃথিবীতে, আকাশে, বাতাসে, রস-ভরা ফলে, সুরভিত ফুলে, স্নিগ্ধমৃত্তিকায়, শীতল জলে, সুখদায়ী সমীরণে, তোমার সৃষ্টিসুন্দরকে প্রকাশ-স্বরূপে দেখেছ। তোমার না-দেখা পরম প্রিয়তম, পরম বন্ধুকে পেতে, বিপুল অসহ্য তৃষ্ণা, স্বপ্ন, সাধ, কল্পনা বাধা না মানা বেগসহ অসীমের পানে প্রবল প্রবাহ নিয়ে উজান গতিতে ঊর্ধ্বের পানে চলেছিলে, আজ সেই পরম পূর্ণতার, পরম শান্তির, পরম মুক্তির আনন্দ বাণী নিয়ে আমি তোমার কাছে এসেছি তোমার বন্ধু হ'য়ে। এই পৃথিবীতেই তার সঙ্গে তোমার অপরূপ পূর্ণ মিলন হবে। তার আগে তোমাকে এই অসুন্দর পৃথিবীকে সুন্দর করতে হবে। সর্ব অসাম্য, ভেদকে দূর করতে হবে। মানুষ যে তার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, পৃথিবীতে তা তোমাকে প্রমাণ করতে হবে। তারপর হবে তোমার সুন্দরের সাথে পরম বিলাস, বিহার।'

শুনে আমি আনন্দে অপরূপ মাভৈঃ ধ্বনি করে বললাম, 'তবে দাও বন্ধু, আমার দুধারী তলোয়ার, দাও আমায় তোমার বিপ্লবের বিষাণ শিঙ্গা।

দাও আমায় অসুর-দৈত্য সংহারী ত্রিশূল ডমরুধ্বনি! দাও আমার ঝঞ্ঝার জটিল জটা, দাও আমায় বাঙলার সুন্দরবনের বাঘাম্বর। দাও ললাটে প্রদীপ্ত বহ্নি-শিখা, দাও আমার জটাজুটে শিশুশশীর স্নিগ্ধ হাসি। দাও আমায় তৃতীয় নয়ন, দাও সেই তৃতীয় নয়নে অসুর দানব সংহারের শক্তি। দাও আমার কণ্ঠে পৃথিবীর বিষ, করো আমায় বিষ-সুন্দর-নীলকণ্ঠ। দাও আমায় দামিনী-তড়িতের কন্ঠমালা। দাও আমার চরণে নটরাজের বিষম তালের নৃত্যায়িত ছন্দ।'

বন্ধু হেসে বললেন, 'সব পাবে, তোমার অপ্রাপ্য কিছুই নেই। আর কিছুদিন দেরী আছে। তুমি অভিমান করে বিদ্রোহ করে নিজের কি ক্ষতি করেছ, নিজে কি কখনো চেয়ে দেখেছ? তুমি অরণ্য-কন্টক কর্দমাক্ত পথে নিজের সর্বাঙ্গকে ক্ষত বিক্ষত শক্তিহীন ক'রে ফেলেছ। তোমার এই সব অপূর্ণতা পূর্ণ হোক, তখন তোমার প্রলয় সুন্দর তোমার সর্বদেহে আবির্ভূত হবেন। তোমার সুন্দরকে তুমি লতার মত জড়িয়ে ধরবে তাঁর না শোনা বাণী তোমার লেখায় ফলের মত ঝরে পড়বে।' আমি বললাম, 'তথাস্তু!' প্রলয় সুন্দর বললেন, 'সাধু! সাধু! তথাস্তু!'

নবযুগ

কাজী নজরুল ইসলাম

আজ মহাবিশ্বে মহাজাগরণ, আজ মহামাতার মহা আনন্দের দিন, আজ মহামানবতার মহাযুগের মহাউদ্বোধন! আজ নারায়ণ ক্ষীরোধ-সাগরে নিদ্রিত নন। নরের মাঝে আজ তাঁহার মুক্তি-কাঙ্গাল বেশ। ঐ শোনো, শৃঙ্খলিত নিপীড়িত বন্দীদের শৃঙ্খলের ঝনৎকার। তাহারা শৃঙ্খল-মুক্ত হইবে, তাহারা কারাগৃহ ভাঙিবে। ঐ শোনো মুক্তি পাগল মৃত্যুঞ্জয় ঈশানের মুক্তি বিষাণ! ঐ শোনো, মহামাতা জগদ্ধাত্রীর শুভ শঙ্খ! ঐ শোনো, ইসরাফিলের সিঙ্গায় নব সৃষ্টির উল্লাস-ঘন রোল। ঐ যে ভীম রণ-কোলাহল, তাতেই মুক্তিকামী দৃপ্ত তরুণের শিকল টুটার শব্দ ঝন ঝন করিয়া বাজিতেছে। সাগ্নিক ঋষির ঋক্‌মন্ত্র আজ বাণীলাভ করিয়াছে অগ্নিপাথারের অগ্নিকল্লোলে। আজ নিখিল উৎপীড়িতের প্রাণ শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে ঐ মন্ত্র-শিখার পরশ পাইয়া। আজ তাহারা অন্ধ নয়। তাহাদের চোখের উপরকার কৃষ্ণ পর্দা তীব্র বহ্নিঘাতে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহাদের নয়নে আজ মুক্তজ্যোতিঃ বিস্ফোরিত। আজ নূতন করিয়া মহাগগনতলে দাঁড়াইয়া ঐ অনাদি অসীম মুক্তশূন্যতার পানে তাহারা চাহিয়া দেখিয়াছে, কোথায় সে-অনন্ত মুক্তি, আর কোথায় তাহারা পড়িয়া আছে বন্ধন-জর্জরিত। নরে আর নারায়ণে আজ আর ভেদ নাই। আজ নারায়ণ মানব। তাঁহার হাতে স্বাধীনতার বাঁশী। সে বাঁশীর সুরে সুরে নিখিল মানবের অণু-পরমাণু ক্ষিপ্ত হইয়া সাড়া দিয়াছে। আজ রক্ত-প্রভাতে দাঁড়াইয়া মানব নব প্রভাতী ধরিয়াছে—"পোহাল পোহাল বিভাবরী, পূর্ব তোরণে শুনি বাঁশরী।" এ সুর নবযুগের। সর্বনাশা বাঁশীর সুর রুশিয়া শুনিয়াছে, আয়ল্যান্ড শুনিয়াছে, তুর্ক শুনিয়াছে, আরো অনেকে শুনিয়াছে এবং সেই সংগে শুনিয়াছে আমাদের হিন্দুস্থান—জর্জরিত, নিপীড়িত, শৃঙ্খলিত ভারতবর্ষ।

ভারত যে দিন জাগিল, সেদিন নিজের পানে চাহিয়া সে নিজেই লজ্জায় মরিয়া গেল। সে দিন সর্বাপেক্ষা অপমানিত পদানত ঘৃণ্য সে। কত শত বর্ষের কত শত শৃঙ্খলের কত লক্ষ বাঁধনই না মোচড় খাইয়া খাইয়া দাগ কাটিয়া বসিয়া গিয়াছে—তাহার অস্থিপঞ্জর ভেদ করিয়া মর্মের মর্মস্থলে। কত গোলা, কত গুলি, কত বল্লম; কত তলোয়ারই না তাহার বুকে ঝাঁঝড়া করিয়া দিয়াছে। পৃষ্ঠে তাহার নিষ্করুণ বেত্রাঘাত ও দুর্বিনীত পদাঘাতের দুর্বিষহ বেদনা ঘা। গর্দানে তাহার নির্দয় খামখেয়ালী পশুশক্তির বিপুল জগদ্দল শিলা। চক্ষে তাহার সাত পুরু করিয়া কাপড় বাঁধা। সেই যে গা মোড়া

দিয়া উঠিল, অমনি তাহার আগেকার কাঁচা ঘায় সপাৎ করিয়া জল্লাদের লৌহ হস্তের কাঁটার চাবুক বসিল। অসহনীয় সে নির্মম অপমানে সে যখন ক্ষিপ্তের মত হাত-পা ছুঁড়িয়া গর্দানের বোঝা জোর করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া শির উঁচু করিয়া তাকাইল তখন কসাইর ভোঁতা ছোরা দিয়া কচলাইয়া কচলাইয়া তাহার প্রাণপ্রিয় সন্তানগুলিকে তাহারই বুকের উপর রাখিয়া হত্যা করা হইল। হা-হা করিয়া যখন মা তাহার বাছাদের রক্ষা করিতে গেল, তখন তাহারই দলিত শিশুর কলিজা-মথিত রক্তের বিপুল ঝাপটা তাহার মুখে ছিটকাইয়া দেওয়া হইল। সেই সন্তানের রক্ত-মাখানো দৃষ্টি দিয়া সে জলভরা চোখে দেখিল পূর্ব তোরণে অগ্নিরাগে লেখা রহিয়াছে "নবযুগ"। নয়ন দিয়া তাহার হু হু করিয়া অশ্রু শত পাগল-ঝোরা ছুটিল। সে তাহার কোলের কাটা সন্তানের মুণ্ড ফেলিয়া শুধুই ব্যগ্র বাহুর আকুল আলিঙ্গন মেলিয়া নবযুগকে আহবান করিল, "তুমি এস।" নবযুগ সেই ব্যাকুল কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পায়ে মাথা রাখিয়া বলিল, "আর আমায় ছাড়িও না মা! এমনই করিয়া যুগে যুগে আমায় আহবান করিয়ো।"

আবার দূরে সেই সর্বনাশা বাঁশীর সুর বাজিয়া উঠিল। রুশিয়া বলিল, "মারো অত্যাচারীকে। ওড়াও স্বাধীনতা-বিরোধীর শির! ভাঙ্গো দাসত্বের নিগড়। এ বিশ্বে সবাই স্বাধীন। মুক্ত আকাশের এই মুক্ত মাঠে দাঁড়াইয়া কে কাহার অধীনতা স্বীকার করিবে? এই 'খোদার উপর খোদকারী' শক্তিকে দলিত কর। এই স্বার্থের শাসনকে শাসন করো! "আল্লাহু আকবর" বলিয়া তুর্কী সাড়া দিল। তাহার শূন্য নত শিরে আবার অর্ধচন্দ্র লাঞ্ছিত রক্তশিখ ফেজের রক্ত রাগ স্বাধীনতাপহারীর অন্তরে মহাভীতির সঞ্চার করিল, শিথিল মুষ্ঠির ভূলুণ্ঠিত রবাব আবার আস্ফালন করিয়া উঠিল। আইরিশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "যুদ্ধ শেষ হয় নাই। এখনো বিশ্বে দানব শক্তির বজ্রমুষ্ঠি আমাদের টুঁটি টিপিয়া ধরিয়া রহিয়াছে। এ-অসুর শক্তি ধ্বংস না হইলে দেবতা বাঁচিবে না; যজ্ঞ জ্বলুক; এ-হোম শিখায় যদি কেহ যোগ না দেয়, আমরা আমাদের প্রাণ আহুতি দিব।" এমন সময় ভারত জাগিল। এত দিনে ভারতের বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ-আঁখি মেলিয়া চাহিলেন। ভারত ব্যাপিয়া হর্ষ-বাণীর মহাকল্লোল কল কল নিনাদে ধ্বনিত হইল। "আবিরাবির্ম এধি"! আবির্ভাব হও! আবির্ভাব হও!! সারা বিশ্ব কান পাতিয়া সে মুক্তি-কল্লোল শুনিল। যুগাবতারের কাঙাল বেশে করুণ নয়নপাতে সারা বিশ্বের আর্ত-নিখিলের বন্ধন-কাতরতা আর মুক্তি লিপ্সা মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিল। একই দুঃখে আজ দুঃখী জনগণ দেশ, জাতি, সমাজের বহির্বন্ধন ভুলিয়া পরস্পর পরস্পরকে বুকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিল। আজ তাহারা এক, তাহারা একই ব্যথায়

ব্যথিত, নীপিড়িত সত্য মানবাত্মা। আজ কেহ কাহাকেও বাহির হইতে দেখে নাই। অন্তর দিয়া পরস্পরের বন্ধন-বেদনাতুর অন্তর দেখিয়াছে। তাহাদের উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত রবে—ঐ দেখ-বুঝি বন্ধন-প্রয়াসীর মুখ কালো হইয়া গেল, হস্তমুষ্ঠি শিথিল হইয়া গেল।

ঐ শোন, নবযুগের অগ্নিশিখা নবীন সন্ন্যাসীর মন্ত্রবাণী। ঐ বাণীই রণক্লান্ত সৈনিককে নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছে। ঐ শোন, তরুণ কণ্ঠের বীরবাণী, আমাদের মধ্যে ধর্ম-বিদ্বেষ নাই, বর্ণ-বিদ্বেষ নাই, আভিজত্য-অভিমান নাই। আমরা আমাদের এই মুক্তিকামী নিহত ভাইদের রক্তপূত সবুজ প্রান্তরে দাঁড়াইয়া তাহাদের পবিত্র স্মৃতির তর্পণ করিতেছি। পরস্পর পরস্পরকে ভাই বলিয়া, একই অবিচ্ছিন্ন মহাত্মার অংশ বলিয়া অন্তরের দিক হইতে চিনিয়াছি। এই রক্ত-সমাধির পাশে দাঁড়াইয়া আমরা যেন স্বার্থ ভুলিয়া যাই। একই বিশ্বে একই বিশ্বমাতার বড়-ছোট ভাই বলিয়া যেন করুণা ধারায় আমাদের বুক সিক্ত হইয়া ওঠে। আজ এ মহামিলনে যেন এতটুকু দীনতা থাকে না। এই মহামানবের সাগরতীরে শ্মশান বেলায় আমাদের এই যুগ-বাঞ্ছিত মহামিলন পবিত্র হউক।

দাঁড়াও জন্মভূমি জননী আমার। ঐকবার দাঁড়াও !! যেদিন তুমি সমস্ত বাধা-বন্ধন-মুক্ত, মহা-মহিমাময়ী বেশে স্বাধীন বিশ্বের পানে অসংকোচ দৃষ্টি তুলিয়া তাকাইবে, সেদিন যেন নিজের এই ক্ষত-বিক্ষত অঙ্গ, ঝাঁঝরা-পারা বক্ষ, সুত-শোণিত-লিপ্ত ক্রোড় দেখিয়া কাঁদিয়ো না। তোমার পুত্র-শোকাতুরা বুকের নিবিড় বেদনা সে দিন যেন উথলিয়া উঠে না মা। সে দিন তুমি তোমার মুক্ত শিশুদের হাত ধরিয়া বিশ্বমঞ্চে বীরপ্রসূ জননীর মত উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়ো। ঐ দূর সাগর হইতে তোমার মুখে সেদিন যেন নবপ্রভাতের তরুণ হাসি দেখি। যে বীরপুত্র তাহার তরুণ অসমাপ্ত জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা তোমার মুক্তির জন্য বলিদান দিয়া বিদায় লইয়াছে, সেদিন তাহাকে হয়ত তোমার বেশী করিয়া মনে পড়িবে, কিন্তু সে দিন আর চোখের জল ফেলিও না মা। বুকজোড়া হাহাকার তোমার সে দিন কোলের সন্তানদের দেখিয়া ভুলিতে চেষ্টা করিয়ো।

এস ভাই হিন্দু ! এস ভাই মুসলমান ! এস বৌদ্ধ ! এস ক্রিশ্চিয়ান। আজ আমরা সবগন্ডী কাটাইয়া সব সংকীর্ণতা, সব মিথ্যা, সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি। আজ আমরা আর কলহ করিব না। চাহিয়া দেখ, পাশে তোমাদের মহাশয়নে শায়িত ঐ বীর ভ্রাতৃ-গণের শব। ঐ গোরস্থান—ঐ শ্মশান ভূমিতে—শোন শোন তাহাদের করুণ আত্মার অতৃপ্ত ক্রন্দন। এ-পবিত্র স্থানে আজ স্বার্থের দ্বন্দ্ব মিটাইয়া দাও ভাই।

ঐ শহীদ ভাইদের মুখ মনে কর, আর গভীর বেদনায় মূক স্তব্ধ হইয়া যাও। মনে কর তোমাকে মুক্তি দিতেই সে এমন করিয়া অসময়ে বিদায় লইয়াছে। উহার সে ত্যাগের অপমান করিয়ো না! ভুলিয়ো না! আজ আর কলহ নয়, আজ আমাদের ভাই-এ-ভাই-এ বোনে-বোনে মায়ের কাছে অনুযোগের আর অভিযোগের এই মধুর কলহ হইবে যে, কে মায়ের কোলে চড়িবে আর কে মায়ের কাঁধে উঠিবে।

আদেশপন্থী ও অনুপ্রেরণাপন্থী

মোতাহের হোসেন চৌধুরী

(১৯০৩—১৯৫৬)

সমাজ মাত্রেই সাধারণতঃ দু'প্রকার মানুষের বাস দেখতে পাওয়া যায়। একপ্রকার আদেশপন্থী আরেক প্রকার অনুপ্রেরণাপন্থী। আদেশপন্থী যারা তাদের জন্য দরকার একটা ধরাবাঁধা পথ। অন্তরের সহজ উপলব্ধি বিসর্জন দিয়ে তারা একান্ত করে আঁকড়িয়ে ধরে সংস্কার অথবা শাস্ত্রের আদেশকে। আর অনুপ্রেরণাপন্থী হচ্ছে সেই দলের লোক, অন্তরের গভীরতম লোকে যারা অনুভব করে একটা স্পন্দন, যা ইঙ্গিতে তাদেরকে জানিয়ে দেয় কি তাদের করণীয়, কিইবা তাদের করণীয় নয়। আদেশপন্থী ভাবে—মানুষ রক্তমাংসের জীব, অপৌরুষের শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথ ছাড়া অন্য থে চলা তার পক্ষে মারাত্মক। অনুপ্রেরণাপন্থী উপলব্ধি করে মানুষ অনুভূতিহীন অন্যাধ্যাত্মিক জীব নয়; দেহ প্রাণের ঊর্ধ্বে তার আত্মা—জীবনের সর্বময় প্রভু; ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়ে এই আত্মার আদেশই তার মান্য, অন্য আদেশ মৃত্যুর কারণ।

এই আন্তরিক পার্থক্যের দরুন উপরোক্ত দু'ধরনের মানুষের কার্যকলাপেও বিস্তর প্রভেদ। অনুপ্রেরণাপন্থী চলে চক্ষুষ্মান মানুষের মতো সজীবত্বের আনন্দে আপনার পথ আপনি নির্বাচন করে; সন্ধানী সে; know-thyself' নিজেকে জান-এই হল তার মন্ত্র। সুতরাং সুপ্তভাবে নয়, জাগ্রতভাবে আত্মার চৈতন্যসুধা পান করতে করতে নিজের ও জগতের পরিচয় লাভ করা হল তার ধর্ম। আদেশপন্থী কিন্তু চলে অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে আদেশের যষ্টি হাতে ক'রে। কোন প্রকারে সংসার-পথ চলা তার হয় বটে, কিন্তু সে চলায় না আছে চক্ষু খুলে নিজের ইচ্ছামতো এগিয়ে চলার আনন্দ, না আছে জগতের ও জীবনের অনির্বচনীয়ত্বের উপলব্ধি। কোন প্রকার নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করে কাল কাটানোই তো জীবন নয়; জীবন মানে অনন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ আত্মার অস্তিত্বের উপলব্ধি, আর নানাভাবে সে অস্তিত্বের বিকাশ—অন্ততঃ বিকাশের অকপট চেষ্টা। এই অস্তিত্বের বিকাশের পথেই সৃষ্টি হয় সাহিত্য, শিল্প দর্শন ইত্যাদি যা জগৎকে নানা দিক দিয়ে সমৃদ্ধ ক'রে মানুষের জ্ঞান ও প্রেমের পথ সুগম করে দেয়। মানুষের অন্তরে যে অনুভূতির প্রেরণা নানা ভাবের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাই নিজেকে সার্থক করে চলে। স্থাণুত্ব নয়, গতিশীলতাই তার প্রাণ, প্রকাশই তার মূল

মন্ত্র। অন্তরে যে উপলব্ধি, বাইরে প্রকাশিত হ'য়ে তাই সৃষ্টি নামে অভিহিত সুতরাং এক হিসাবে কমবেশী সমস্ত মানুষই স্রষ্টা—সৃজনেচ্ছাই তাদেরকে পশু থেকে পৃথক করেছে।

কিন্তু আদেশপন্থী মানুষেরা এই সৃজনেচ্ছাকে টুঁটি চেপে মারবার জন্য প্রস্তুত। কেননা, আদেশপন্থী অনুকারক, আর অনুকারক নিজে যেমন সৃষ্টি করতে পারে না, অন্যের সৃজন ক্ষমতায়ও সে তেমনি আস্থাবান নয়, বাইরের অনুজ্ঞার উপর অতিরিক্ত নির্ভর করতে করতে অন্তরের সহজ উপলব্ধি হারিয়ে বসেছে বলেই আদেশপন্থী সৃজনশক্তিহীন, আর অন্তরের স্বাভাবিক অনুভূতি হারায়নি বলেই অনুপ্রেরণাপন্থী স্রষ্টা।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটি পরিষ্কার করবার চেষ্টা করছি।—বাবর, আকবর, শা' জাহাঁ, হারুণ-অল-রশিদ ও অল্-মামুন প্রভৃতি বাদশা, আর হাফেজ, সা'দী, ইবনে রোশদ, ওমর খৈয়াম প্রমুখ কবি দার্শনিক শুধু মুসলিম ইতিহাসে নয় জগতের ইতিহাসে গৌরবান্বিত স্রষ্টার পদের অধিকারী। একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যাবে এসব মহারথিগণও আদেশপন্থী নন অনুপ্রেরণাপন্থী - জীবনের সর্বত্র না হলেও যেখানে তাঁরা স্রষ্টা সেখানে। ধরুন তাজ স্রষ্টা শা'জাঁহার কথা। যেখানে শরীয়তের আদেশ নিষেধ তিনি মেনে চলেছেন সেখানে তাঁর সৃষ্টির পরিচয় নেই, আছে সেখানেই যেখানে শাস্ত্রকে ডিঙ্গিয়ে অন্তরের ইঙ্গিতকেই তিনি বড় করে দেখেছেন। মর্মরস্বপ্ন তাজমহলের পানে তাকিয়ে একথা আমরা স্বচ্ছন্দে বলতে পারি। তাজ-সৃষ্টির পেছনে যে প্রেম ও সৌন্দর্যানুভূতি বিদ্যমান, সৌন্দর্যপ্রেমিক শা'জাহাঁ যদি শাস্ত্রের মধ্যে তাঁর প্রতিধ্বনি খুঁজতে যেতেন তাহলে 'কালের কপোল তলে', 'শুভ্র সমুজ্জ্বল', এ তাজমহল দর্শনের সৌভাগ্য আমাদের হত কিনা সন্দেহ।

প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের পানে তাকালেও ঠিক এই এক সত্যই উপলব্ধি করা যায়—অনুপ্রেরণাপন্থীই সৃজনধর্মী, আদেশপন্থী নয়। মহাত্মা রামমোহন রায়ের পূর্বের শাস্ত্রসর্বস্ব বাংলা আর বর্তমান যুগের অনেকটা শাস্ত্রশাসন-মুক্ত বাংলার তুলনামূলক সমালোচনা করলেই কথাটির সত্যতা সহজবোধ্য হ'বে। আদেশপন্থী পোপদের রাজত্বে জগৎ কি মহান সৃষ্টির অধিকারী হয়েছে অতীতের কুক্ষি ঘেঁটে অনেক চেষ্টা চরিত্র ক'রে তা জানতে হয়। কিন্তু Renaissance-এর আমল থেকে আজ পর্যন্ত যে-সব দানে জগৎ সমৃদ্ধ হয়েছে নিতান্ত অনৈতিহাসিকের কাছেও তা অবিদিত নেই।

আদেশপন্থী একটি জাতিকে কিভাবে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায় বাংলার মুসলমান সমাজের পানে তাকালেই তা সহজেই অনুমান করা যায়। আমাদের সমাজ যে সব দিক দিয়ে দরিদ্র, কোন রকমের নব-সৃষ্টির কাজেই যে

তারা হাত দিতে পারছে না, মনে হয়, সমাজে আদেশপন্থী মানুষের প্রাচুর্য ও প্রাধান্যই তার কারণ। অন্তরের আদেশ মেনে চলা তো দূরের কথা, অন্তরের আদেশ বলে যে একটা আদেশ আছে—ঐ কথাটাই সমাজের শতকরা নিরানব্বই জনের কাছে ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। সত্য বলতে কি, শাস্ত্রের প্রাধান্য আমাদিগকে মন ও আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে উদাসীন করে রেখেছে। অন্তরের শুভবুদ্ধিকে নয়, শাস্ত্রকেই আমরা কল্যাণপথের একমাত্র দিশারীরূপে গ্রহণ করেছি। এটাও একপ্রকার দাসমনোভাব, আর এই দাসমনোভাবই চিৎ-শক্তিতে জড়ত্ব আনয়ন ক'রে আমাদের স্বাভাবিক ধর্মবোধটির বিকাশের পথে অন্তরায় হ'য়ে আছে। এই জন্যেই আদেশ-প্রধান ধর্মকে বস্তুতান্ত্রিক ধর্ম বলতে চাই। চিৎ-শক্তি নষ্ট ক'রে যা জড়ত্ব আনয়ন করে তাকে বস্তু তান্ত্রিক ছাড়া আর কি-ই বা বলা যেতে পারে।

'স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়া চ'। কিন্তু এই স্বাভাবিক জ্ঞান ও বলের উপর মানুষ আর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছে কই? আত্মা যে তার পঙ্গু, আদেশ ছাড়া এক পা নড়াও তার পক্ষে অসম্ভব। ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে, অন্তরের সহজ উপলব্ধি হারিয়ে সে পেয়েছে কতকগুলি বাইরের শুকনো নীতি, যার উদ্দেশ্য হ'ল কোন প্রকারে মানুষকে সৎপথে রাখা। কিন্তু বাইরের নীতির দ্বারা মানুষকে সৎপথে রাখবার চেষ্টা বোতল বোতল কড্‌লিভার অয়েল খাইয়ে দুর্বল শরীরে স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনবার চেষ্টার মতোই দুরূহ! কড্‌লিভার অয়েলে যার স্বাস্থ্য ফেরে, জানতে হবে, তার শরীরে এমন কোন স্বাভাবিক উপাদান বিদ্যমান কড্‌লিভারের সহায়তায় যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে মাত্র। বাইরের আদেশের দ্বারা শাসিত হ'য়ে শ্রেয় পথ চলা অনেকটা নাক-চোখ টিপে কুইনাইন গেলার মতোই কষ্টদায়ক। জোর-জবরদস্তির কাজে যে স্বাচ্ছন্দ্য ও সৌন্দর্যের অভাব, নীতিশীলদের জীবনে তা পুরোমাত্রায় বিদ্যমান; তাই শ্রেয়ান্বেষণকে স্বভাবে পরিণত করা, অথবা শ্রেয়কে প্রেয়ে পরিণত করাই আমাদের কর্তব্য।

'পরান যা চায় তাইতো পরম
সহজ ফেলে কোথায় ধরম।'

প্রাণের এই অবস্থা-প্রাপ্তির জন্যেই তো মানুষের যতো তপস্যা, সাধনা ও শিক্ষা-দীক্ষা।

মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনা হচ্ছে 'অন্তর মম বিকশিত কর অন্তরতর হে।' দেখা যাচ্ছে, এই প্রার্থনাই আমাদের জন্য হারাম, নিষিদ্ধ। অন্তরকে বিকশিত না ক'রে চেপে মারবার জন্যই আমরা বেশী প্রস্তুত। একটা সম্প্রদায়ের পক্ষে এ অত্যন্ত মারাত্মক ব্যবস্থা। তবে প্রশ্ন হ'তে পারে—মানুষের অন্তর কি ভুল করে না, আর শাস্ত্রের আদেশের পিছনে কি কোন শুভ ইচ্ছা নেই?...উত্তরে

বলতে চাই—অন্তরের পক্ষে ভুল করা অসম্ভব নয়. আর শাস্ত্রের পেছনেও শুভ-বুদ্ধি বর্তমান। কিন্তু তাতে আসে যায় কি। অন্তর ভুল করলেও তাই মানুষের জন্যে সত্য। হোঁচট খেতে খেতেই শিশুরা হাঁটতে শেখে আর ভুল করতে করতেই মানুষ সত্যে পেঁৗছে। অবশ্য সত্যে পেঁৗছাবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা না থাকলে ভুল করাই তার সার হয় সত্যে পেঁৗছা আর হ'য়ে উঠে না ? গ্যেটে বলেছেন—All your ideals shall not prevent me from being genuine and good and bad like nature--দার্শনিক কবির এই বীর্যবন্ত বাণী অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য ; অকুতোভয় সন্ধানী মানুষের এই চরম আদর্শ।

শাস্ত্রের পেছনে যে শুভ-বুদ্ধি বর্তমান তা অস্বীকার্য নয়। মানব-মঙ্গলও লোকস্থিতির দ্যোতনারই শাস্ত্রের সৃষ্টি। কিন্তু অন্তরকে প্রাধান্য না দিয়ে শাস্ত্রকে প্রাধান্য দিয়েছি বলে শুভবুদ্ধিটুকুও আমাদের অনুভবে আসে না। আধ্যাত্মিক ব্যাপারের কথা না হয় বাদই দিলাম, সাধারণ জাগতিক ব্যাপার-গুলিও শাস্ত্রের সহায়তা ব্যতীত সম্পন্ন হ'তে পারে না। সঙ্গীত চর্চা করতে চাও, খোঁজো শাস্ত্রের আদেশ ; ছবি আঁকবে দেখ শরীয়ত কি বলে : অনেকের দৃষ্টি আবার এমনি আচ্ছন্ন যে, গল্প-কবিতা লেখা সম্বন্ধেও তারা শাস্ত্রের অভিমত প্রয়োজনীয় মনে করে। কেননা তাতে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। স্বীকার করি স্থূলবুদ্ধি—সাধারণ মানুষের জন্য আদেশের দরকার আছে। সাধারণ মানুষ তো সবসময়ই পৌত্তলিক : শাস্ত্র অথবা মূর্তির সামনে অবনত মস্তক হওয়া তার স্বভাব। সহজ পথের যাত্রী সে। আত্মনির্ভরতার দুরূহ ভার মাথা পেতে নেওয়া তার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব। তাই নির্ঝঞ্ঝাটে সহজ জীবন যাপনের জন্য শাস্ত্রকে সে একান্তরূপে গ্রহণ করে; ভাবে শাস্ত্রকে জীবন তরীর কর্ণধার ক'রে দিব্যি আরামে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভবনদীর পর-পারে পেঁৗছবে। কিন্তু, জানেনা সে, জীবন-তরীর কর্ণধার তো মনুষ্য নিজেই, যাত্রীও সে নিজে। ঘুম নয় জাগরণ তার ললাটের লিপি।

না হয় ধরে নিলাম উপলব্ধিহীন সাধারণ মানুষের অনুকরন ও অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু মুশকিল এই যে, উপলব্ধি যেখানে সজীব সেখানেও চলে সমাজের শাসন এই সজীবত্ব নষ্ট করবার জন্য। বার্ক বলেছেন : The days of dragooning and inquisition are gone,—কিন্তু তাঁর বিদ্রোহী আত্মা হয়তো স্বর্গ হ'তে দেখতে পাচ্ছে, তাঁর মত ভ্রান্ত, ভিন্ন নামে ও ভিন্ন ধরনে বাংলার সমাজবিশেষে তারা এখনো বিরাজিত। মনে হয়, এই অতি-রিক্ত শাস্ত্রানুগত্যই মুসলমান সমাজের অবনতির প্রধান কারণ। একটা জাতির গৌরবান্বিতভাবে বাঁচবার জন্য বৃহৎ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের দরকার। শাস্ত্রানুগত্য এ ধরনের মানুষ সৃষ্টির পরিপন্থী। বৃহৎ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ

গতানুগতিক পথের যাত্রী নন নিত্য নতুনের অভিসারে তাঁর যাত্রা। কিন্তু শাস্ত্র গতানুগতিক পথেরই জয় ঘোষণা করে। গতানুগতিক-পন্থী ব'লেই আজ আমাদের সমাজে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব হচ্ছে না।

বিজ্ঞান তর্কবুদ্ধির পরিণতি, আর সাহিত্য প্রেরণার। বিজ্ঞানের কথা বলবার অধিকারী আমি নই। সাহিত্যের কথাই বলছি। জগতের সম্পর্কে এসে অন্তরে যে-সব অনুভূতির সঞ্চার হয়, দরদ ও কল্পনার রঙে রঞ্জিত হয়ে তাই সাহিত্যে প্রকাশ পায়। কবি বিশ্বচিত্তের দূত, আর সাহিত্যিক অর্থাৎ গল্পকার ঔপন্যাসিক প্রভৃতি মানব-মনের রহস্যের সন্ধানী। এঁদেরকে একটা বিশেষ মতের, বিশেষ আদর্শের প্রচারক হ'তে বল্লে আত্মহত্যা করতেই বলা হয়। একটা মুক্ত পরিবেশের মধ্যেই এঁদের প্রতিভা স্ফূর্তি পায় ভালো। শাস্ত্রের সঙ্গে সাহিত্যিকের সম্বন্ধ কি ··· শেক্সপিয়র, কালিদাস, হাফেজ, রবীন্দ্র নাথ প্রমুখ সাহিত্যিক শাস্ত্রকে কি নজরে দেখেছেন, তা জানলেই বুঝা যাবে। যতদূর মনে হয়, আত্মার স্বাভাবিক রহস্যবোধকে প্রাধান্য দিয়ে শাস্ত্রের জ্ঞানকান্ডকেই তাঁরা গ্রহণ করেছেন। শাস্ত্রের যেটুকু তত্ত্ব সেটুকু তাঁদের গ্রাহ্য, বাকীটুকু বর্জনীয়। পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ কি, বিশ্বপতির সাযুজ্য ও সারূপ্য লাভের উপায় কি, এসব অন্তরোত্থিত প্রশ্নের উত্তরে আমাদের মাননীয় পূর্ব পুরুষগণ যে-সব মীমাংসা রেখে গেছেন, জীবন-পথের মহোপকারী পাথেয়রূপে তাই তাঁরা গ্রহণ করেছেন। শাস্ত্র যেখানে বিশ্ব-সত্যের প্রকাশক সেখানে তাঁরা নতমস্তক, আর যেখানে শুদ্ধ আচারপদ্ধতির স্রষ্টা সেখানে বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করতেও কুন্ঠিত নন। বস্তুতঃ শাস্ত্র নয়, হৃদয়-বৃত্তিই সাহিত্যের উপজীব্য, একজন কবির উক্তি বলছি—

"কাব্য-কোকিল ডাকলে পরেই শাস্ত্র শিকেয় উঠ্বে,
তালি দেওয়া কথার কদর ফাগুন এলেই টুটবে।
কবি হয়ে জন্মেছে যে হৃদয়-রীতির ভক্ত,
শাস্ত্র মানা কানার মত একটুকু তার শক্ত।
সত্যিকারের কবি কবে শাস্ত্র মেনে চলছে,
'কাব্যেন হন্যতে শাস্ত্রম' শাস্ত্রই এ বলছে।
শাস্ত্র বাঁচুক কিংবা পুড়ুক ভাবনা কিছুই নাইকো,
মানুষ বাঁচুক, বাঁচুক হৃদয়, আমরা ইহাই চাইগো।"

[সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত]

সমগ্র সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের মর্মোক্তিটিই ব্যক্ত হয়েছে এ ক'টি লাইনে। ইরানের বুলবুল হাফিজের মধ্যে এ ধরনের লাইনের প্রাচুর্য :

"খামাখা তুমি মরছ কাজী ব্যর্থ তোমার শাস্ত্র ঘেঁটে,
মুক্তি পাবে মদ্‌খোরের এই আলকিমিয়ার পাত্র চেটে।"
—এতো তাঁর নিজের অথবা তাঁর দলের লোকেরই কথা।

আদেশপন্থী ও অনুপ্রেরণাপন্থী সম্বন্ধে আলোচনা করেছি, কিন্তু এছাড়া আর এক প্রকার লোক আছে যাদের নাম দেওয়া যেতে পারে যুক্তিবাদী শাস্ত্রপন্থী। এরা শাস্ত্রের একটি বিশেষ মতকে মেনে নিয়ে সেই মেনে নেওয়া মতটিকে যুক্তিতর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করে। প্রত্যেক মতের পক্ষেই কিছু না কিছু বলা যায়। যুক্তিবাদী শাস্ত্রপন্থীও তারস্বমতের পক্ষে অনেক কিছু বলতে চেষ্টা করে। কিন্তু মুশকিল এই যে, যুক্তির চাইতে গোঁজামিলই দেয় তারা বেশী? শাস্ত্রের মধ্যে বর্তমানে যে-সব মত দেখতে পাওয়া যায়, যদি তাদের ঠিক উল্টা মতও থাকতো তা'হলে সেগুলি সম্বন্ধেও যুক্তিতর্কের অবতারণা করতে তারা কুণ্ঠিত হ'ত না। আগে যুক্তি পরে মেনে নেওয়া নয়, আগে মেনে নেওয়া পরে যুক্তি করাই তাদের স্বভাব। সত্যে পেঁছাবার পথে এ কিন্তু মস্ত বড় অন্তরায়। এর দ্বারা শুধু নিজেকেই ফাঁকি দেওয়া হয়। যুক্তিবাদী শাস্ত্রপন্থী মুক্তি চায় না,—চায় বন্ধন-পাশ একটু শ্লথ করতে। এ কিন্তু আরও মারাত্মক; কেননা এ বন্ধন-বোধ নষ্ট ক'রে দেয়। বন্ধন আছে অথচ বোধ নেই, এ কি ভয়ংকর অবস্থা নয়? যুক্তিবাদী শাস্ত্রপন্থীরাও আদেশভুক্ত, তবে মাঝে মাঝে একটু আধটু যুগোপযোগী concession-এর অভিলাষী; জীবনকে নয়, শাস্ত্রকেই এরা বড় ক'রে দেখে। এদের বুঝা উচিত, জীবনরাজের দরবারে শাস্ত্র আসতে পারে শুধু মন্ত্রী হিসাবে। মন্ত্রণা দেবার অধিকার তার আছে, কিন্তু শোনা না শোনা রাজার খুশি। রাজার নিজের বিবেচনাই প্রধান, মন্ত্রীর মন্ত্রণা সেই বিবেচনা গঠনে কিছু সহায়তা করে মাত্র। এখানে বাংলার এক চিন্তাশীল লেখকের একটি উক্তি মনে পড়ছে। উক্তিটি এই: 'কোরান ও হযরত মোহাম্মদকে শুধু ভালবাসলেই কাজ হয় না, জীবন রহস্যের সমাধানের দিক থেকে যদি এই ভালবাসার উদ্ভব হয় তবেই কোরান ও মোহাম্মদ-প্রীতি থেকে সত্যিকার কল্যাণ সম্ভবপর। অন্য কথায় জীবন-রহস্যের বোধই আমাদের ভিতর প্রবলভাবে চাই, তারই আনুষঙ্গিক ভাবে আসবে কোরান, রসুল, সুফিসাধনা।' যথেষ্ট প্রণিধান করে দেখবার মতো কথা এটি। বাস্তবিক শাস্ত্রের প্রাধান্য হৃদয়ের অন্ধকারে দূরীভূত করে না, ঘনীভূতই করে। এস্থলে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন—'আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে

ধর্ম পাই সে কখনোই আমার ধর্ম হয়ে উঠে না। তার সঙ্গে কেবল মাত্র একটা অভ্যাসের যোগ জন্মে; ধর্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত ক'রে তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা? চরম বেদনায় তাকে জন্মদান করতে হয়...যা মুখে ব'লছি, যা লোকের মুখে শুনে প্রত্যহ আবৃত্তি ক'রছি তা যে আমার পক্ষে কতই মিথ্যা তা আমরা বুঝতে পারিনে। এদিকে আমাদের জীবন ভিতরে ভিতরে নিজের সত্যের মন্দির প্রতিদিন একটি একটি ইঁট নিয়ে গড়ে তুল্‌ছে: —অন্যান্য বিষয়ের মত ধর্ম ব্যাপারেও মৌলিক হ'তে না পারলে বিশেষ মূল্য —থাকে না। সত্যকার ধার্মিকের ধর্ম বাইরের থেকে পাওয়া নয়, সে তাঁর নিজেরই এক সৃষ্টি—তাঁর কল্পনা, তপস্যা, মহৎ ও সুন্দর হ'বার বাসনা, কাজ করছে এর পেছনে। সে এক সজীব জিনিস।'

যাক, এখন উপসংহার করছি। দুঃখরজনীর অবসানে একটি নবজীবনের রাঙা পভাত দেখবার জন্যে আমরা সকলেই উদ্‌গ্রীব। চারদিকে আমাদের নবজীবনের চাঞ্চল্য, চারদিকে সমাজের উন্নতির জন্যে শতমুখী আলোচনা। কিন্তু অন্তরের শ্রেষ্ঠ ইঙ্গিতকে সফল করবার চেষ্টা না ক'রে শাস্ত্রকেই একান্ত ক'রে গ্রহণ করলে আমাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। 'আকল্‌মন্দ্‌ বা ঈশারা বস্‌ আস্‌ত',—অন্তরের ঈশারাকে যেন আমরা জীবনে ব্যর্থ করে না দিই। আমাদের নতুন ক'রে ভাবা উচিত—মানুষ একটি মাংসপিণ্ড নয়: তার আত্মা আছে, মন আছে, নিজের পথ নিজে বেছে নেবার শক্তি আছে. ভিতরকার আদেশই তার জন্য সত্য, বাইরের আদেশ তাকে মরণ পথেই টেনে নেয়, সমাজের সামনে আদর্শরূপে স্থাপনযোগ্য এর চাইতে বড় কথা কি হ'তে পারে আমাদের জানা নেই।

আরেকটা কথা। ধর্মনির্বিশেষে সমস্ত মানুষের মধ্যে প্রীতি ও সৌভ্রাত্র স্থাপনের জন্যও অন্তরের আদেশের দিকে আমাদের বেশী নজর দেওয়া দরকার। এক শাস্ত্রের আদেশের সঙ্গে সঙ্গে অন্য শাস্ত্রের আদেশের প্রভেদ কম নয়, আর এই প্রভেদের দরুনই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষানলে পৃথিবীর শান্তি বিপর্যস্ত। আত্মার স্বধর্মে মানুষ মানুষের আত্মীয়, সুতরাং শাস্ত্রানুগত্য নয়, আত্মপ্রত্যয় ও আত্মোপলব্ধিই পৃথিবীকে সাম্য-মৈত্রীর পুণ্য মন্দিরে পরিণত করতে পারে। সুন্দর পৃথিবীকে সুন্দরতর করবার এই-ই সহজতম পন্থা।*

* ঢাকা মুসলিম সাহিত্য-সমাজের বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

বাঙলার কাব্য

হুমায়ুন কবির

(১৯০৬–১৯৬৯)

বাঙলা চিরদিনই কবিতার দেশ। একমাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বৈচিত্র্যই বাঙালীকে কবি করেনি—তার কবিপ্রতিভার মূলে মননরীতির বৈশিষ্ট্যও সমানই পরিস্ফুট। বাঙলার আকাশে নিদাঘ রৌদ্রের নিষ্ঠুর দীপ্তি, আষাঢ়ের ঘন বর্ষার মেঘসম্ভারের মধ্যে ঐশ্বর্য ও মহিমা, এবং শ্রাবণের দিবারাত্র অবিরাম বর্ষণধারার সঙ্গীতে হৃদয়াবেগের প্রতিচ্ছবি। ষড়ঋতুর বিচিত্র নৃত্যলীলা যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা জানেন যে, বাঙালীর কবিমানসের উৎস কোথায়। শরতের নীলাকাশে কূলে কূলে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ে, কাশের শ্বেত হাসিতে নদীকূল ভরে উঠে, হেমন্তের পরিপূর্ণ প্রশান্তির মধ্যে আকাঙ্ক্ষা ও দ্বন্দ্বের নিরসন মেলে। শীতার্ত কুহেলী রাত্রির অবগুন্ঠিত মায়াজালে নিদ্রিত ধরণীর যে জড়িমা, মানুষের আশা ও নিরাশার অংকুর তারই মধ্যে প্রথম প্রকাশিত, বসন্তের বাতাসে নতুন উন্মাদনার সঙ্গে নবীন জীবনের সঞ্চার তারই মধ্যে নিহিত। ছয়টি ঋতুর এ বিচিত্র খেলা। প্রকৃতির চঞ্চল পরিবর্তনশীল সৌন্দর্যের সে ঐশ্বর্য্য যে বাঙালী মনকে কাব্যজগতে আকর্ষণ করেছে, তাতে বিচিত্র কি?

কেবল মাত্র ঋতুর লীলা বলে নয়,—বাঙলার নৈসর্গিক সংগঠনের বৈচিত্র্যও কম নয়। সমুদ্রমেখলা সোনার বাঙলা, মাথায় তার হিমালয়ের কিরীট; আকটি-কণ্ঠ জড়ানো গঙ্গা-পদ্মা-যমুনা-মেঘনা তার মালা। পশ্চিম বাঙলায় শালবন আর কাঁকরের পথ-দিগন্তে প্রান্তর দৃষ্টি সীমার বাইরে মিলিয়ে আসে। শীর্ণ জলধারার গভীর রেখা কাটে দীর্ঘ সংখ্যাহীন স্রোতস্বিনী। বাতাসে তীব্রতার আভাস, তপ্ত রৌদ্রে কাঠিন্য, দিনের তীক্ষ্ন ও সুস্পষ্ট দীপ্তির পর অকস্মাৎ সন্ধ্যার মায়াবী অন্ধকারে সমস্ত মিলিয়ে যায়। রাত্রি-দিনের অনন্ত অন্তরাল মনের দিগন্তে নতুন জগতের ইঙ্গিত নিয়ে আসে, তপ্ত রৌদ্রালোকে মূর্ছাহত ধরণী অন্তরকে উদাস করে তোলে। পশ্চিম বাঙলার প্রকৃতি তাই বাঙালীর কবিমানসকে যে রূপ দিয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে লোকাতীত রহস্যের আভাস। অনির্বচনীয়ের আস্বাদে অন্তর যেখানে উন্মুখ ও প্রত্যাশী, জীবনে প্রতিদিনের সংগ্রাম ও প্রচেষ্টাকে অতিক্রম করে প্রশান্তির মধ্যে আত্মবিস্মরণ।

বাঙলার পূর্বাঞ্চলের প্রকৃতি ভিন্নধর্মী। পূর্ব-বাঙলার নিসর্গ হৃদয়কে ভাবুক করেছে বটে, কিন্তু উদাসী করেনি। দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তরের অভাব

সেখানেও নাই, কিন্তু সে প্রান্তরে রয়েছে অহোরাত্র জীবনের চঞ্চললীলা। পদ্মা-যমুনা-মেঘনার অবিরাম স্রোতধারায় নতুন জগতের সৃষ্টি ও পুরাতনের ধ্বংস। প্রকৃতির বিপুল শক্তি নিয়তই উদ্যত হয়ে রয়েছে, কখন আঘাত করবে তার ঠিকানা নেই। কূলে কূলে জল ভরে ওঠে, সোনার ধানে পৃথিবী ঐশ্বর্য্যময়ী, আর সেই জীবন ও মরণের অনন্ত দোলার মধ্যে সংগ্রামশীল মানুষ। প্রকৃতির সেই ঔদার্য্য, সৃষ্টি এবং ধ্বংসের সেই সংহত শক্তি ভোলবার অবসর কই? চরের মানুষ নদীর সাথে লড়াই করে, জলের ঐশ্বর্য্যকে লুটে জীবনের উপাদান আনে। তাই লোকাতীতের মহত্ত্ব হৃদয়কে সেখানে স্পর্শ করে, কিন্তু মনের দিগন্তকে প্রসারিত করেই তার পরিসমাপ্তি। প্রশান্তির মধ্যে আত্ম-বিস্মরণের সেখানে অবকাশ কই?

বাঙলার কাব্যের যে দুটি প্রধান ধারা, মননরীতি ও প্রকাশ ভঙ্গীর যে দুটি প্রধান রূপ, বাঙলার নিসর্গ-গঠনের বৈচিত্রের মধ্যে তার খানিকটা পরিচয় মেলে। কিন্তু কেবলমাত্র নিসর্গ-গঠন দিয়েই সে বৈচিত্রকে পরিপূর্ণভাবে বোঝা যায় না। বাঙালীর জাতিগত ইতিহাসের মধ্যেও তার অংকুরের সন্ধান রয়েছে, সে কথা ভুললে চলবে না। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক গবেষণার স্থান বা সুযোগ এখানে নেই, কিন্তু তবুও একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না যে, ভারতবর্ষের কোন প্রদেশেই বাঙলার মতন রক্তের মিশ্রণ হয়নি। বাঙলার আদিম অধিবাসী সম্বন্ধে জোর করে কোন কথা বলা চলে না। বোধ হয় সাঁওতাল ও অন্যান্য আদিবাসীরা তাদের বংশধর। সে আদিম রক্তধারা কিন্তু অবিমিশ্র থাকেনি—অতি পুরাতন কাল থেকেই তার মধ্যে দ্রাবিড় এবং মঙ্গোলীয় রক্ত মিশেছে। মঙ্গোলীয় মনোবৃত্তির যে অহিংস্রতা সকলেই লক্ষ্য করেছেন, বাঙালীর স্বভাবে তারও পরিচয় মেলে, কিন্তু বাঙালীর চরিত্রে যে অস্থিরতা ও উন্মাদনার প্রাচুর্য, আদিবাসীর অবিকশিত মনোবৃত্তির আকস্মিক উত্তেজনার উত্তরাধিকার হিসাবেই তাকে সহজে বোঝা যায়। দ্রাবিড় রক্ত বাঙলার কাব্য, সাহিত্য ও সভ্যতায় কি দান এনেছে, সে কথা বলা কঠিন; হয়তো গোষ্ঠীপ্রীতি ও অলস নিষ্ক্রিয়তা দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় রক্তের সংমিশ্রণের ফল। নিষ্ক্রিয়তা তো পর-মত সহিষ্ণুতা এবং অহিংস্রতারই অন্য পিঠ! তারপরে এসেছে আর্য্য, কিন্তু বারে বারে আর্য্য আক্রমণ এবং বিজয় সত্ত্বেও আর্য্যরক্তের অংশ বাঙালীর মধ্যে অল্প। নিসর্গপ্রীতি আর্য্যমানসের অঙ্গ, সংগ্রামশীলতা এবং আত্মপ্রত্যয় তার স্বভাব। বাঙলার কাব্যলোকে যে নিসর্গপ্রীতি, প্রকৃতির প্রকাশের মধ্যে লোকাতীতের যে সন্ধান, তাকে আর্য্যরক্তের দান মনে করলে বোধহয় অন্যায় হবে না। ইতিহাসের আরম্ভ থেকে মোগল রাজত্বের প্রায় অবসান পর্যন্ত বারে বারে যে আর্য্য অভিযান, বাঙলার কাব্য সৃষ্টিতে তার প্রভাব কম নয়। নানান দিক থেকে বাঙলার

মানসকে সংসারমুখী ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক করে বাঙলা সাহিত্যের অপরূপ বিকাশে তা সহায়তা করেছে।

ধর্মের বিপ্লবের মধ্যেও বাঙলার কাব্যরূপ নতুন নতুন উপাদান পেয়েছে। বৌদ্ধ-বিপ্লব বাঙলাদেশে যে-ভাবে জাতির মজ্জাগত হয়ে উঠেছিল, আর কোথাও বোধ হয় তার নিদর্শন মেলে না। সে যুগে যাতায়াতের সুবিধা ছিল অল্প এবং রাস্তাঘাটের অভাবে যে কেবলমাত্র লোক চলাচলের ব্যাঘাত ঘটেছে তা নয়—ভাবের আদান-প্রদানের ব্যাঘাত ঘটেছে আরো বেশী। আবহাওয়ার দরুনও অভিযাত্রী আর্যেরা সহজে এ সুদূর প্রান্ত দেশে আসেনি, এবং এ সমস্ত কারণ মিলে বাঙলায় যে সামাজিক জীবন ও সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তাতে আর্য প্রভাবের চিহ্ন স্পষ্ট হলেও গভীর হতে পারেনি। বহুক্ষেত্রে জনপদে ও নগরে এবং অপেক্ষাকৃত সচ্ছল উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই সে প্রভাবের পরিসমাপ্তি। সময়ের দিক থেকেও আর্য প্রভাব বাঙলায় এসেছে সকলের পরে এবং পশ্চিমের নতুন নতুন আক্রমণে যখন ভারতের কেন্দ্রে রাষ্ট্রশক্তি ভেঙ্গে পড়েছে, তখন বাঙলাদেশেই কেন্দ্রীয় প্রভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে সকলের আগে।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার যে সমস্ত পরিবর্তন এবং ধর্ম সাধনায় সে সমস্ত বিপ্লব, নতুন নতুন অভিযাত্রীর আগমনের সঙ্গে তার সম্বন্ধ গভীর, এ সন্দেহ অমূলক নয়, কিন্তু এ বিষয়ে তথ্য ও প্রমাণের অভাব আজো এত বেশী যে, জোর করে কোন কথা বলাও কঠিন। তবুও একথা নিঃসন্দেহ যে, বহুদিন পর্যন্ত আর্যাবর্তের অন্যান্য অংশ থেকে বাঙলার রাষ্ট্রিক-সামাজিক সত্তা বিচ্ছিন্ন ছিল এবং সেইজন্যই নতুন নতুন ধর্ম ও বিপ্লব বাঙলাদেশে এত সহজে শিকড় মেলেছিল। বৌদ্ধবিপ্লব কেবলমাত্র আচারের বিরুদ্ধে বুদ্ধির অথবা সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তির বিদ্রোহ নয়, ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয়ের বিদ্রোহও বটে: এবং ক্ষত্রিয় এক্ষেত্রে সমাজের সমস্ত অত্যাচারিত অংশের প্রতিনিধি ও মুখপাত্র হয়েছিল বলেই এ-বিদ্রোহের এত বিপুল বিস্তৃতি ও সার্থকতা। আর্য প্রভাব থেকে অপেক্ষাকৃত মুক্ত অঙ্গ-বঙ্গ-মগধেই তাই এ বিদ্রোহের জয়ও এত ব্যাপক।

বাঙলার পূর্বাঞ্চলেই এ বিপ্লবী মনোবৃত্তি কেন বেশী ছড়িয়ে পড়েছিল, তাও সহজেই বোঝা যায়। প্রকৃতির শক্তির উদ্যত আঘাতের সম্মুখে সংগ্রামশীল মন নদী প্রবাহের ভাঙাগড়ায় গৃহ সৃষ্টির ব্যর্থতাবোধ, এবং মঙ্গোলীয় রক্তের অহিংস্রতা মিলে পূর্ব বাঙলাকে বৌদ্ধমানসের উপযোগী ক্ষেত্র করে রেখেছিল। বাঙলায় আর্য প্রভাবের শক্তি এমনিতেই ক্ষীণ, পূর্ববঙ্গে সে প্রভাব ক্ষীণতর। বরঞ্চ পশ্চিম বঙ্গে স্থিরতা অনেক বেশী, রাজশক্তির প্রভাবও সেখানে অধিকতর কার্যকরী। তাই বৌদ্ধ-যুগের অবসানে যেদিন হিন্দু অভ্যুত্থানে বৌদ্ধ মানসকে

ধ্বংস করবার চেষ্টা প্রবল হয়ে উঠে, প্রাক্তন মজ্জাগত জাতিবিচারের পূর্ব স্মৃতির মধ্যে পশ্চিম বাংলায় তা অনেক পরিমাণে সম্ভব হয়েছিল। বল্লালী কৌলীন্য প্রথার উদ্ভব যেখানে সবচেয়ে বেশী সাফল্যও বোধ হয় সেইখানে। কিন্তু ভঙ্গুর বিপ্লবী পরিবর্তনশীল পূর্ববঙ্গে জাতিবিচারের পূর্ণ প্রাতষ্ঠার প্রচেষ্টা সে পরিমাণে সার্থক হয়নি। সেই জন্যই পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সম-শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যেও বিবাহ ব্যবহারে অল্পদিন আগে পর্যন্ত নানাবিধ বাধার কথা শোনা যেত। হিন্দু অভ্যুত্থানের বিজয়ের দিনে, কৌলীন্য ও জাতি বিচারের প্রাবল্যের মধ্যেও পূর্বদেশে বৌদ্ধ মনোবৃত্তির অহিংস্রতা ও সাম্য প্রচ্ছন্ন হয়ে বেঁচে ছিল। মুসলিম বিজয়ের সঙ্গে তা আত্মপ্রকাশ করে পূর্ববঙ্গের ধর্মীয় রূপ বদলে দেয়। বাঙলার প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধেরা ব্রাহ্মণ্যধর্মকে কোন দিনই সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেনি, রাজশক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গে ইসলামের প্রচারের মধ্যে বৌদ্ধ মানসের ক্রিয়া তাই সুস্পষ্ট—সেই জন্যই দিল্লীর এতদূরে এ প্রান্ত প্রদেশে মুসলমানের প্রাচুর্য।

বাঙলার বৌদ্ধবিপ্লব কেবল মাত্র ধর্মবিপ্লব নয়। বাংলাদেশে এ বিপ্লব উত্তর ভারতীয় আর্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলেছিল, সেই বিদ্রোহের মধ্যে পেয়েছিল রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেরণা। তার ফলে সং-স্কৃতের হল পরাজয়, প্রাকৃত ও দেশভাষার দিকে পড়লো ঝোঁক। ভারতের বিভিন্ন ভাষার সূত্রপাত তারই মধ্যে. বাঙলা ভাষারও গোড়াপত্তন সেইখানে। হিন্দু অভ্যুত্থানের প্রাবল্যের যুগে কালপ্রবাহকে ফেরাবার চেষ্টা হয়েছিল, সং-স্কৃতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে বাঙলার মানসকে সংস্কৃতের মধ্য দিয়ে প্রকাশের চেষ্টাও প্রবলতর হল, কিন্তু বিপ্লবী পূর্ববাঙলায় বৌদ্ধমানস জনসাধারণের অবচেতনার মধ্যে মজ্জাগত। সেই প্রচ্ছন্ন চিত্ত সংগঠন বদলাতে হলে যতখানি সময়, যতখানি সুযোগ এবং যতখানি সুবিধার প্রয়োজন, বাঙলার হিন্দু অভ্যুত্থান তা পায় নি। জয়দেবের গীতগোবিন্দ তাই স্ফুলিঙ্গই রয়ে গেল, দাবা-নল হয়ে জ্বলে উঠবার অবকাশ পেল না। সংস্কৃত ভাষাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টাও তাই মোসলেম বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার পরাজিত হল, বাঙালীর চিত্ত ও প্রাচীন সংস্কার শাস্ত্র শাসনের বন্ধন থেকে মুক্তি পেল। বাঙলার কাব্য সৃষ্টির প্রথম প্রকাশ তাই বৌদ্ধ দোঁহায়-তারই মধ্যে উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বাঙালীর বিদ্রোহ আপনাকে প্রথম প্রতিষ্ঠিত করল।

বৌদ্ধ দোঁহার প্রধান বৈশিষ্ট্য তার ভাষা। দেশজ ভাষায়ও যে কাব্যসৃষ্টি হতে পারে, এই বিস্ময়কর আবিষ্কার বৌদ্ধ দোঁহার শুষ্ক নীতিভাষণকে কাব্যের পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। সে আবিষ্কার সতেজ দৃষ্টিভঙ্গির আবিষ্কার, তার ফলে পুরাতন ও নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। নতুনের উন্মাদনা প্রায় সমস্ত রূপ সৃষ্টির মূলে এবং সেইজন্যই সমস্ত শিল্পই মৌলিকতাকে এতউচ্চ

আসন দেয়। কেবলমাত্র অভূতপূর্ব হলেই তা রূপসৃষ্টির উপাদান হয় না; যদি তাই হত তবে উদ্ভট এবং রসোত্তীর্ণের মধ্যে পার্থক্য থাকত না। দেশজ ভাষার সম্ভাবনার আবিষ্কারের উদ্দীপনা বৌদ্ধ দোঁহার মৌলিকত্বের প্রধান কারণ, কিন্তু মৌলিকত্বের উন্মাদনা ভাষাকে অতিক্রম করে বিষয় ও ভঙ্গীর মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করেছে। বৌদ্ধ দোঁহার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এইখানে। সংস্কৃত সাহিত্য প্রধানতঃ আভিজাত্যের সাহিত্য। অনভিজাত মানুষের যদি-বা সেখানে প্রবেশ মেলে, তাকে সন্তর্পণ সঙ্কোচে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, ফরাসে বসবার অধিকার মেলে না। বৌদ্ধ দোঁহায় তার ব্যতিক্রম স্পষ্ট। ধনিক-বণিক-শ্রমণ-ভিক্ষু, এমন কি সাধারণ মানুষকে নিয়েও সেখানে কারবার। আর্যাবর্তের প্রাচীন সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রথম উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহ বলে বাঙলার এ আদি সাহিত্য বিদ্রোহের দানা সহজে বাঁধে নি। দানা বাঁধবার জন্য যতখানি সময়ের প্রয়োজন, এই বৌদ্ধ বিপ্লবের ইতিহাস সে পরিমাণে দীর্ঘ নয়। সাহিত্যের উৎকর্ষের জন্য যে সামরিক প্রসারের প্রয়োজন—তা মিলল না বলে সে যুগের বৌদ্ধ দোঁহা ও গান বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম প্রচেষ্টা বলে স্মরণীয় হয়ে রইল বটে, কিন্তু প্রথম সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি হয়ে উঠতে পারল না।

রবীন্দ্রনাথ

বুদ্ধদেব বসু

(১৯০৮—১৯৭৪)

কোন এক লোকোত্তর কৃষকের কথা কোন এক কবিতায় আমরা পড়েছি। তার অর্থ নিয়ে অনেক বাদানুবাদ হয়েছে। কিন্তু আজ দেখছি সে কবিতা উল্টো অর্থে সত্য হ'লো। যার হাতে ফসল ফললো তাকে নিয়েই সোনার তরী দিগন্ত পারে চলে গেলো, পড়ে থাকলো তার রাশি রাশি ধান, সোনার ধান, যতদূর দৃষ্টি যায় যেন শেষ নেই।

এখন আমাদের উপর ভার প'ড়েছে সেই ফসল ঘরে তোলার। বাছতে হবে, গোছাতে হবে সাজাতে হবে গোলাঘরে থরে থরে। ডেকে বলতে হবে সকলকে—এসো, এখানে এসো, এখানে তোমার পুষ্টি, স্বাস্থ্য, কল্যাণ। এখানে তোমার উত্তর পুরুষের আনন্দের সঞ্চয়।

কিন্তু এই ঘরে তোলার কাজটি যার পারিভাষিক নাম সমালোচনা—এখানে শুরু করাই শক্ত। একখানি ছোট ক্ষেতে এত ফসল? এত বিচিত্র রকমের শস্য? যেন একই মাটিতে সমস্ত প্রকৃতির মতোই অমিত-ব্যয় প্রাচুর্য। কেমন করে সম্ভব হলো?

এই প্রশ্নই প্রথম। যে-কোন মানুষ, যিনি রবীন্দ্রনাথের সম্মুখীন হবেন, শুধু সমগ্রভাবে দৃষ্টিপাত করেন একবার, এই প্রশ্নের আঘাত তাকে সইতেই হবে। সমগ্রভাবে রবীন্দ্রনাথের দিকে তাকালে, শুধু তাঁর প্রাচুর্য, বৈচিত্র্য, বিস্তার, আশি বছরের জীবনব্যাপী বিরামহীন প্রবাহ—শুধু তাঁর আয়তনের বিষয়ে চিন্তা করলে সম্ভাব্য সমালোচকের মনের প্রায় সেই দশা হতে পারে—যদিও ভিন্ন অর্থে - যে-দশা হয়েছিলো অর্জুনের কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের যবনিকা যখন উঠেছিল কাতারে কাতারে কীর্তি কাহিনী দেখতে পেয়ে। এমনও হতে পারে যে বেশ কড়াপাকের সমালোচকও বিহ্বল হবেন, বলবার কোনো কথাই প্রথমে খুঁজে পাবেন না। অবশ্য যদি তিনি বাঙালি হন।

অথচ রবীন্দ্রনাথ ঠিক সেই জগতের লেখক, সমগ্রভাবে না দেখলে যাঁকে চেনাই যাবে না। তিনি যে একজন মহাকবি, বিশ্বের মহত্তমদের অন্যতম এ নিয়ে বাংলাদেশে আজকের দিনে আর তর্ক নেই। কিন্তু তার প্রতিভার যেটি বৈশিষ্ট্য—যেখানে তিনি পাঠকের পক্ষে বিপত্তিস্থল এবং সমালোচকের পক্ষে হতাশাস্বরূপ- সেটি এই যে, তাঁর মহত্ত তাঁর সমগ্রতায়। বিচ্ছিন্ন পংক্তিতে

তাঁকে পাওয়া যাবে না, কাব্যাংশে না, কোন একটি কবিতায় কিংবা সম্পূ একটি গ্রন্থেও তাঁর পরিচয় বিধৃত হয়ে নেই। কোনো অংশের চাইতে তাঁর সমগ্র রচনাটি বড়ো, যে কোনো একটি গ্রন্থের তুলনায় অনেক বড়ো তাঁর সমগ্র রচনাবলি—শুধু আয়তনে নয়, অর্থবহতায়। তাই কোন সংকলনগ্রন্থ তাঁর যথার্থ প্রতিভূ হতে পারে না, একেবারেই কাজে লাগে না ম্যাথু আর্নল্ডের মাদুলি সমালোচনার অন্য অনেক সুপ্রতিষ্ঠিত কানুন তাঁর সামনে ভেঙে পড়ে। যেন নদীর স্রোত বয়ে চলেছে—কোন একটি জায়গায় হাত দিয়ে বলা যাবে না যে এই রবীন্দ্রনাথ। কালিদাস বলতেই শকুন্তলা মনে পড়ে, গ্যেটে বলতেই ফাউস্ট, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলতে—যদিও বিদেশী পাঠক নিশ্চয়ই বলে উঠবেন গীতাঞ্জলি—আমাদের পক্ষে এ রকম কোন একনিষ্ঠতার বশবর্তী হওয়া অসম্ভব। 'তুমি এসো, তুমি এসো, তুমিও এসো, এবং তুমিও!' এ-ই হচ্ছে আমাদের কথা, উত্তরকৈশোর রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলির দিকে বিহঙ্গ চোখেও যখন দৃষ্টিপাত করি। গুণের তারতম্য নিশ্চয়ই আছে, রুচিভেদে পক্ষপাতও আছে, কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, রবীন্দ্রনাথ কোন 'মাষ্টার পীস' লেখেন তাঁর কোনো একটি বা কয়েকটি গ্রন্থকেও শ্রেষ্ঠ বলে চিহ্নিত করার উপায় নেই। পক্ষান্তরে, কালিদাসের যেমন ঋতুসংহার, বা শেক্সপীয়রের কমেডি অব এরর্স, এই রকম উপেক্ষণীয় রচনা রবীন্দ্রনাথের—কিছুই নেই বলতে পারলে খুশী হতুম, কিন্তু যা আছে তা তাঁর সমগ্র পরিমাণের তুলনায় খুব নগণ্য। এই পরিমাণ, এই বিস্ময়কর অজস্রতা—যাতে বাহুল্যদোষ আবিষ্কার করা অসম্ভব নয়—রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ বিকাশের পক্ষে এরই ঠিক প্রয়োজন ছিল;—এত বেশি না-লিখলে এতবড়ো তিনি হতেন না, অসংখ্যবার না বললে কোনো কথাই তাঁর বলা হতো না: তার পরিমাণেই তাঁর মহত্ত্বের পরিমাপ।

রবীন্দ্রনাথের সম্মুখীন হবার দ্বিতীয় বিপদ তাঁর সর্বমুখিতা। সর্বতো-ভাবে কবি—আবার সেই সঙ্গে এমন-কী আছে যা তিনি নন, সাহিত্য ক্ষেত্রে এমন কোন উপাধি আছে যা তাঁর প্রাপ্য নয়? নাট্যকার, গীতিকার, প্রাবন্ধিক, সমালোচক, হাস্যরসিক, পত্র-ভ্রমণ কথোপকথনে কারুশিল্পী—এমন কি, গল্প লেখক, ঔপন্যাসিক। এমনকি কথাটা ভেবেচিন্তে বসিয়েছি। কেননা কবির সংগে নাট্যকারের চিরাচরিত আত্মীয়তা আছে, গানে আর কবিতায় তো সোদর সম্বন্ধ, সমালোচনাও কবিকর্মের অন্তর্ভূত কিন্তু কবিতায় আর উপন্যাসে যে ব্যবধান তাতে বিরোধের আভাস পাওয়া যায়। সুদূর সেই ইতিহাসের স্বর্ণযুগ, যখন কাব্য আর উপন্যাস আঙ্গাঙ্গী মিশে ছিলো মহাকাব্যে; আধুনিক কালের গদ্য উপন্যাস এমনভাবে পৃথককৃত যে, তা কবিতার সহবাসী হলে উভয়তই অস্বস্তির আশংকা থাকে। তার কারণ শুধু রূপের form-এর ভিন্নতা নয়; কথাটা এই যে কবিতা লিখতে, এবং আধুনিক অর্থে উপন্যাস লিখতে, দুই আলাদা জাতের মনের প্রয়োজন। পার্থক্যটা খুব সহজ করে বলা যায় এইভাবে যে, কবির মন অন্তর্মুখী আর ঔপন্যাসিকের মন বহির্মুখী;

ঔপন্যাসিক মিশুক মানুষ, আর কবি লাজুক প্রকৃতির; ঔপন্যাসিক নিজেকে ছড়িয়েছেন বিশ্বময়, আর কবি আনেন বিশ্বকে সংহত করে তাঁর অন্তরে। অবশ্য কোনো মানুষই শুধু অন্তর্মুখী বা শুধুই বহির্মুখী হতে পারে না, সকলের মধ্যেই দুয়েরই অংশ মিশ্রিত থাকে, সেই মিশ্রণের মাত্রাভেদেই কেউ পান কবি-স্বভাব কেউ বা কথকের, আর স্বল্প সংখ্যক কেউ কেউ উভয় বিভাগেই আনাগোনা করেন। এই শেষোক্তদেরও কোনো এক দিকে পাল্লা ভারী থাকে, কেউ লেখেন কবির প্রকৃতি নিয়ে গল্প, কেউবা বৈঠকী মেজাজ নিয়ে কবিতা। প্রথম শ্রেণীতে উদাহরণ পাই ইংরেজী সাহিত্যে ডি. এইচ. লরেন্স, দ্বিতীয় শ্রেণীতে রাডিয়ার্ড কিপলিং। এঁদের বিষয়ে টি. এস. এলিয়টের মন্তব্যটি চিন্তনীয়; তাঁর মতে যেখানে একই ব্যক্তি কবি এবং কথাশিল্পী, সেখানে একটা দিক বেড়ে উঠে অন্য দিকটাকে জখম করে। এ কথার সারবত্তায় বিশ্বাস জন্মায়, যখন দেখি যে লরেন্স, আর 'দি ডাইনাস্টস' সত্ত্বেও টমাস হার্ডি, দুই কথাশিল্পীর স্থান হলো শেষ পর্যন্ত গৌণ কবিদের পিছন বেঞ্চিতে: আর কিপলিং তাঁর অসামান্য ছন্দোসিদ্ধি নিয়েও সত্যিকার কবি হতে পারলেন না, হলেন এলিয়টের ভাষায়, মহৎ পদ্যলেখক—'great writer of verse'। কবিতায় আর কথাসাহিত্যে সমান মর্যাদা কারো ভাগ্যেই জুটেছে বলে শোনা যায় না; ও দুয়ের পরস্পরে সখ্যভাব নেই, আছে প্রতিযোগিতা, পরস্পরকে দমিত অথবা বিক্ষত করাই এদের স্বভাব।

অতএব সাহিত্যের যাঁরা উভচর, একাধারে কবি এবং কথক, একদিকে থেকে তাঁরা বিশেষভাবে সম্মানযোগ্য হলেও অন্যদিক থেকে তাঁদের অবস্থা একটু বিপদজ্জনক। এই উভচর বৃত্তির অর্থই দ্বন্দ্বের অধীন হওয়া এবং কখনো এমন পথে পা বাড়ানো যাতে আপন স্বভাবের সম্মতি নেই। এই দ্বন্দ্বের সমাধান হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে কেমন করে হয়েছে—রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের আলোচনায় এই প্রশ্নই সর্বপ্রথমে বিবেচ্য। এত বড়ো কবি হয়েও কেউ উপন্যাস লিখেছেন, এমন ঘটনা পৃথিবীতে বেশী ঘটেনি, তাই এ-বিষয়ে কৌতূহলের বিশেষ সার্থকতা আছে মনে করি।

আমি আরম্ভ করবো একথা বলে যে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আর কথাসাহিত্যের একই আদর্শে বিচার চলবে না। তাঁর কাব্য, কাব্যধর্মী নাট্য, এরা দাবি করে বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিকা, কিন্তু কথাসাহিত্যকে দেখতে হবে বাংলা সাহিত্যের, বাঙালী জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে। তার প্রথম কারণ এই যে, কথাসাহিত্যে দেশকালের প্রভাব খুব প্রবল; তা ভূগোলনির্ভর, ইতিহাসে বিন্যস্ত, সামাজিক অবস্থার বৈশাদৃশ্য তার আবেদনের অন্তরায় হতে পারে। দ্বিতীয় কারণ আমাদের মাতৃভূমিতে কাব্য আর গদ্যসাহিত্যের ঐতিহ্যগত ব্যবধান। কাব্যের দিকে বহু শতাব্দীর পুরানো একটি ধারা ছিলো, সম্পদ ছিলো প্রচুর, রবীন্দ্রনাথের আংশিক আশ্রয় ছিলো সংস্কৃত, বৈষ্ণব, বাউল কাব্যে; কিন্তু তাঁর উন্মেষের সময় বাংলা গদ্য ছিলো অপরিণত, উপন্যাস সদ্যোজাত, এবং ছোট-

গল্প নামক পদার্থের অস্তিত্ব ছিলো না। লিখতে লিখতে ভাষা তৈরী করতে হয়েছে তাঁকে, ভাবতে হয়েছে নতুন রূপ, নতুন রীতি; বাংলা গদ্যের যোজন-ব্যাপী পরিণতি এক জীবনে তিনি সমাধা করেছেন। এক জীবনে, কিন্তু ধীরে। মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ 'প্রডিজি' গোছের জীব ছিলেন না, মধুসূদনের মতো চমক লাগাননি কখনো; যেহেতু তাঁকে বহুদূরে যেতে হবে, তাই অতি ধীরে তিনি এগিয়েছেন। জীবদেহের মতো মন্থর তাঁর পরিণতি, বনস্পতির বেড়ে ওঠার মতো; তাঁর স্বভাবে বিপ্লবী বৃত্তি ছিলো না, ছিলো বিনয়, নিয়ম-নিষ্ঠা—যার অর্থ ডিসিপ্লিন। চলতি প্রথাকে মুচড়ে ভেঙ্গে আশ্চর্য কিছু নতুন করার উদ্যম তাঁর যৌবনের ইতিহাসে নেই; তাঁর পথ নিশ্চিত বিবর্তনের; ঐতিহ্যের অনুসরণে, অগ্রজের অনুকরণে তাঁর পদক্ষেপ। তরুণ রবীন্দ্রনাথ রাতারাতি কোন বদল ঘটাতে যাননি; বাংলা কথাসাহিত্যকে বঙ্কিমের হাত থেকে যে-অবস্থায় পেয়েছিলেন, ঠিক সেখান থেকেই যাত্রা করেছিলেন তিনি।

উপরন্তু লক্ষণীয় যে, এই ধীরগামিতার লক্ষণ তাঁর পদ্যে ততটা দেখা যায় না, যতটা তাঁর গদ্যে। শুধু ধীরগামিতাই নয়, কেমন ভীরুতা যেন—যাকে প্রায় রক্ষণশীলতা বলা যায় কিংবা যেন অব্যবস্থিত হয়ে আছেন, মন-স্থির করতে পারছেন না। পদ্যে তিনি প্রথম থেকেই বিশিষ্ট, প্রায় কৈশোর থেকেই নিজের গলায় কথা বলছেন--যদিও চলতিকালের ফ্যাশনের সংগে সেই গলার মিল ছিলো না। কিন্তু গদ্যে—আজকের দিনে ভাবতে অবাক লাগে আমাদের গদ্যে তিনি চলেছিলেন অর্ধোত্তর জীবন ভরে প্রথাসম্মত পথেই—বঙ্কিমের সংলগ্ন হয়ে সতর্কভাবে পা ফেলে। তাঁর পক্ষে সেটা যে ঠিক স্বাভাবিক ছিলো না, তাঁর চমৎকার প্রমাণ মেলে তাঁর ভাষার ভঙ্গিতে। তাঁর কৈশোর থেকে পৌঢ়কাল পর্যন্ত, তাঁর গদ্যের দুটো পাশাপাশি ধারা আমরা দেখতে পাই; একটি সরকারী, অন্যটি ঘরোয়া; একটি সাধু অন্যটি চলিত ভাষায়; একটি গল্প উপন্যাস প্রবন্ধাদিতে প্রকাশ্য, অন্যটি চিঠি পত্রে নেপথ্য-বিহারী। যাকে আজকাল আমরা চলিত ভাষা বলি, তাতে আবাল্য আনন্দ ছিলো রবীন্দ্রনাথের; যখন 'স্বাধীনভাবে' লিখতেন, প্রকাশের কথা ভাবতেন না, তখন ঐ গদ্যই আসতো তাঁর কলমে—সে-গদ্য বঙ্কিমের অধমর্ণ নয়, হুতোম-প্যাঁচারও না, সেটা একান্তই তাঁর নিজস্ব ও নতুন—এবং সেই গদ্যেই প্রচ্ছন্ন ছিলো ভবিষ্যতের বৃহৎ সম্ভাবনা, বাংলা চলিত গদ্যের—আধুনিক গদ্যের—প্রথম পরিমার্জিত রূপটি তাঁরই হাতে রচিত হয়েছিলো তাঁর পত্রাবলীতে। কিন্তু এই ধারাটিকে তিনি অন্তঃপুরিকা করে রেখেছিলেন, এমন কি উপেক্ষা করেছিলেন, যেহেতু তৎকালীন শাস্ত্রমতের তাতে অনুমোদন ছিলো না। যিনি আঠারো বছর বয়সে দীপ্তিশালী 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' লিখেছিলেন, চল্লিশ থেকে চৌত্রিশ বছরের মধ্যে 'ছিন্নপত্রের অপরূপ পত্রাবলী', তিনিই আবার একই সময়ে গল্পের সংলাপের অংশেও 'সাধু' ভাষা লিখে-ছিলেন, এবং চলিত ভাষাকে ভালবেসেও তাকে ঘরে তুলতে পারেননি. যতদিন

না বাইরের দিক থেকে তাগিদ উঠেছিলো। তার বয়স যখন পঞ্চাশ পার, নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, জগৎ-বিখ্যাত হয়েছেন, তবু তো ঐ জাত খোয়ানো 'প্রিয়া'কে প্রকাশ্যভাবে গ্রহণ করার জন্য তাঁর দরকার হয়েছিলো 'সবুজ পত্রে'র উদ্দীপনা প্রমথ চৌধুরীর নেতৃত্বে। ভাবতে অবাক লাগে আমাদের।

যেমন গদ্য রচনায়, তিনি উপন্যাসের ভিতর-মহলেও বহুকাল পর্যন্ত গতানুগতিক বাঁধ তিনি ভাঙতে পারেননি। এখানে গতানুগতিক মানে অবশ্য বঙ্কিম আদর্শে রচনা। রবীন্দ্রনাথ ভুল করেছিলেন বলবো না—ভুল করার কথাই এখানে অবান্তর, কেননা বেছে নেবার সুযোগ তাঁর ছিলো না। অনুকরণ-যোগ্য একটিমাত্র আদর্শ ছিলো তাঁর সামনে, সে আদর্শ বঙ্কিমের। রবীন্দ্রনাথ ধাপে ধাপে এগিয়েছিলেন--টপকে পেরোতে যাননি--তাঁর এই ঐতিহ্যবোধ বন্ধুর কাজ করেছিলো তাঁর। পূর্বপরতা লঙ্ঘন করে হঠাৎ কিছু করতে গেলে বিস্ময়ের সৃষ্টি হলেও অনেক সময় নির্জীবতার আশঙ্কা থাকে– তা থেকে আর অন্য কিছু জন্মায় না, বাংলা সাহিত্যে এর দৃষ্টান্ত স্থল মধুসূদন। রবীন্দ্রনাথের সহজবোধ এখানে তাঁকে সুপরামর্শ দিয়েছিলো, কিন্তু দৈবদোষে তাঁর আদর্শের আর উন্মুখতায় সংগতি ছিলো না। বঙ্কিম স্বভাবতই ঔপন্যাসিক, রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই কবি; অগ্রজের নৈপুণ্য ছিলো রহস্যময় ঘটনা-বিন্যাসে আর মানুষের মন নামক রহস্যময় বস্তুটি ছিলো অনুজের সন্ধানস্থল। ফলতঃ রবীন্দ্রনাথে পূর্ব-উপন্যাসের একটা অস্বস্তির ভাব ধরা পড়ে, যেন লেখকের বুদ্ধি আর প্রবৃত্তি ভিন্ন পথে যেতে চাচ্ছে, যখন হৃদয় চায় হৃদয়ের কথা বলতে তখন মগজের কারখানায় চলছে প্লটের চতুরালির চেষ্টা। এ চেষ্টা একবার অন্ততঃ অপচেষ্টায় দাঁড়িয়েছিলো 'নৌকাডুবি'তে—'বৌঠাকুরাণীর হাটে'র কথা ছেড়েই দিলাম, কিন্তু 'নৌকাডুবির' ভরাডুবি তেমন উল্লেখ্য নয়, কেননা ঐ ঘটনাজটিল অসংগতিবহুল উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথের লক্ষণযুক্ত রচনাবলির মধ্যে পড়ে না, প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়। বইটি ভাল নয় বলে দুঃখ করি না, দুঃখ এই ভেবে যে, রবীন্দ্রনাথ কখনো ওরকম বই লিখতে রাজি করিয়েছিলেন নিজেকে। আরো আশ্চর্য লাগে—প্রায় বিশ্বাস হয় না—যখন ভাবি যে, 'নৌকাডুবি' লেখা হয়েছিলো 'চোখের বালি'র বছর চারেক পরে সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে পশ্চাদপসরণের দৃষ্টান্ত এই একটি ছাড়া দুটি বোধ হয় নেই।

বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় গ্রন্থ 'চোখের বালি'। কাঁচা লেখা, সন্দেহ নেই; এই গ্রন্থের ছিদ্রসন্ধানে বড়ো একটা সূক্ষ্মতারও প্রয়োজন হয় না আজকের দিনে; তবু একে অস্বীকার করাও সম্ভব নয়। তার কারণ এটি বাংলা ভাষায় প্রথম উপন্যাস, যাকে বলা যায় মনস্তত্ত্বপ্রধান, অর্থাৎ যেখানে বাইরের দিক থেকে ঘটনা সাজাবার কৌশলটাই বড়ো কথা নয়, মানুষের মর্মকথা টেনে বের করা যার লক্ষ্য। কিন্তু এখানেও শেষ রক্ষা হয়নি। উপন্যাসের ক্ষেত্রে, রবীন্দ্রনাথের স্বভাবে আর উত্তরাধিকারে যে বিরোধ ছিলো, তার দুষ্ক্রিয়তার সবচেয়ে শোচনীয় দৃষ্টান্ত 'চোখের বালি'র উপসংহার। তখনকার পাঠকরা কেউ আপত্তি

করেছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু বিনোদিনীর তুচ্ছ পরিণাম আমাদের কাছে অগ্রাহ্য—রসের দিক থেকে তা-ই, নীতি ধর্মের দিক থেকেও তা-ই। 'মনোরঞ্জনী প্রলেপ' লাগিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ—তাঁর নিজের ভাষাতেই বলছি : একদিক থেকে বিধবা প্রেমিকার সমুচিত, অর্থাৎ অনুচিত, শাস্তিবিধান করেছিলেন, অন্যদিক থেকে চেয়েছিলেন তৎকালীন কানুন মতো কাহিনীটিকে সুগোল-ভাবে শেষ করতে। এই দ্বিবিধ দৌর্বল্য 'চোখের বালি'র অপঘাত ঘটিয়েছিল।

আমরা সাধারণতঃ বলে থাকি যে উপন্যাস লিখতে হলে প্লট চাই। কিন্তু প্লটের জন্য যে ধরনের উদ্ভাবনী বুদ্ধি লাগে তা কবিত্বশক্তির অনুগামী নয়; ও ক্ষেত্রে কবিরা অনেক সময়ই ফেল হয়ে থাকেন; আর কেউ কেউ সেরকম কোন চেষ্টাই করেন না, পুরানো গল্পই নতুন করে লেখেন। শেক্সপিয়রের সাইত্রিশটি নাটকের মধ্যে শুধু একটির কাহিনীর অংশ মৌলিক এবং সে নাটক ঐ একটি কারণেই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কাব্যনাটক আর গদ্যউপন্যাসের জাত আলাদা, একের আদর্শ অন্যের উপর চাপানো যায় না। অবশ্য আধুনিক যুগে উপন্যা-সেও প্লটের ধারণা বদলেছে—'দি ম্যাজিক মাউণ্টেন' বা 'ইউলিসিস' এর মত দীর্ঘায়িত যুগ্যবতার উপন্যাসে আস্ত একটা ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান স্থান পেলেও প্লট নামক বস্তুটিকে পাওয়া যাবে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সামনে ছিলো উনিশ শতকী ধারণা; প্লটের অর্থ ছিলো খানিকটা ঘোরপ্যাঁচ, কী-হয় কী-হয় রুদ্ধ-শ্বাসে পাঠককে টেনে নিয়ে যাওয়া, নেহাৎই বাইরে থেকে উত্তেজনা এনে কৌতু-হল জাগিয়ে রাখা, তারপর গ্রন্থিমোচনে সমস্ত কিছু মিলিয়ে দেয়া, বুঝিয়ে দেয়া; এর যান্ত্রিক দিকটায় স্বাচ্ছন্দ্য ছিলোনা রবীন্দ্রনাথের, তাই তাঁর গল্পাংশে এত বেশী পাওয়া যায় আকস্মিক ঘটনা, অ্যাক্সিডেণ্ট; কাকতালীয় ফিরে আসে বার বার। কিন্তু এই প্লটের দাবী সম্পূর্ণ মিটিয়েও আপন বক্তব্য তিনি প্রকাশ করতে পেরেছিলেন 'গোরা' উপন্যাসে;—এখানে বড়ো একটি বক্তব্য ছিল তাঁর, সেই বক্তব্য ধরবার মত কাহিনীর আধারও ঠিক পেয়েছিলেন, আর এই সংযোগের ফলে সর্বাঙ্গে সম্পূর্ণ হয়েছে 'গোরা'—লেখকের স্বভাব কোথাও ব্যাহত হয়নি, রুচি কোথাও খণ্ডিত হয় নি, এখানে আদ্যন্ত আমরা রবীন্দ্রনাথ-কেই চিনতে পারি। তাঁর উপন্যাস-মালার মধ্যমণি এই গ্রন্থ, উপন্যাস হিসেবে সবচেয়ে তৃপ্তিকর, গঠনশিল্পে নিটোল, চরিত্রসৃষ্টিতে উজ্জ্বল, কাহিনীর বিন্যাসেও নিবিড়;—এই একটি বই পড়ে ধারণা হয় যে, অন্ততঃ, একজন মহৎ কবিকে ঔপন্যাসিকেরও উপাদান দিয়াছিলেন তাঁর ভাগ্যবিধাতা।

আগে বলেছি, রবীন্দ্রনাথ ধীরে এগিয়েছেন হঠাৎ কিছু বদল ঘটাতে যাননি। কিন্তু তাঁর সাহিত্যজীবনে দু-বার কিছু বড়ো রকমের বদল দেখা যায়। প্রথমটি এতই বড়ো যে বিপ্লবের কাছাকাছি পৌঁছয়, দ্বিতীয়টি তেমন না হলেও তাতেও কিছু আকস্মিকতা ছিলো। প্রথমবার 'সবুজপত্রে'র যুগে—যখন তিনি কাব্যে লিখলেন 'বলাকা', আর গদ্যে লিখলেন 'চতুরঙ্গ', 'চতুরঙ্গে'র অব্যবহিত পরে 'ঘরে বাইরে'। দ্বিতীয় বার--যখন বাংলাসাহিত্যের তরুণমহলে আর-এক-

বার বিদ্রোহের ঢেউ উঠেছে—যখন তিনি 'শেষের কবিতা' লিখলেন, প্রায়একই সময়ে 'যোগাযোগ', তারপর 'পুনশ্চ'। আসল কথা হয়তো এই যে বড়ো বদল এক বারই ঘটেছিলো, প্রথম বারের ভাঙনের পর অনিবার্য ছিলো মুক্তির পথে এগিয়ে যাওয়া। 'সবুজপত্রে' মুক্তি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ; অবিরলতায় যদিও কোথাও ফাঁক নেই, তবু নদীর স্রোতে তীব্র বাঁক নিলো এখানে; 'সবুজ-পত্রে'র আগে এবং পরে যেন দুই আলাদা রবীন্দ্রনাথকে আমরা দেখতে পাই। সে-সময়ে পুরানো কূল ছাড়লেন তিনি, বহুদিনের অনেক অভ্যাসের বেড়ি ভাঙলেন, কূল ছেড়ে গেলেন সেখানে আর ফিরলেন না।

এই নতুন রবীন্দ্রনাথ সমস্ত দিকেই প্রতীয়মান হলেন, কিন্তু কবিতার চেয়েও প্রবলভাবে তাঁকে চেনা গেল তাঁর গদ্যে। গদ্যে এতদিন সতর্কভাবে চলেছিলেন, যেন তারই ক্ষতিপূরণ স্বরূপ একেবারে নির্ভয় হলেন এবার। সেই যে 'ঘরে বাইরে'তে চলতি ভাষাকে বরণ করলেন, জীবনে আর 'সাধু ভাষা লিখলেন না; আরম্ভ করলেন ভাষা নিয়ে পরীক্ষা; ভাঙলেন, গড়লেন ছেঁটে দিলেন, জুড়ে দিলেন, সমস্তটাকে মিলিয়ে দিলেন নতুন ছন্দে; বেগ আনলেন বাংলা গদ্যে, আনলেন তীক্ষ্নতা, নমনীয়তা, লাস্য। রবীন্দ্রনাথের উত্তর জীবনের অনেকটা অংশ জুড়ে আছে এই গদ্যসাধনা, 'ঘরে বাইরে' থেকে 'ছেলে-বেলা' পর্যন্ত গদ্য ভাষাকে যতরকম করে মুচড়ে বেঁকিয়ে তিনি চালিয়েছিলেন, তাতে বাংলা গদ্যের রূপান্তর ঘটেছে এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না।

উপন্যাসের রূপের দিকেও বদল হলো। উনিশ শতকী প্লটের মোহ কেটে গেলো। উপন্যাস হয়ে উঠলো বক্তব্যপ্রধান ভাবনির্ভর। সেই সংগে চললো কথাশিল্পের কলাকৌশল নিয়ে বিচিত্র রকমের পরীক্ষা। পত্রাকারে গল্প, ডায়েরির আকারে উপন্যাস, 'চতুরঙ্গে'র নিবিড় সংহতি—এ সবের পরেও 'শেষের কবিতা'র নতুনতর কারুকর্ম। এসব পরীক্ষার অর্থ বলা বাহুল্য, শুধুই বৈচিত্র্য সাধন নয়, এর জন্যে মনের দিক থেকে তাগিদ ছিলো। তিনি যা চাচ্ছিলেন, খুঁজছিলেন, পরখ করে করে দেখছিলেন তা উপন্যাসের এমন একটি রূপ যা কবির স্বভাবের পক্ষে অনুকূল। তার ভিতরকার কবিটি যাতে প্রশ্রয় পায়, কবিত্ব সহযোগী হয় কথাশিল্পের এই ছিলো রবীন্দ্রনাথের সচেতন না হোক অচেতন মনের লক্ষ্য। তাই কাহিনীর অংশ সরল হলো, লঘু হলো উদ্ভাবনার দায়, এলো সগতোক্তি মননশীলতা, বিশ্লেষণী পদ্ধতি। প্রধান হয়ে উঠলো পাত্র-পাত্রীর মন; তারা কী করছে, কী ঘটছে তাদের জীবনে, সেটা যেন উপলক্ষ মাত্র। অপরিহার্য ছিল। তাঁর উত্তর জীবনের কথা সাহিত্যে কোনো নিছক গল্প বলতে যাননি রবীন্দ্রনাথ, মানুষের গহন মনে আলো ফেলতে চেয়েছিলেন উপন্যাসকে কাব্যের সধর্মী করে তুলতে।

এর ফল, মানতেই হয়, সর্বত্র সমান হয়নি। 'চতুরঙ্গে'র সৌষম্য উল্লেখ-যোগ্য; 'যোগাযোগ', অসমাপ্ত হলেও, কবির সঙ্গে ঔপন্যাসিকের সার্থক মিলনের দৃষ্টান্ত। কিন্তু 'ঘরে বাইরে' অতিকথনে ভারাক্রান্ত, 'শেষের কবিতা'র

গল্পাংশ দুর্বল, 'চার অধ্যায়ে' কোথাও কোথাও সন্দেহ জাগে লেখক তাঁর অভিজ্ঞতার বাইরে চলে যাচ্ছেন। কিন্তু এ-সব বই যাতে রক্ষা পেয়েছে—শুধু রক্ষা পেয়েছে তা নয়, আলো তাপ, প্রাণ পেয়েছে যেখান থেকে, সেই উৎস আর কিছুই নয়, রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা। কবিত্বই সেই শক্তি, যাতে শেষ পর্যন্ত ফাঁড়া কেটে গেছে যাতে এ-সব বইয়ের সম্মোহনী প্রভাব কিছুতেই ঠেকানো যায় না। কবি ছাড়া আর কারো হাতে 'শেষের কবিতা' সম্ভব ছিলো-না—ও বইয়ের পদ্যাংশই তার কারণ নয়—কবি ছাড়া আর কারো সাধ্য ছিলো না এলা-অন্তর দীর্ঘায়িত সংলাপে মুগ্ধ করে ধরে রাখে আমাদের।

তাহলে মোটের উপর দাঁড়াচ্ছে কী? দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ কবি আর কথাশিল্পীর সম্পূর্ণ সংগতি ঘটাতে পারেননি—এত বড়ো কবির কাছে সেটা আশা করাও অন্যায় হয়। দুয়ের বিরোধে ক্ষতি হয়েছে উপন্যাসের: কবিত্ব যখন দমিত হয়েছে তখন এসেছে, 'নৌকাডুবি'র কৃত্রিমতা, আর যখন প্রশ্রয় পেলো তখন দেখি 'ঘরে বাইরে'র আতিশয্য, 'শেষের কবিতা'য় বিষয়বস্তুতে যথার্থ্যের অভাব। আবার সংগে এও দেখি যে তাঁর কথা-সাহিত্যের একটি বড়ো অংশের প্রতিপত্তির কারণই তাঁর কবিত্ব গুণ; পূর্ব-রবীন্দ্রের উপন্যাসে পাই ঐতিহ্যরক্ষা, কিন্তু 'ঘরে বাইরে', 'শেষের কবিতা' এ-সব বই বীজের মতো কাজ করেছে বাংলা সাহিত্যে, তা থেকে অন্য বই জন্ম নিয়েছে। এই অবস্থায় কবিকে বাদ দিয়ে কথাশিল্পীর বিচার চলবে না; রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অংশ বেছে নিতে হলে আমাদের খুঁজতে হবে কোথায় তাঁর দুই সত্তার সামঞ্জস্য ঘটেছে, একটা অন্যটাকে ছাপিয়ে ওঠেনি, কোথাও কবিত্বের দিকটা গল্পের সঙ্গে এমনভাবে মিলে-মিশে আছে যে, কোনোটাকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়া যায় না। সে-রকম বই 'গোরা', 'চতুরঙ্গ', 'যোগাযোগ', কিন্তু এই সংগতি সাধনের দৃষ্টান্তরূপে সর্বাগ্রে যার নাম করতে হয়, সে বই 'গল্পগুচ্ছ'।

'গল্পগুচ্ছ' আশ্চর্য বই। ইতিহাসের দিক থেকে আশ্চর্য আন্তরিক মূল্যেও তাই। বাংলা ভাষায় প্রথম ছোটগল্প লেখেন রবীন্দ্রনাথ এবং এমন সময় লেখেন, যখন ইংরেজী সাহিত্যেও ছোটগল্প নামক বস্তুটির চল হয়নি। যৌবনে পদ্মার বুকে 'সজন-নির্জনের নিত্য সংগ্রামে' যখন বাসা ছিল তাঁর, যখন 'সোনার তরী' লিখছিলেন, তারপর 'চিত্রা', সেই একই সময়ে ছোট গল্পের ধারাটিও তাঁর খুলে গিয়েছিলো। শুভ যোগ ঘটেছিলো তাঁর জীবনে: ঠিক লোকালয়ে ছিলেন না, কিন্তু কাছাকাছি ছিলেন; সংসারে জড়িত ছিলেন না, কিন্তু মানুষের সংসার যাত্রার দর্শক হয়েছিলেন। কল্পনার উৎসাহ ছিলো উদার আকাশে, আবার মানবচরিত্র লক্ষ্য করারও সুযোগ ছিলো। এই অবস্থা কবির পক্ষে তেজস্কর, কথাশিল্পীরও পুষ্টিসাধক। এই সময়ে একটি দুটি করে 'আপনার মনোমত' যেসব গল্প তিনি লিখেছিলেন, পরবর্তী অন্য সব রচনাবলীর পাশে রেখেও তাদের সদ্যোজাত টাটকা ভাবটা একটুও উঠে যায় না। বরং তুলনা করে দেখলে তাদের অফুরান প্রাণশক্তিতেই বিস্মিত হতে

হয়; 'গল্পগুচ্ছ', আর তার যমজ বই 'ছিন্নপত্র', রবীন্দ্রনাথের গদ্য বইয়ের মধ্যে এই দুটির আমি নাম করবো, যা অসংখ্যবার পড়েও পুরোনো হয় না।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প অধিকাংশ তাঁর পূর্ব জীবনের রচনা। তখন তিনি উপন্যাসে বঙ্কিমের অধীন ছিলেন কিন্তু ছোটগল্প লিখতে গিয়েই তাঁর পথ ভিন্ন হয়ে গেলো। বঙ্কিমের সাড়ম্বর শোভাযাত্রার পরে, রাজন্যজড়িত আলোকসামান্য ঘটনাবলির পরে, রবীন্দ্রনাথ আনলেন লৌকিক জীবনের ছবি, সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের সুখদুঃখের কাহিনী—সমস্ত 'গল্পগুচ্ছে'র উপাদানে, একমাত্র 'মহামায়া' গল্পে ছাড়া আর কোথাও বঙ্কিমের অনুগামিতা নেই। যেমন বিষয়বস্তুতে গল্পগুলির স্বকীয়তা, তেমনি রচনাশিল্পেও প্রথম থেকেই স্বাচ্ছন্দ্য বেশী; সমসাময়িক গল্পে আর উপন্যাসে প্রায় যেন তুলনাই চলে না; যতদিনে রবীন্দ্রনাথ 'পোস্ট মাস্টার' থেকে 'নষ্ট নীড়' পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন ততদিনে 'চোখের বালি' মাত্র পাওয়া যায়, আবার 'নৌকাডুবি'র অনতিপরে পাই 'মাস্টার মশাই', 'গুপ্তধন'। উপন্যাসের তুলনায় গল্প কত সুপরিণত; গল্প যেখানে স্বতস্ফূর্ত, আত্মস্থ, সেখানে উপন্যাস কেমন আড়ষ্ট, যেন অংশত বানিয়ে তোলা। গল্পে আর উপন্যাসে এই ব্যবধান দেখে বিস্ময়ের উদ্রেক হতে পারে, কিন্তু লেখক যেখানে কবি, সেখানে এ-রকম হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কেননা কবিতা আর উপন্যাসে বিরোধ থাকলেও ছোটগল্প কবি প্রতিভার অনুকূল। কথাসাহিত্যের এই দুই শ্রেণীতে সব সময় সৌহার্দ থাকে না; এর এক দিকে শক্তি থাকলে অন্যদিকে অবশ্যই দখল জন্মে না; আন্তনচেহব কখনো উপন্যাস লেখেননি, ভার্জিনিয়া উলফের একটিও ছোটগল্প নেই; রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্য সমগ্রভাবে দেখলে সন্দেহ থাকে না যে, তাঁর স্বভাবের পক্ষে ছোটগল্পের উপযোগিতা বেশী ছিলো; কবিতায় তিনি যতো বড়ো, ছোটগল্পে তার কাছাকাছি, কিন্তু—'গোরা' সত্ত্বেও 'যোগাযোগে'র সূচনা সত্ত্বেও উপন্যাসে তাঁর আসন ভিন্ন। শুধু তাঁর ক্ষেত্রেই নয় সাধারণভাবে বাংলা উপন্যাস বিষয়েই একথা সত্য। বাংলা সাহিত্য যেখানে উৎকৃষ্ট, সেখানে কবিতা আর ছোটগল্প যে পরিমাণে দেখতে পাই, উপন্যাস সে তুলনায় অল্প। এর কারণ হয়তো বাঙালি জীবনের ক্ষুদ্র পরিধি, হয়তো বা বাঙালি মনের গীতিধর্মিতা। কিন্তু কারণ যাই হোক, বাংলা উপন্যাসের আপেক্ষিক দুর্বলতা সুস্পষ্ট, আধুনিক পশ্চিমী অর্থে মহৎ কোনো উপন্যাস বাংলা ভাষায় আজ পর্যন্ত লেখা হয়নি। কিন্তু বাংলা উপন্যাসের যে সৌধ আজ উঠেছে, সেখানে বঙ্কিম বস্তুদেবতা হলেও রবীন্দ্রনাথই প্রধান স্থপতি। আর—যেহেতু তিনি 'ঘরে বাইরে' লিখেছেন, 'শেষের কবিতা' লিখেছেন—পরবর্তীর তিনি যাত্রাস্থল;—এর পর যাঁরা বাড়াবেন, বদলাবেন, নতুন নতুন মহল বানাবেন তেতলার উপর চার তলা পাঁচ তলা তুলবেন, রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠ না নিলে তাঁদের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হবে না। রুচির গুরু তিনি, রূপায়ণের ভাবশিল্পের। যেখানে তিনি নিজের জমিতে দাঁড়িয়ে আছেন, সেখানে তিনি অবশ্যমান্য. আর যেখানে তাঁর ভুল হয়েছিলো, সেখানেও উত্তরকালের শিক্ষার ক্ষেত্র পড়ে আছে।

লেখক-পরিচিতি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০—৯১)

জন্ম পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায়। পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা লাভ। ১৮৪১-এ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে হেড পণ্ডিতের পদ লাভ। ১৮৫১-এ ওই কলেজে অধ্যক্ষ নিযুক্ত। তাঁর নেতৃত্বে বিধবা বিবাহের আন্দোলনের ফলে ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন পাশ। প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭), জীবনচরিত (১৮৪৯), বোধদয় (১৮৫১), ব্যাকরণ কৌমুদী (১৮৫৩-৬২), শকুন্তলা (১৮৫৪), বর্ণপরিচয় (১৮৫৫), কথামালা (১৮৫৭), চরিতাবলী (১৮৫৬), সীতার বনবাস (১৮৬০), আখ্যান মঞ্জরী (১৮৬৩), ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯)। বাক্যাংশের অর্থজ্ঞাপকতা অনুযায়ী ছেদচিহ্নের প্রবর্তন করে তিনি প্রথম বাংলা গদ্যে সুষম বাক্যগঠন-রীতি সৃষ্টি করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮—৯৪)

জন্ম পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনায়। হুগলী কলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা লাভ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার (১৮৫৭) পর ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক। ১৮৫৮ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেকটর পদে যোগদান। প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), মৃণালিনী (১৮৭৯), লোকরহস্য (১৮৭৪), বিজ্ঞানরহস্য (১৮৭৫), কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫), বিবিধ সমালোচনা (১৮৭৬), সাম্য (১৮৭৯), রাজসিংহ (১৮৮২), আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৬৮), সীতারাম (১৮৮৬), ধর্ম্মতত্ত্ব (১৮৮৮)। ১৮৭২-এ বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা। প্রথম সার্থক বাংলা ঔপন্যাসিক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১)

জন্ম কলকাতায়। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। নির্বাচিত প্রবন্ধগ্রন্থের তালিকা : য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র (১৮৮১), বিবিধ প্রসঙ্গ (১৮৮৩) রামমোহন রায় (১৮৮৫), আলোচনা (১৮৮৫), চিঠিপত্র (১৮৮৭),

সমালোচনা (১৮৮৮), মন্ত্রি-অভিষেক (১৮৯০), পঞ্চভূত (১৮৯৭), আত্মশক্তি (১৯০৫), বিচিত্র প্রবন্ধ, চারিত্রপূজা, প্রাচীন সাহিত্য, লোকসাহিত্য, সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য (১৯০৭); রাজা, প্রজা, সমূহ, স্বদেশ, সমাজ ও শিক্ষা (১৯০৮), শব্দতত্ত্ব ও ধর্ম (১৯০৯); জীবনস্মৃতি ও ছিন্নপত্র (১৯১২), সঞ্চয়, পরিচয় (১৯১৬), রাশিয়ার চিঠি (১৯৩১), মানুষের ধর্ম (১৯৩৩), ছন্দ (১৯৩৬), সাহিত্যের পথে (১৯৩৬), কালান্তর, বিশ্বপরিচয় (১৯৩৭), বাংলাভাষা পরিচয় (১৯৩৮), ছেলেবেলা (১৯৪০) সভ্যতার সংকট (১৯৪১), আত্মপরিচয়, সাহিত্যের স্বরূপ (১৯৪৩)। 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' ২৭ খণ্ডে তাঁর প্রায় সমুদয় রচনা সংকলিত। ১৯১২ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩—১৯১০)

জন্ম ঢাকায়। মক্তবে ফারসী, টোলে সংস্কৃত ও স্কুলে ইংরেজী অধ্যয়ন। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে প্রবেশিকা শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন। পূর্ববঙ্গীয় ব্রাহ্ম-সমাজের বিশিষ্ট সভ্য। ১৮৭০-এ ব্রাহ্ম যুবকদের জন্য 'শুভ সাধিনী' ও ১৮৭৪ এ 'বান্ধব' পত্রিকা প্রকাশ। ১৮৭৭ থেকে পঁচিশ বছর ভাওয়াল এস্টেটের ম্যানেজার। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ : প্রভাত চিন্তা (১৮৭৭), নিভৃত চিন্তা (১৮৮৩), নিশীথ চিন্তা (১৮৯৬)।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩—১৯৩১)

জন্ম পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনায়। সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা লাভ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ। ঢাকা মিউজিয়ামের কিউরেটর। এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিবিভাগের অধ্যক্ষ। ১৯০৭-এ নেপালের রাজদরবার থেকে বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' উদ্ধার ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশ। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : ভারত-মহিলা (১৮৮০), বাল্মীকির জয় (১৮৮১), কাঞ্চনমালা (১৯১৪), বেদের মেয়ে (১৯১৯)। সম্পাদিত হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোঁহা (১৯১৬)।

জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৯—১৯৩৭)

জন্ম ময়মনসিংহে। আদি নিবাস বিক্রমপুর। পদার্থবিদ ও জীববিজ্ঞানী। প্রথমে ফরিদপুরের গ্রামে ও পরে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে অধ্যয়ন। বি. এ. পাশের (১৮৮০) পরই বিলেত গমন। বিলেতে শিক্ষাকাল (১৮৮০—১৮৮৪), ১৮৮৫ তে কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে যোগদান, ১৯১৫-তে 'এমেরিটাস' অধ্যাপক হিসেবে অবসর গ্রহণ। ১৮৯৬-তে লন্ডন থেকে ডি.এস সি. উপাধি লাভ। তাঁর সাধনাকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথমে ১৮৯৫—১৮৯৯ বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ সম্বন্ধে গবেষণা। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯০০—১৯০২ জৈব ও অজৈব পদার্থে উত্তেজনার ফলে সাড়ার সমতার উপর গবেষণা। তৃতীয় পর্যায়ে ১৯০৩—১৯৩২ জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদ ও প্রাণীর পেশীর মধ্যে তুলনামূলক শারীরবিদ্যা নিয়ে গবেষণা করেন। অব্যক্ত (১৯২১) গ্রন্থে বাংলা রচনার নৈপুণ্যের পরিচয় আছে। রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের পরস্পরকে লেখা চিঠিতেও এর পরিচয় পাওয়া যায়। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৩-এ তাঁকে ডি. এসসি. উপাধি প্রদান করে। ১৯৩৫-এ ডি. এসসি. উপাধি প্রদান করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪—১৯১৯)

জন্ম মুর্শিদাবাদে। ১৮৮১-তে মুর্শিদাবাদ থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। ১৮৮৬-তে এই কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন। ১৮৮৭ সালে এম. এ.-তে কৃতিত্বের জন্য স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৮৮৮-তে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। পরের দুই বছর প্রেসিডেন্সী কলেজে গবেষণা করেন। ১৮৯২-এ তৎকালীন রিপন কলেজে (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান। ১৯০৩-এ অধ্যক্ষের পদলাভ। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : প্রকৃতি (১৮৯৬), পুণ্ডরীককুলকীর্তি পঞ্জিকা (১৯০০), জিজ্ঞাসা (১৯০৪), মায়াপুরী (১৯১১), ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (১৯১১), বিচিত্র প্রসঙ্গ (১৯১৪)।

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮—১৯৪৬)

জন্ম যশোরে। পৈত্রিক নিবাস পাবনা। বাংলা সাহিত্যে তিনি 'বীরবল' নামেও পরিচিত। পুরো নাম প্রমথনাথ চৌধুরী। কলকাতা হেয়ার স্কুল

থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে দর্শনে বি. এ. (১৮৮৯) ও পরে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. পাশ করেন (১৮৯০)। বিলেতে ব্যারিস্টারী পড়তে যান (১৮৯৩)। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সনেট পঞ্চাশৎ (১৯১৩), পদচারণ (১৯১৯), চার ইয়ারী কথা (১৯১৬) আহুতি (১৯১৯), নীল লোহিত (১৯৩২), নীল লোহিতের আদি প্রেম (১৯৪১), গল্প সংগ্রহ (১৯৪১)। তাঁর প্রধান কীর্তি বাঙলা গদ্যে কথ্য ভাষার প্রচলন। তিনি 'সবুজ পত্র' (১৯১৪) প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা করেন।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০—১৯৩২)

জন্ম রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে সাবের পরিবারে। পিতার নাম জহির-উদ্দীন মোহাম্মদ আবু আলী সাবের ও মাতার নাম রাহাতুন্নেছা সাবেরা চৌধুরাণী। তিনি কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করতে পারেন নি। আঠারো বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয় অবাঙালী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সাখাওয়াত হোসে-নের সঙ্গে। তিনি কলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্ল'স স্কুল (১৯১১) স্থাপন করেন। শুধু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা নয় অবরুদ্ধ মুসলিম নারী সমাজকে মুক্তিদানের জন্য তাঁর আন্তরিক্ প্রয়াসের অন্ত ছিল না। গ্রন্থ তালিকা মতিচুর (প্রবন্ধ) ১৯০৪ ও ১৯২২ (২ খণ্ড), অবরোধবাসিনী (১৯৩১), পদ্মরাগ (১৯২৪), রোকেয়া রচনাবলী (১৯৭৩), SULTANA'S DREAM (১৯০৮)।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫—১৯৬৯)

জন্ম পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনায়। ১৯০৪-এ হাওড়া জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা, ১৯০৬-এ কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ. এ., ১৯১০-এ সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্স সহ বি. এ. পাশ করেন। ১৯১২-তে কল-কাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম. এ. এবং ১৯১৪-তে বি. এল. পাশ করেন। ১৯১৯ পর্যন্ত তিনি ওকালতি পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের গবেষণা সহায়ক নিযুক্ত হন। ১৯২১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেন। ১৯২৬-এ তিনি প্যারিসের সোরবন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : সিদ্ধা মানুপার গীত ও দোহা (ফরাসী) ১৯২৬, বাঙলা সাহিত্যের কথা (১ম খণ্ড ১৯৫৩), বাঙলা

সাহিত্যের কথা (২য় খণ্ড ১৯৬৫), Buddhist Mystic Songs (১৯৬০), বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৬৫), ভাষা ও সাহিত্য (১৯৩১), বাঙলা ব্যাকরণ (১৯৬৮), ইকবাল (১৯৪৫), আমাদের সমস্যা (১৯৪৯), অমিয় শতক (১৯৪০), রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ (১৯৪২), শিকওয়াহ ও জওয়াব-ই-শিকওয়াহ (১৯৪২), বিদ্যাপতি শতক (১৯৫৪), কুরআন প্রসঙ্গ (১৯৬২), আলাওলের পদ্মাবতী (১৯৫০)।

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯—১৯৩৬)

জন্ম মাগুরায়। হুগলী কলেজে এফ. এ. ক্লাশ পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। কিছুকাল তিনি সিরাজগঞ্জে ও পরে চট্টগ্রামের জোড়ারগঞ্জে শিক্ষকতা করেন। কলকাতায় 'নারীতীর্থ' নামে সেবা প্রতিষ্ঠান চালু করেন। নারীমুক্তির জন্য প্রকাশ করেন 'নারীশক্তি' পত্রিকা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : প্রকাশ (১৯১৫), সরলা (১৯১৮), রায়হান (১৯১৯), পথহারা (১৯১৯), প্রীতি উপহার (১৯২৬), বাসর উপহার (১৯৩৫), উন্নত জীবন (১৯১৯), মহৎজীবন (১৯২৬), মানবজীবন (১৯২৭), উচ্চজীবন (১৯৬২)। ঢাকা বাংলা একাডেমী থেকে লুৎফর রহমান রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে। প্রাঞ্জলতা ও ঋজুতা তাঁর গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯—১৯৭৬)

জন্ম বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে। পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ ও মাতার নাম জাহেদা খাতুন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : অগ্নিবীণা (১৯২২), দোলন চাঁপা (১৯২৩), বিষের বাঁশী (১৯২৩), ভাঙ্গার গান (১৯২৪), ছায়ানট (১৯২৫), সাম্যবাদী (১৯২৫), সর্বহারা (১৯২৬), ফণি মনসা (১৯২৭), সিন্ধু হিন্দোল (১৯২৭), জিঞ্জির (১৯২৮), সঞ্চিতা, (১৯২৮), চক্রবাক (১৯২৯), নতুন চাঁদ (১৯৪৫)। উপন্যাস : বাঁধন হারা (১৯২৭), মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩০), কুহেলিকা (১৯৩১)। গল্প : ব্যথার দান (১৯২৩), রিক্তের বেদন (১৯২৫), শিউলী মালা (১৯৩১), নাটক : ঝিলিমিলি (১৯৩০)। অনুবাদ : রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ (১৯৩০), কাব্য আমপারা (১৯৩৩), রুবাইয়াৎ-ই ওমর খৈয়াম (১৯৬০)। প্রবন্ধ : যুগবাণী (১৯২২), রাজবন্দীর জবানবন্দী (১৯২৩), দুর্দিনের যাত্রী (আনু ১৯২৬), ধূমকেতু (১৯৬০)।

মোতাহার হোসেন চৌধুরী (১৯০৩--১৯৫৬)

জন্ম কুমিল্লায় মাতুলালয়ে। পৈত্রিক নিবাস নোয়াখালী। বিভিন্ন সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। মননশীল এই প্রাবন্ধিক চিন্তাধারায় রবীন্দ্রনাথ এবং গদ্যশৈলীতে প্রমথ চৌধুরীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও তার মুখপত্র 'শিখা' পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। যদিও তিনি গদ্য লেখক হিসেবে অধিক পরিচিত তবে তার কিছু কবিতাও রয়েছে। চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে অধ্যাপনাকালে ১৯৫৬-তে তাঁর মৃত্যু হয়। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : সংস্কৃতি কথা (১৯৫৮)। অনুবাদ : সভ্যতা (১৯৬৫), সুখ (১৯৬৮)।

হুমায়ুন কবির (১৯০৬—১৯৬৯)

জন্ম ফরিদপুরে। নওগাঁ স্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৯২২), প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আই. এ. (১৯২৪), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে বি. এ. (অনার্স) ১৯২৬ এবং ১৯২৮-এ এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৩১ -এ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস, অর্থনীতি ও দর্শন শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর অনার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা সচিব, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় সদস্য ছিলেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : স্বপ্নসাধ (১৯২৮), অষ্টাদশী (১৯৩৮), নদী ও নারী (১৯৫২), ইমানুয়েল কান্ট (১৯৩৬), ধারাবাহিক (১৯৪০), মার্কসবাদ (১৯৪৮), বাংলার কাব্য (১৯৫৪) ইত্যাদি। ইংরেজীতেও তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশ পায়।

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮—১৯৭৪)

জন্ম কুমিল্লায়; আদি নিবাস বিক্রমপুর। নোয়াখালীতে প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩১-এ ইংরেজীতে এম. এ. পাশ করেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : বন্দীর বন্দনা (১৯৩০); কঙ্কাবতী (১৯৩৭), দ্রৌপদীর শাড়ী (১৯৪৮), দময়ন্তী (১৯৬৩), মরচে-পড়া পেরেকের গান (১৯৬৬), শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা (১৯৬০), হঠাৎ আলোর ঝলকানি (১৯৩৫), কালের পুতুল (১৯৪৬), রবীন্দ্রনাথ : কথা সাহিত্য (১৯৫৫), তপস্বি ও তরঙ্গিণী (১৯৬৬), কলকাতার ইলেকট্রা (১৯৬৮) ইত্যাদি।